সূচিপত্র

স্বর্গীয় নরকের দ্বার

কলিং-বেল-এ আঙুলটা ছোঁওয়াতে গিয়েও হাতটা টেনে নিল। রুদ্ধদ্বারের পাশে কাঠের ফলকে লেখা ঠিকানাটা মিলে গেছে ; নামটা পড়ল আবার 'এ.রোদ্যাঁ।' বোধহয় ঠিকই আছে। ও যে খামখানা বিলি করতে এসেছে তার উপর অবশ্য লেখা আছে : 'মস্যুয়ে অগুস্ত্ রেনে রোদ্যাঁ'। কাঠের ফলকটায় না 'মস্যুয়ে' না 'রেনে' ; ফলকের ঐ 'এ' যে 'অগুস্ত', তা কেউ হলপ করে বলেনি। বর্ণমালার ঐ আদ্য অক্ষরটি যদি অকালকুষ্মাণ্ড, অপোগণ্ডেশ্বর জাতীয় অভাবনীয় কিছু না হয় তবে সঠিক ঠিকানাতেই সে পৌঁছেছে। কিন্তু এই বাড়ি ? হাড়-পাঁজরা বার করা। পার্টিতে যাবার মতো প্যান্টুলুন আছে তো ওর ?

তার নিয়োগকর্তা মাদাম এবং মস্যুয়ে শার্পেতিয়ে পারীর উচ্চকোটি-মহলের একজন অভিজাতস্য অভিজাত। মাসে একবার তাঁর প্রাসাদে পার্টি হয়। পারীর তা-বড় তা-বড় খানদানী মহারথীরা সন্ধ্যায় সমাবেত হন—মন্ত্রী, সেনেটর, রাজনীতিবিদ এবং শিল্পী, কবি-সাহিত্যিক, মঞ্চাভিনেতা-অভিনেত্রীর দল। যেসব প্রাসাদে চিঠি বিলি করতে যায় তার ফটকে লেখা থাকে 'কুকুর হইতে সাবধান', তার গেটে পাহারা দেয় তক্‌মা-সাঁটা বন্দুকধারী, তার বাগানে মার্বেলন্যুডের চরণচুম্বিত মরসুমী ফুল। কম্পৎ ল্যো এক্স, কন্তাসিনা লা ওয়াই, আর্ল-কাউন্টেস্ লে জেড কিম্বা ডিউক অ্যান্ড ডাচেস্ অব খোদায়-মালুম। শিল্পী সাহিত্যিকেরা অবশ্য প্রাসাদে থাকেন না। একবার তো রীতিমতো বেকায়দায় পড়েছিল চিত্রশিল্পী ক্লদ্ মনে-কে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে—ভেথিয়ুলে। পারী থেকে বেশ কয়েক মাইল উত্তর-পশ্চিমে। দোর খুলে দিয়েছিলেন ক্লদ মনে-র স্ত্রী কামীল মনে ; কিন্তু তাঁর আধময়লা ওয়ার্ক-অ্যাপ্রনটা দেখে ও ভেবেছিল বুঝি বাড়ির ঝি। বলেছিল, 'তোমার কর্তা-গিন্নির নিমন্ত্রণ আছে ; চিঠিখানা তাঁদের কারও হাতে দিয়ে এই পিয়ন-বইতে একটা সই করিয়ে আনো তো বাছা।' মাদাম 'মনে' নিরুত্তরে পাতাখানা টেনে সই দিয়ে ফেরত দিয়েছিলেন। বেচারি ক্ষমা চাইবার আগেই সদর-দোর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ওর নাকের ডগায়।

সেই থেকে কারও দোরে কলিং-বেল বাজাবার আগে ও সর্তক হয়। মনে মনে মাদাম 'মনে'-কে চিন্তা করে আর তাল ভাঁজে।

কলিং-বেল বাজাতে যিনি দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন—অথবা যে দ্বার খুলে দিল— তাকে নিয়েও একই জাতের সমস্যা। রোদ্যাঁর স্ত্রী ? বাচ্চাদের গভর্নেস ? না কি বাড়ির ঝি ? বয়স যদি ত্রিশের এপারে হয় তবে বলতে হবে অকালবার্ধক্য, পঁয়ত্রিশের ওপারে হলে স্বীকার করতে হয় প্রৌঢ়ত্ব ওঁর ধারে-কাছে ভিড়তে ভয় পায়। গায়ে একটা কমদামী হাউস-কোট ; ময়লা। কিন্তু চোখ দুটিতে ভূমধ্যসাগরের সবুজাভ নীলিমা, মাথা থেকে কাঁধে নেমে এসেছে কলোচ্ছ্বাসিনী সুবর্ণরেখা।

পিয়নটা বলে, মাদাম রোদ্যাঁ.....বাক্যটা অসমাপ্ত রাখে। যেন বাকি দায়টা শ্রোতার। ইচ্ছা করলে পাদপূরণ করুন—'তো আপনি ?' অথবা পূরণ করে নাও—'কি বাড়ি আছেন ?'

—প্রয়োজনটা কাকে ? মাদাম রোদ্যাঁ না মস্যুয়ে রোদ্যাঁ ?

বঙ্কিম পড়া নেই, তবু ওটা 'য়ুনিভার্সাল ট্রুথ'। 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।'

আমতা আমতা করে বলে, পারদঁ। একটি পত্র আছে মাদাম। মস্যুয়ে রোদ্যাঁর নামে।

—তবে খামকা মাদামের তত্ত্ব তালাশ নেওয়া কেন ?

হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নেয়।

ভয়ে ভয়ে পিয়ন-বইটা বাড়িয়ে ধরে বলে, একটা সই যদি—

—সই নিতে হলে পরে আসতে হবে বাছা। মস্যুয়ে রোদ্যাঁ বাড়ি নেই। আর যেখানে শুধু মস্যুয়ের একা নিমন্ত্রণ হয় সেখানে কি মাদামের সই চাওয়াটা.....

পিয়ন বেচারি ক্লীন নক-আউট।

দোরটা বন্ধ করে এবার খামটা খুলে দেখে। সোনালী বর্ডার। কী একটা এমব্লেম ; কার্ডের অনেকখানি জুড়ে ছাপা হরফ। মাঝের একটি পংক্তি শুধু হাতে লেখা। যতদূর আন্দাজ হয় নিমন্ত্রণপত্র। কিন্তু কোথায় ? কবে ? এটুকু বলতে পারে, এমন বাহারে চিঠি অগুস্ত তার সারা জীবনে পায়নি। সে ফিরে না এলে জানার উপায় নেই। পেতি অগুস্ত—মানে ওর তের বছরের ছেলে, অগুস্ত্ রেনে রোদ্যাঁর একমাত্র সন্তান, তখনও স্কুল থেকে ফেরেনি। বাড়িতে আর আছেন পাপা রোদ্যাঁ—আশী বছরের বৃদ্ধ—নিরক্ষর।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল মেরীরোজ ব্যুরের। খামটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে থাকে একটা প্যাকিং বাক্সের উপর। মূর্তিগুলো ঝাড়-পোঁছ করছিল এতক্ষণ। তাই গায়ে ময়লা হাউস-কোট। চিঠিখানা হাতে নিয়ে কেমন যেন উদাস হয়ে যায়। কাজে মন বসে না। বাড়ি নিঝঝুম। কনকনে শীত। ডিসেম্বরের শেষ। পাপা রোদ্যাঁ লেপের তলায় নিদ্রাগত—বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা। অগুস্ত্ স্টুডিওতে। ছেলে স্কুলে। কী করে ওর সময় কাটে ? উজান পথে ভেসে চলল ওর ভাবনা—তার তেত্রিশ বছরের জীবনের নানান ছবি।

জন্ম লোরেন-এ। জোন-অব-আর্কের দেশ। শৈশবেই মাকে হারিয়েছে। বাপ বিমাতাকে নিয়ে কোথায় আছে জানে না। সতের বছর বয়সে একাই চলে এসেছিল পারীতে। ভয় পায়নি। কিসের ভয় ? সে না জোন-অব-আর্কের দেশের মেয়ে ? লেখাপড়া জানে না, অক্ষর পরিচয় নেই—কিন্তু সেলাইয়ের হাত জবর। কাজ জুটিয়ে নিয়েছিল একটা দর্জির দোকানে। থাকত মেয়েদের ওয়ার্ক-ডর্মিটারিতে। একদিন ঘটনাচক্রে আলাপ হল অগুস্ত্ রোদ্যাঁর সঙ্গে, একটা কাফেতে। রোদ্যাঁর তখন চব্বিশ, ও সতের। প্রথম দর্শনেই প্রেম—জুলিয়েটের মতো ; রাধার মতো। তবে এক-তরফা। মেরী রোজই ঘাড় গুঁজড়ে পড়ল ঐ কেউ মানেনা ভাস্করের প্রেমে। অগুস্ত্ কস্মিনকালে বলেনি 'আই লাভ য়ু'। বলেছে, তোমার চুল সুন্দর, চোখ সুন্দর, ফিগার সুন্দর। তাই সই। তু-তু করতেই ঢুকে পড়ল তার স্টুডিওতে। সেই যে এল আর ফিরে গেল না। সতের থেকে তেত্রিশ—কত হল ? ও আঁক-জোকের ব্যাপার ; মেরী-রোজ বোঝে না। ও শুধু বোঝে ওকে নইলে অগুস্ত্ অসহায়। ওকে মডেল করে অনেক-অনেক মূর্তি গড়েছে অগুস্ত্। হেড স্টাডি এবং হ্যাঁ—ন্যুড। 'ব্যাকান্তি'। দু বছরের মাথায় ওর গর্ভে

এল অগুস্ত্-এর সন্তান—আজ সে তের বছরের বালক। তখন অগুস্তের মা বেঁচে। ওঁরা অগুস্তের এই মডেল আর তার অবৈধ সন্তানকে মেনে নিলেন। পাপা রোদ্যাঁ, থেরেস্-পিসি আর অগুস্ত্-এর মা বহুভাবে চেষ্টা করেছেন—কিন্তু একগুঁয়ে ছেলেটাকে রাজি করাতে পারেননি। মেরী রোজ ব্যুরে তার মডেল, সঙ্গিনী, তার বান্ধবী—স্ত্রী নয়। কোনদিন হবেও না। দোর খোলা আছে। যেতে চাও চলে যাও ; যদি থাক, সব দায়-ঝক্কি সে স্বীকার করে নিতে রাজী, মায় সন্তানেরও। কিন্তু ছেলের পোশাকী নাম দিয়েছে : 'অয়জেন অগুস্ত্ ব্যুরে'—রোদ্যাঁ নয়। বিবাহের আসল বাধাটা কোথায়, কী, তা আজও বুঝে উঠতে পারেনি। হ্যাঁ, সে স্বীকার করে—সে নিরক্ষরা, অগুস্ত্-এর সার্থক জীবনসঙ্গিনী হবার উপাদান হয়তো সত্যিই নেই তার ; কিন্তু অমন করে কোনও মেয়ে কি কোনোদিন অগুস্তকে ভালবাসভে পারবে ? প্রয়োজন হলে তার জন্য সে বুকের পাঁজর খুলে দিতে পারে। দিয়েছেও। অগুস্ত্ যখন যুদ্ধে যায় ; যখন সাত বছরের জন্য প্রবাসে যায়। ব্রাসেল্স্, আমর্স্টার্ডাম। ইতালী। সমস্ত সংসারের দায়দায়িত্ব তখন কি ঐ নিরক্ষরা মেয়েটিই মাথায় তুলে নেয়নি ? অগুস্ত্-এর ভাই নেই। দুই বোন ছিল। তারা অকালে সরে গেছে নেপথ্যে। বড় বোন ক্লোতিল্দ্ গৃহত্যাগ করেছিল, ছোট বোন মেরী মারা যায় সতের বছর বয়সে। সেই শূন্য স্থানটা এসে পূরণ করেছিল মেরী রোজ। পাপা রোদ্যাঁ তাকে মেয়ের মতই ভালবাসে।

অগুস্ত্-এর সঙ্গে জীবনে-জীবন জড়িয়ে কত দুঃখ-কষ্টই না সহ্য করেছে এতদিন ! পারীর শ্রেষ্ঠ বার্ষিক চিত্র-প্রদর্শনী—সালোঁতে—বারে বারে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে উদীয়মান শিল্পীর ভাস্কর্য : ম্যান উইথ দ্য ব্রোকন নোজ, ব্রোঞ্জযুগ, সেন্ট জন দ্য ব্যাপ্টিস্ত্ —তাতে অগুস্ত্ যতটা আঘাত পেয়েছে ঠিক ততটাই পেয়েছে
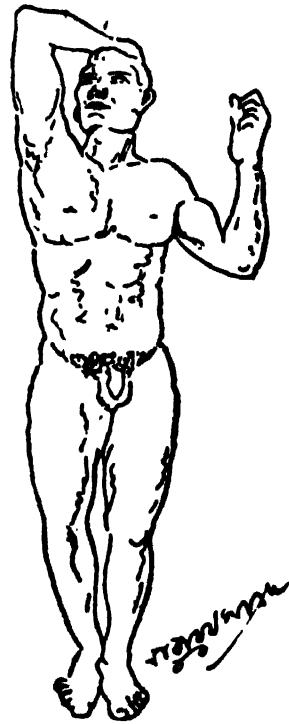
Vanquished, পরাজিত, ব্রোঞ্জযুগ (1876)

মেরী রোজ ব্যুরে। বরং বেশী। কারণ অগুস্ত্ তার শিল্পী বন্ধুদের কাছে দুঃখের কথাটা বলে মনটা হাল্‌কা করেছে, সহানুভূতি পেয়েছে। মেরী রোজ তা পায়নি। তার নিজের কোনও বন্ধু-বান্ধবী নেই। কম্পাসের কাঁটাটার মতো তার মন একমুখী। অগুস্ত্ তার শিল্পী বন্ধুদের সঙ্গে রোজ ব্যুরের পরিচয় করিয়ে দেয়নি ; এমনকি অগুস্তের কাছেও সে দুঃখের বোঝাটা

হাল্‌কা করতে পারে না—কারণ অগুস্ত্‌ ভাবে ও শিল্পের কিছুই বোঝে না। হয়তো কথাটা মিথ্যে নয়। ওর মনে থাকে না—'প্রিমাভেরা' রাফায়েলের আঁকা না লেঅনার্দোর; 'মোনালিসা' মিকেলাঞ্জেলোর না বত্তিচেলির! কিন্তু তাই বলে কি—

পাপা রোদ্যাঁ বলে, চিঠি এল বুঝি? কার? কোত্থেকে?

মেরী রোজ সুদৃশ্য খামটা বাড়িয়ে ধরে।

পাপা রোদ্যাঁ অবসরপ্রাপ্ত। পূর্বাশ্রমে ছিল নিরক্ষর ডাকপিয়ন। অক্ষর পরিচয় নেই, তবু এলেমের জোরে পুলিস বিভাগের চিঠি বিলি করে আসত পারীর বিভিন্ন অঞ্চলে। ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় খামটা দেখেই সমঝে নেয়। বলে, ভয় নেই; আদালতের সমন বা থানা থেকে নয়। নিমন্ত্রণপত্র। মস্যুয়ে ও মাদাম শার্পেতিয়ের পার্টি। অগুস্ত্‌ এতদিনে একটা কেওকেটা হয়েছে তাহলে, কি বল বৌমা?

পাপা রোদ্যাঁ জেদী, একরোখা। পুত্র তার উপর এককাঠি। পীড়াপীড়িতে ছেলে তার মডেলকে যেমন বিবাহ করেনি, তেমনি ছেলের আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে সে বরাবর মেরী রোজকে 'বৌমা' সম্বোধন করে এসেছে।

বেটা কে বাপ, মাদারী কো সাঁপ, কাটে-না-কাটে মারে অচানক লাফ!

মেরী রোজ বলে, কবে পার্টি?

বুড়ো প্রাণখোলা হাসি হাসে। বলে, অতটা বিদ্যে আমার নেই। এমব্রেমটা চিনি। যখন চাকরি করতুম তখন পুলিস-সাহেবের নামে এমন চিঠি আসত কি না। ছোট খোকন ইস্কুল থেকে এলে চিঠিটা দেখিও, সে বলে দেবে।

আবার পাশ ফিরে শুরু হল তার বার্ধক্য-নিদ্রা। মেরী রোজ এবার একটা চিন্তার সূত্র পেল। শার্পেতিয়ে-র নামটা সে জানে। শহরের এক হোমড়া-চোমড়া। তাঁর বাড়িতে মাসিক পার্টি হয়। অগুস্ত্‌ তাহলে এতদিনে জাতে উঠেছে। হবেই। অগুস্তের 'ব্রোঞ্জযুগ' নিয়ে যে কেলেঙ্কারীটা হল তারপর তাকে জাতে না তুললে জাত-জালিয়াৎদেরই জাতিচ্যুত হতে হত যে—

ব্রাসেল্‌স্‌ সালোঁতে যখন 'ব্রোঞ্জযুগ' প্রদর্শিত হয়, তখন তার নাম ছিল Vanquished —পরাজিত। সম্প্রতি প্রুশিয়ার কাছে ফ্রান্স হেরে ভূত হয়েছে। রাজনায়ক এবং সমর-নায়কদের অপরাধে অসংখ্য ফরাসী তরুণ প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছে। সেই বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঐ 'পরাজিত'-য়। অগুস্ত্‌-এর প্রথম প্রদর্শিত ভাস্কর্যে একটি দণ্ডায়মান তরুণ ডান হাত মাথায়, ক্ষোভে-দুঃখে-অপমানে পরমুহূর্তেই সে যেন মাথার চুল ছিঁড়তে শুরু করবে। সে হাতটা বলছে, হে আমার নেতার দল। গদির মোহে এ তোমরা কী করলে! বাঁ হাতে একটি যষ্টি। তাতে ভর দিয়েছে। সে হাতটা বলছে, তবু ভেঙে পড়লে তো চলবে না। অগুস্ত্‌ এ মূর্তিটি দাখিল করেছিল সালোঁতে। প্রথমে ব্রাসেল্‌স্‌ সালোঁতে, পরে পারীতে। কিন্তু প্রমাণ মাপের ঐ মূর্তিটা এতই বাস্তব যে, কোথা দিয়ে রটে গেল একটা মিথ্যা অপবাদ: শিল্পী একজন জ্যান্ত মানুষের দেহে মোমের ছাঁচ তুলে এ মূর্তি গড়েছেন। ফলে মডেল মারা গেছে! খবরের কাগজে কঠোর সমালোচনা হল। যারা 'স্ক্যান্ডেল' বেচে সাংবাদিকতার বাজার দখলে রাখে তারা নানান আজগুবি রোমহর্ষক কাহিনী ছড়ায়; যারা

একটু উঁচুদরের সাংবাদিক তারা বলে, মডেল মারা গেছে এতটা আমরা বিশ্বাস করি না ; কিন্তু ছাঁচ নিয়ে ভাস্কর্য একটা ক্রাফট্ হতে পারে, আর্ট নয়। সবচেয়ে বড় কথা এ মূর্তি শিল্প নয় : অশ্লীলতার দায়ে !

সালোঁ মূর্তিটা শিল্পীর স্টুডিওতে ফেরত পাঠালেন।

পরের বছর অগুস্ত্ সালোঁতে পাঠিয়ে দিল আর একটি মূর্তি : সেন্ট জন দ্য ব্যাপ্টিস্ত্। এটাও প্রাথমিক বিচারে প্রত্যাখ্যান করেছিল সালোঁ। শিল্পীর অপরাধ : তিনি সেন্ট জনকে সম্পূর্ণ নগ্নরূপে গড়েছেন ; এমনকি তাঁর অঙ্গবিশেষ অলিভ পাতায় আচ্ছাদিত করেননি।
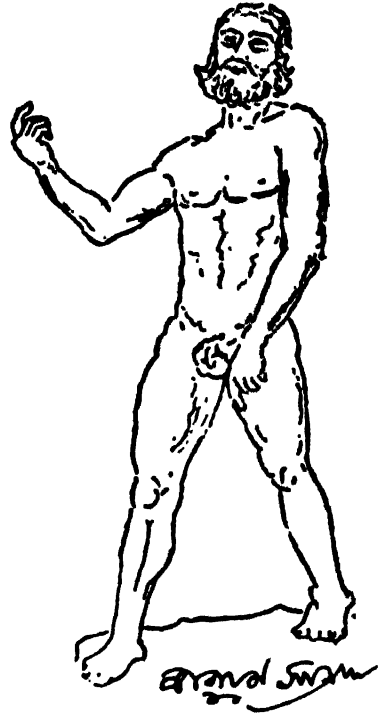
সেন্ট জন দ্য ব্যাপ্টিস্ত্ খ্রীঃপূঃ (১৪৭৮)

ঘটনাটা গত শতাব্দীর আশীর দশকের উষামুহূর্ত। নবাগত যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাবে পূর্বযুগের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, সমাজ-ব্যবস্থা, জীবনের মূল্যবোধ, সবকিছুই পাল্টে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের স্বাধিকার চিন্তা, আত্মসম্মানের ধারণা নূতন আগমনী গাইতে শুরু করেছে। তারই প্রতিফলন দেখা দিচ্ছে সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নাটকে, চিত্রশিল্পে। ভিক্টর হ্যুগো তখনও দোর্দণ্ড প্রতাপে জীবিত, কিন্তু প্রগতিশীল ফরাসী নূতন পথের সন্ধান খুঁজছে বালজাক-এ, এমিল জোলায়। কবি ম্যালার্মে এবং বোদ্‌লেয়ার আনলেন নূতন মূল্যবোধ ; পূর্বাকাশে উদিত হচ্ছেন মোপাসাঁ। চিত্রজগতে ফরাসীদেশে দাভিদ-দেলাক্রয়ে-আঙরে-র বাস্তবতাকে অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন ইমপ্রেশনিস্ট্ শৈলীর তরুণ শিল্পীরা : মানে, মনে, সিস্‌লে, রেনোয়াঁ

এমনকি তরুণদের সে শিল্পচিন্তা আরও নতুন নতুন ঢঙে বিকশিত হতে চাইছে তরুণতর মাতিস, সেজান, দেগা, তুলোস-লুত্রেক, ভ্যাঁস ভান গখে। শুধু ভাস্কর্যই পিছিয়ে পড়ে থাকবে ?

অগুস্ত্-এর সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন তদানীন্তন পারীর 'কল্লোলগোষ্ঠী'—এমিল জোলা, ম্যালার্মে প্রভৃতি। সালোঁ এ আন্দোলনকে পুরোপুরি আগ্রহ্য করতে পারল না। তিনজন প্রগতিবাদীতে পাঠিয়ে দিল অগুস্ত্-এর সঙ্গে একটা রফার প্রস্তাবে : কবি স্তিফেন ম্যালার্মে, চিত্রশিল্পী অয়জেন কারিয়ে এবং ভাস্কর আলফ্রেড বুশ্যো। অগুস্ত্ স্বীকৃত হল না জনের অঙ্গবিশেষ অলিভ পাতায় ঢেকে দিতে। বোধ করি সে বলতে চেয়েছিল : জন-এর নগ্নতা গ্রীক দেব-দেবীদের অনাবরণ দেহের মতো সুন্দর। আমরা হলে যোগ দিতুম—জৈন তীর্থঙ্করদের মতো, লাকুলীশের মতো, শ্রবণবেলগোলার গোমতেশ্বরের মতো।

সে যাই হোক, শেষ পর্যন্ত অগুস্ত্-এর শিল্পগুরু ওরেস-লেকক্ বোয়াবোদ্রাণ-এর হস্তক্ষেপে সমস্যার সমাধান হল। লেকক স্বহস্তে যখন একটি অলিভ পাতায় জন-এর লজ্জা নিবারণ করলেন—অর্থাৎ পারী দর্শকের—তখন অগুস্ত বাধ্য হয়ে সেটা মেনে নিল। তার ভাস্কর্য প্রদর্শিত হল সালোঁতে। 'জন দ্য ব্যাপ্তিস্ত'-কে দেওয়া হল থার্ড প্রাইজ : ব্রোঞ্জ মেডেল। এটাই তার জীবনে প্রথম সরকারী স্বীকৃতি। শুধু তাই নয়, দুটি মূর্তিই ফরাসী সরকার কিনে নিলেন বেয়াল্লিশ 'শ' ফ্রাঁ-জোড়ায়। তাতে ঢালাই খরচ বাদ দিয়ে অগুস্ত্-এর জেব্-এ এল সামান্যই। তবু সেটাও তার জীবনে প্রথম সরকারী মহলে বিক্রয়।

আমাদের কাহিনীরপটোত্তোলনহচ্ছে এই শুভ মুহূর্তে। আজ থেকে প্রায় একশ দশ বছর আগে ; যখন অগুস্ত-এর বয়স চল্লিশের কোঠায় এবং যখন মেরী-রোজ তার প্রত্যাবর্তনের পথ চেয়ে খামখানা নিয়ে অপেক্ষা করছে।

পেতি অগুস্ত্ ফিরে এল স্কুল থেকে সন্ধ্যা নাগাদ ; কিন্তু রহস্যজাল ভেদ করা গেল না। খামখানা একনজর দেখে সে বলল, বাপি ফিরে এলে জিগ্যেস কর, আমি এখন ব্যস্ত। একটা ম্যাচ আছে।—বলেই হুড়মুড়িয়ে বার হয়ে গেল খেলার মাঠে।

অগুস্ত্ ফিরল রাত করে। চিঠিখানা পড়ে মুখটা উজ্জ্বল হল তার। ডিসেম্বরের একত্রিশে শাপেতিয়ের নববর্ষ পার্টিতে আমন্ত্রিত হয়েছে সে। অভিজাত মহলে শিল্পী হিসাবে এই তার প্রথম স্বীকৃতি। পাপা রোদ্যাঁ উচ্ছ্বসিত। বলল, আর কে কে আসবেন ?

—তা কেমন করে জানব ? আন্দাজ করতে পারি মাত্র। মিনিস্টার ফাইন আর্টস্, আন্তোনি প্রুস্ত্ আর তৃতীয় রিপাবলিকের মুকুটহীন রাজা গাম্বেতা নিশ্চয় আসবেন। এদমন্দ্ তার্কুয়ে আসবেন সম্ভবত ; তিনি ঐ বিভাগের আন্ডার-সেক্রেটারী। শিল্পীদলের অনেকেই আসবেন: মানে, মনে, দেগা, রেনোয়াঁ। কবিদের মধ্যে ম্যালার্মে এবং সাহিত্য জগতের ভিতর হয় য়্যুগো, নয় জোলা।

—হয় ইনি, নয় উনি কেন ? দুজনেরই নিমন্ত্রণ হবে না ?

—বোধহয় নয়। শুনেছি ওঁদের ইদানীং মুখ দেখাদেখি বন্ধ। য়্যুগোর বয়স তোমার সমান, আশী ; আর জোলা ঠিক আমার বয়সী, চল্লিশ। এমিল জোলার প্রথম অপরাধ তার বই আজ বেশি বিক্রি হয় ; দ্বিতীয় অপরাধ, সে প্রকাশ্যেই বলেছে তার পূর্বসূরী বালজাক ; য়্যুগো

বা দুমা নন।

মেরী রোজ বলে, পার্টিতে তুমি কী পরে যাবে?

মেয়েমানুষের উপযুক্ত প্রশ্ন। যেন সেটাই সমস্যা। অগুস্ত্ বলল, কিছু ভেব না তুমি। এসব পার্টিতে যাবার উপযুক্ত পোশাক একরাতের জন্য সস্তায় ভাড়া পাওয়া যায়।

—তাহলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেও প্লীজ। আমি বেছে দেব পোশাকটা।

এটুকুতেই সে সন্তুষ্ট। পার্টিতে তার নিমন্ত্রণ হয়নি, হবেও না কোনদিন। না হোক, অগুস্ত্ যখন পথ দিয়ে পার্টিতে যাবে আর ও যখন ভেনিশিয়ান ল্যুভারটা উঁচু করে দেখবে তখন অন্তত যেন সে মনে মনে বলতে পারে : 'রাজপথ দিয়ে চলে এত লোকে, এমনটি আর পড়িল না চোখে, আমার যেমন আছে।'

কবিপত্নী নয়। কবি-মানসীও নয়—স্টোনকাটারের মডেল!

অগুস্ত্ এর পর যে ভাস্কর্যটি গড়ে তার নাম ঈভ্ (১৮৮১)। জ্ঞানবৃক্ষের ফলের রসাস্বাদনের পরের মুহূর্তটি। মূর্তিটা বর্ণনা দেবার আগে বলি—অগুস্ত্ রোদ্যাঁর শিল্পকে বুঝে নিতে হলে দু-দুটি পূর্বজ্ঞান আবশ্যিক : গ্রীক জীবনদর্শন ও উপকথা এবং উনবিংশ শতকের নব

ঈভ
ম্যাসাচ্চিও

ঈভ
মিকেলাঞ্জেলো
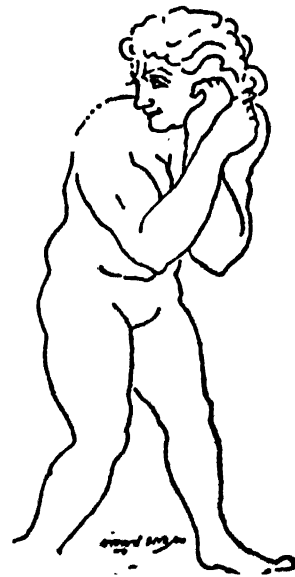
মূল্যবোধ। অজন্তা দেখতে যাবার আগে যেমন জেনে যেতে হবে : বুদ্ধের জীবনদর্শন ও বাণী এবং জাতক কাহিনী। রোদ্যাঁর শিল্পদর্শনে এই দুটি ভিন্ন সহস্রাব্দীর অনুভাবনা অপূর্ব এবং অদ্ভুতভাবে মিশেছে। সমকালই তাঁর শিল্পে প্রতিফলিত; কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল-যুগের বহিরাবরণে। 'কেন' বোঝাতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে; তার চেয়ে সহজ—একটি

সমান্তরাল উদাহরণ দাখিল করা। ভেবে দেখুন—মাইকেলের কথা। তিনি তাঁর নবাবিষ্কৃত 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দটার শক্তি যাচাই করতে বহিরাবরণ হিসাবে বেছে নিলেন রামায়ণকে। শুধু ছন্দের নয়, ভাবরাজ্যের বৈপ্লবিক চিন্তার বিকাশও হবে ঐ ক্ল্যাসিক্যালত্বের নির্মোকে। রামায়ণে যে ছিল খল-নায়ক সে হবে তাঁর নায়ক ; পরিবর্তে রামায়ণের নায়ক হবে তাঁর খল-নায়ক। রোদ্যাঁও বারে বারে গড়েছেন এ-জাতীয় 'মেঘনাদবধ কাব্য'। প্রথমেই যদি আইপীসটাকে ঠিকমতো 'ফোকস্' করে নিতে না পারি তবে ভুল স্থানে ভুল মূল্য দিয়ে যাব ক্রমাগত। রোদ্যাঁ-ভাস্কর্যের অন্তর্লীন ব্যঞ্জনাটি অধরাই থেকে যাবে, অহেতুক উচ্ছ্বাসপ্রবণ হয়ে যাব তার রিয়্যালিজম-এ। তার নারী-মূর্তির পেলবতায় রমণীয়তা, আর পুরুষ-মূর্তিতে মাংসপেশীর বাস্তবতায়। 'ঈভ' অনুভাবনাটি ক্ল্যাসিক্যাল। মাসাচ্চিও তাকে গড়েছেন ফ্লোরেন্সের গীর্জায় হাই রেনেসাঁর ঊষাকালে। সেখানে স্বর্গ থেকে বিতাড়িতা 'ঈভ' অনুশোচনায়, পাপবোধের তাড়নায় আর্তনাদ করছে। এঁকেছেন মিকেলাঞ্জেলো সিসতিন চ্যাপেলের সিলিঙ-এ। লক্ষ্য করে দেখুন, সেখানে 'ঈভ' লগুড়াহতা কুক্কুরীর মতো পলায়নপরা। অর্থাৎ জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদনের পরে ঈভ-এর অনুশোচনা জেগেছে। সে আজ নিঃস্ব। কাঙাল। পথের ভিখারিণী। এটাই ছিল এতদিন ক্লাসিকাল ঈভ-এর বক্তব্য। ঈভ-এর অনুশোচনা, তার পাপবোধ, তার হতাশাই এতদিন ছিল ঈভ অনুভাবনার অনুষঙ্গ।

অগুস্ত-এর ঈভ সে পথে যায়নি। সে অন্য কথা বলতে চায়। তার অনুশোচনা এখানে বড় হয়ে ওঠেনি ; তার পাপবোধ বা হতাশার কোনও লক্ষণই নজরে পড়ে না। নিঃসন্দেহে অগুস্তী-ঈভ লজ্জা পেয়েছে, কিন্তু 'লজ্জা পেয়েছে বলে' লজ্জা পায়নি। সে পলায়নপরা নয়। থমকে দাঁড়িয়েছে মাত্র। নিজের যৌনাঙ্গ বিষয়ে সদ্য-আহরিত জ্ঞানে সে সচেতন। দুটি হাতের বেষ্টনীতে সে স্তনযুগলকে আবৃত করেছে। দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদন করেছে তার বাম স্তন। কিন্তু এ মূর্তির সার্থকতা তার বাঁ হাতের মুদ্রায়। যেন, সে হাতের বক্তব্য, না না, ছি ছি ! ও কথা বল না।

—কী কথা ? কী বলব না ? সেটা শিল্পী বলেননি। বলব তুমি-আমি ! এখানেই রোদ্যাঁ শিল্পের বৈশিষ্ট্য। রোদ্যাঁ মূলত দ্বৈতবাদী। শিল্পী তৈরী পানীয়টি বাড়িয়ে ধরবেন আর তুমি পাঁচকথা ভাবতে ভাবতে আনমনে সিপ দেবে—তা হবে না। উনি ট্রে-তে সব কিছু সাজিয়ে বাড়িয়ে ধরবেন, তুমি ইচ্ছা মতো দুধ-চিনি মেশাবে। তিক্ত-কষায় স্বাদ হলে তার দায়ভাগ তোমাতে বর্তাবে। ওঁর শিল্পের এই দ্বৈতবাদিতার কথাটা আমাদের আগেভাগে জানানো হয়নি। তাই বিড়লা অ্যাকাদেমিতে আমরা বারে বারে শিল্পস্বাদ পাইনি। দেখেছি, বুঝিনি। হতাশ হয়েছি। পাদপূরণের দায় যে আমারই তা কেউ বলে দেয়নি।

আমার তো মনে হয়েছে ঐ বাঁ হাতের মুদ্রাটির পুরো বক্তব্য 'না না, ও কথা বল না। স্বর্গ হারিয়েছি বটে ; কিন্তু তাতে দুঃখ করব কেন ? বিতাড়িত হয়েছি ? বেশ, চলে যাব। কিন্তু শুধু অনুশোচনা নিয়ে কেন ? সুখস্মৃতিটুকুকেও নিয়ে। তা ছাড়া নূতন এক স্বর্গও তো পেলুম ? সেটাই বা কম কী !'

কী সেই নূতন স্বর্গ ? ওর সদ্য-আহরিত জ্ঞানের ফলশ্রুতি : এই জন্ম-মৃত্যু, হাসি-কান্না ভরা মর-দুনিয়া। স্বর্গে আলো আছে, ছায়া নেই ; কিন্তু ছায়াই তো আলোকে ফুটিয়ে তোলে।

স্বর্গে মিলন আছে, বিরহ নেই : কিন্তু বিরহই তো মিলনকে সার্থক করে তোলে। স্বর্গে সন্তানের মঙ্গল কামনায় 'নীলের কোলে বাতি' দেবার প্রয়োজন হয় না। সেখানে তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বালতে হয় না, ঘরে না-ফেরা মরদের রাত হলে উৎকণ্ঠায় অধীর হতে হয় না ; অভুক্ত স্বামী-পুত্রের পাতে হাঁড়ির শেষ কটা দানা পরিবেশন করে মিথ্যা বলার তৃপ্তি নেই : আমার ভাত আলাদা সরানো আছে।

এই বেদনাময় আনন্দকে স্বর্গ জানে না, জানে মর্ত্য।

ঐ আভঙ্গঠামে দাঁড়ানো মেয়েটি, যার দক্ষিণপদে সংসারের যাবতীয় দায়ঝক্কি বইবার গৃহিণী-প্রতিম দৃঢ়তা, যার বামপদ অভিসারিকার মতো চঞ্চল, সে স্বর্গ হারিয়ে নতুন স্বর্গ রচনার অধিকার পেয়েছে। এ মূর্তিটি—শুধু এটিই নয়, সব ভাস্কর্যই, ঘুরে ফিরে দেখার। স্বয়ং রোদ্যাই একবার তাঁর বন্ধু এডগার দেগাকে লিখেছিলেন, "আলোকচিত্রের মাধ্যমে কোনও ফটোগ্রাফার কোনদিন মিকেলাঞ্জেলোর ডেভিডকে ধরতে পারবে না। পূর্ণ রসাস্বাদের জন্য ডেভিডকে প্রদক্ষিণ করা প্রয়োজন।"—কিন্তু দ্বিমাত্রিক কাগজে কেমন করে আপনাদের হাত ধরে 'ঈভ্'-কে প্রদক্ষিণ করি ? তাই দুধের স্বাদ আপাতত পিটুলি গোলাতেই পরিবেশন করি। তিন-তিনটি স্কেচে ঈভ্কে ধরবার চেষ্টা করেছি,—তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে।

ঈভ্-এর মডেলের গল্প বলি এবার। কীভাবে এই ভাস্কর্যের অনুপ্রেরণা পেলেন উনি। ঈভ্-এর মডেল মারী-রোজ ব্যুরে নয়, লীজা।

ঈভ, রোদ্যাঁ (1881)
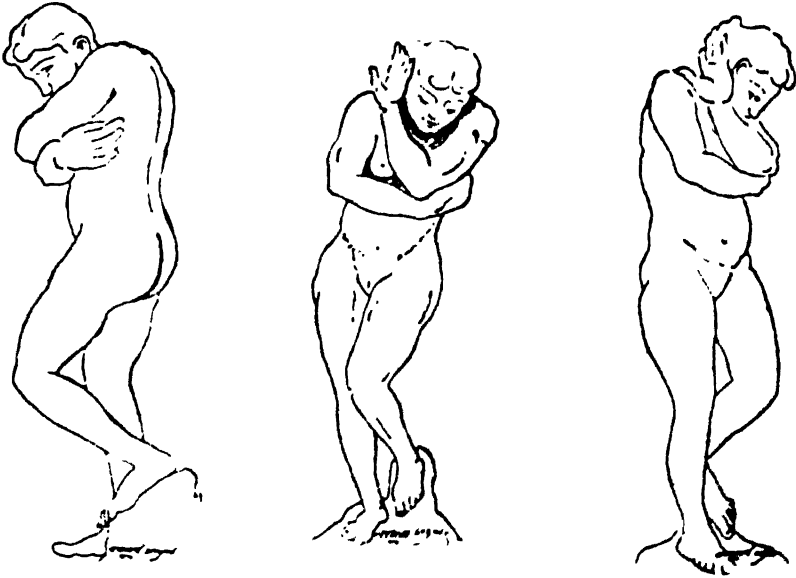
অগুস্ত্ যখন ইতালী প্রদক্ষিণ করছিল—তুরিন, জেনোয়া, পীসা, ফ্লোরেন্স এবং রোম, তখনই ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল পাপিনোর। লোকটা বিদেশী ট্যুরিস্টদের গাইড-এর কাজ

করত। ইতালিয়ান, কিন্তু ইংরেজী ও ফ্রেঞ্চ ভাঙাভাঙা বলতে পারে। তার দেহাকৃতিতে আকৃষ্ট হয়েছিল অগুস্ত্। বলেছিল, কখনও পারীতে এলে আমার সঙ্গে দেখা কর। তোমাকে মডেল করে একটা মূর্তি গড়বার ইচ্ছা। সেই কথা স্মরণে রেখে বছর তিনেক পরে ঘুরতে ঘুরতে পাপিনো একদিন পারীতে ওর স্টুডিওতে এসে হাজির। অগুস্ত্ তাকে বহাল করে দৈহিক পাঁচ ফ্রাঁতে। ওকে মডেল করেই বানিয়েছিল 'জন দ্য ব্যাপ্তিস্ত্'।

কিছুদিন পরে লোকটা আবার এসে হাজির। বলে, কাজ কাম আছে, স্যার ?

অগুস্ত্ দেখে লোকটা এবার একা আসেনি। তার সঙ্গে একটি যুবতী। বছর চব্বিশ-পঁচিশ। স্বাস্থ্য ভালো। অগুস্ত্ জানতে চায়, ও কে ? তোমার বউ—

—না না মেৎর। বউ হবে কেন ? ও লীজা ; সম্পর্কে আমার বোন হয়। ও রোম থেকে চলে এসেছে রুজি-রোজগারের ধান্দায়।

অগুস্ত জানালো, পাপিনোকে মডেল করে কিছু বানানোর বাসনা তার আপাতত নেই। কিন্তু লীজা রাজি হলে তাকে মডেল করে সে কিছু গড়তে পারে।

লীজা এতক্ষণে আলোচনায় অংশ নেয়, বলে, কত করে মজুরী দেবেন, বাবু ?

—দৈনিক পাঁচ ফ্রাঁ। যা সবাইকে দিই।

—কী বানাবেন আমাকে নিয়ে ?

—তা এখনই কেমন করে কবুল করি ? আর তা নিয়ে তোমার কেন মাথাব্যথা ?

—না, আমি জানতে চাইছি, আমাকে কি 'ইয়ে' হতে হবে ?

—হ্যাঁ হবে। 'ইয়ে' না হলে পয়সা দিয়ে মডেল পুষব কেন ?

লীজা মাথা ঝাঁকায়, তাহলে পাঁচ ফ্রাঁয় হবে না। কাপড় জামা খুলতে হলে দশ ফ্রাঁ দৈনিক চাই।

অগুস্ত্ বলে, তাহলে পথ দেখ বাছা। এখানে সুবিধা হবে না।

অনেক দরাদরির পর দৈনিক সাত ফ্রাঁতে লীজা রাজি হল। তাও শর্তসাপেক্ষে। প্রথম শর্ত, মজুরি তাকে দৈনিক মিটিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত, সে যখন বিবস্ত্রা অবস্থায় মডেল স্ট্যান্ডে উঠে দাঁড়াবে তখন স্টুডিওতে অন্য কোনও পুরুষমানুষকে ঢুকতে দেওয়া চলবে না।

অগুস্ত্ বলে, অচেনা-অজানা কেউ আসবে না, কিন্তু পাপিনোকে আমার দরকার হতে পারে। হয়তো একই সঙ্গে তারও কোন মূর্তি গড়ব আমি।

প্রচণ্ড প্রতিবাদ করে লীজা, না না, সে কিছুতেই হবে না। ও আমার দাদা।

পাপিনোও হাঁ-হাঁ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এটা কী বলছেন মেৎর ? লীজা আমার ছোট বোন, সে যখন 'ইয়ে' হয়ে স্টুডিওতে...ছি ছি ! তা হতেই পারে না।

অগত্যা তাই স্থির হল।

প্রথম দিন-সাতেক অগুস্ত্ মনস্থির করতে পারছিল না—সে কী গড়বে। বিবস্ত্রা অবস্থায় লীজাকে ক্রমাগত পদচারণা করতে হয়েছে, আর ও দূর থেকে স্কেচ করে গেছে। সামনে থেকে, পাশ থেকে, পিছন থেকে। লীজা বারবার জানতে চেয়েছে—কেন মূর্তি গড়ার কাজে হাত দিচ্ছে না ভাস্কর। অগুস্ত্ ধমকে দিয়েছে, তাতে তোমার কোন্ পাকাধানে মই দেওয়া

হচ্ছে ? মজুরি তো তুমি পাচ্ছই।

তা পাচ্ছে। পাপিনো ওকে পৌঁছে দিয়ে যায়। আবার দিনান্তে এসে বোনকে বাড়ি নিয়ে যায়, টাকা গুনে নিয়ে।

তারপর একদিন। অগুস্ত-এর আদেশে লীজা উঠে দাঁড়িয়েছে মডেল-স্ট্যান্ডে। অগুস্ত তার অভ্যস্ত 'অন্ধের হস্তিদর্শনের' ভঙ্গিমায় এগিয়ে আসে। এটা ওর এক বিচিত্র বৈশিষ্ট্য। ওর ধারণা—শুধু চোখে দেখে কোনও ত্রিমাত্রিক বস্তুর অন্তর্লীন স্বরূপ সে উপলব্ধি করতে পারে না। চোখে দেখার পর সে দু-হাতের দশটি আঙুলে চোখ বুজে মডেলের শরীরের তরঙ্গভঙ্গ উপলব্ধি করে। মডেলের দেহের উত্তাপ আঙুলে লেগে থাকতে থাকতে সে কাদামাটিকে রূপান্তরিত করে। আঙুল দিয়ে যখন সে দেখে তখন তার চোখ দুটি বন্ধ থাকে। সে ভাবেই সে সমঝে নিতে গেল লীজার দেহের কন্টুর—যৌবনতরঙ্গ। লীজা প্রথমটা আপত্তি করেছিল। পরে ধমক খেয়ে চুপ করল। নিমীলিত নেত্রে ভাস্কর স্থাপন করল তার দুহাত ওর মাথায়। নেমে এল কাঁধ বেয়ে বাহুমূলে, ক্রমে আঙুলের ডগায়। তারপর কণ্ঠদেশ থেকে স্তনাগ্রচূড়ায়। লীজা একটু উশখুশ করল, কিন্তু আপত্তি করল না আর। এবার বক্ষদেশ থেকে দশটি আঙুল নামতে নামতে এল ওর তলপেটে। এসেই থমকে গেল। শিউরে উঠল লীজা। এবং অগুস্ত। এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, এ কী! এ কথা বলনি কেন ?

—কী কথা ?

দৃষ্টি যা বোঝেনি এতদিন, শিল্পীর আঙুল তা বুঝে ফেলেছে।

—বলে, ক মাস ?

লীজা নিরুত্তর। লজ্জায় যেন মাটিতে মিশে যেতে চায়।

—তুমি যে মা হতে চলেছ সে কথা বলনি কেন ?

লীজা সহসা দুটি হাতে আবৃত করে তার স্তনদ্বয়।

—পেটে যেটা এসেছে তার বাপ কে ? পাপিনো ?

লীজা শিউরে ওঠে। জবাব দিতে পারে না। মাথাটা আরও নেমে আসে। বাঁ-হাতটা তুলে যেন বলতে চাইল : ছি ছি। ও কথা বল না।

আর সেই খণ্ডমুহূর্তেই শিল্পী খুঁজে পেল তার বিষয়বস্তু : 'ঈভ'।

বললে, তুমি না বলেছিলে, ও তোমার দাদা ?

—কাজিন।

—তোমাকে এতদিন যে মজুরী দিয়েছি তা ফেরত দিতে হবে। তোমাকে নিয়ে কী গড়ব আমি ?

হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ালো লীজা। অনাবৃত, নিঃসঙ্কোচ। বললে, কেন ? মা হওয়া কি অপরাধ ? পাপ ?

না! মাতৃত্ব কোন অপরাধ নয়! পাপ নয়। স্বর্গ থেকে বিদায় মুহূর্তে ঈভ্ যদি স্বয়ং জগদীশ্বরকে দৃপ্ত ভঙ্গিতে ঐ প্রশ্নটা পেশ করত তাহলে তিনি কী জবাব দিতেন ?

☆ ☆ ☆

সে'ন-এর দক্ষিণ পারের চেয়ে উত্তর পারেই নয়নমনোহর সৌধ সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং ভীড়টাও সেদিকে বেশি। বোধকরি সেজন্যই মস্যুয়ে শার্পেতিয়ে নদীর বাম তীরকে পছন্দ করেছেন এবং সমগ্র পারী নগরীর অন্যতম হৃদয়গ্রাহী প্রাসাদটি বানিয়েছেন। আরও একটি প্রভেদ আছে। অধিকাংশ প্রাসাদই গড়ে উঠেছে, এটি শুধু ফুটে উঠেছে। সামনে প্রকাণ্ড লন, পোর্টিকো, হল-কামরা—ভিতরে কী আছে খোদায় মালুম। রু দ্য গ্রেনেলে পৌঁছে অগুস্ত্ দিশেহারা হয়ে গেল। গাড়ির পর গাড়ি, তকমাধারীর ছড়াছড়ি। কার্টিসী বাও আর 'বঁসুর'-এর বাড়াবাড়ি। গাড়ি সবই অশ্বচালিত। ব্রুহাম, ভিক্টোরিয়া, ফিটন আর ল্যান্ডোই বেশি। অগুস্ত্ একটা ভাড়া করা হ্যাকনিতে এসেছিল, কাছাকাছি এসে ছেড়ে দিল গাড়িটাকে। নিমন্ত্রিত যে কতজন আন্দাজ করা অসম্ভব। একটি উচ্চ মঞ্চে মাদাম ও মস্যুয়ে দণ্ডায়মান, নিমন্ত্রিতরা লাইন করে মঞ্চের দিকে যাচ্ছেন, কর্তা-গিন্নীর করমর্দন করে ভীড়ে সামিল হচ্ছেন। পাশে খাড়া আছেন দু-তিনজন ; তাঁরা আগন্তুকের নাম, প্রয়োজনবোধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঘোষণা করছেন। তাঁরা বোধহয় জীবন্ত বিশ্বকোষ, সবাইকে চেনেন। লক্ষ্য হল, ও পাশে জনৈক করণিক আগন্তুকের নামটি ঘোষণামাত্র একটি 'বৈকুণ্ঠের খাতায়' লিপিবদ্ধ করে চলেছে। এ্যালফাবেটিক্যালি। পার্টি চলাকালে আগন্তুক সুযোগমত তাঁর স্বাক্ষরটি যথাস্থানে দিয়ে যাবেন—এটাই নিয়ম। অগুস্ত্ কিউ-সরীসৃপে সামিল হল এবং অচিরেই নিমন্ত্রণ-কর্তা-কর্ত্রীর সমীপে উপনীত হল।

একটা অস্বোয়াস্তিকর নীরবতা। বিশ্বকোষও ফেল মেরেছে। তার কালঘাম ছোটার উপক্রম : মস্যুয়ে..., ইনি হচ্ছেন স্বনামধন্য মস্যুয়ে পারদঁ...

অগুস্ত্-এর কান দুটি লাল হয়ে ওঠে। ভদ্রলোকের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে, আজ্ঞে না, মস্যুয়ে পারদঁ নয়, অগুস্ত্ রোদ্যাঁ।

মাদাম শার্পেতিয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর সেক্রেটারীর ত্রুটি সংশোধন করে নিয়ে বলেন, ভুল বুঝবেন না মস্যুয়ে রোদ্যাঁ, 'নাম নয়, 'গুণকীর্তন' কী ভাবে হবে তাই উনি খুঁজছিলেন।

ওর করগ্রহণ করে স্বামীর দিকে ফিরে বলেন, নবীন ভাস্কর। চিনতে পেরেছ ? সেই যে যার মূর্তিটি ছাঁচে বানানো বলে অভিযোগ উঠেছিল—

মস্যুয়ে শার্পেতিয়ে বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে। সেন্ট 'জন'কে যিনি—

পরবর্তী অতিথিটি ততক্ষণে অগ্রসর হয়ে আসায় সেন্ট জনকে সর্বসমক্ষে পুনরায় দিগম্বর হতে হল না। বাক্যটা অসমাপ্ত রইল। অগুস্ত্ মিশে গেল অতিথ্যারণ্যে। সব উৎসাহ নিবে গেছে তার ; শিল্পী হিসাবে তার দু-দুটি সার্থকতাই স্বীকৃত ! জ্যান্ত মানুষের ছাঁচ তোলা এবং সেন্ট জনকে ন্যাংটো করা। ব্যস ! আর কী চাই ? নববর্ষের সৌজন্য-আপ্যায়নে এটুকুই যথেষ্ট। ইচ্ছা হল বাড়ি ফিরে যায়। কিন্তু তখনই দেখা হয়ে গেল একজন শিল্পী বন্ধুর সঙ্গে—বুশ্যো।

বুশ্যো বললে, তোমাকে দারুণ মানিয়েছে কিন্তু এই স্যুটটায়।

অগুস্ত্ বলে, তবু ভালো, পোশাকটা তোমার নজরে পড়েছে। আমি ভাবছি, সবাই ভাবছে—পোশাকের তলায় আমিও ন্যাংটো—সেন্ট জন এর মতো।

—ইডিয়ট ! জর্জ আর মাদাম শার্পেতিয়ের পার্টিতে যারা প্রথম আসে তারা নিজেকে

সে সন্ধ্যায় সৌভাগ্যবান মনে করে। আর তুমি এরই মধ্যে ক্ষেপে গেছ। এস, তোমাকে কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

সামনের 'হল' কামরায় একটি প্রকাণ্ড তৈলচিত্রের সামনে সমবেত হয়েছেন কয়েকজন। তৈলচিত্রটি মাদাম শার্পেতিয়ে এবং তাঁর দুই সন্তানের। রেনোয়াঁ সম্প্রতি এঁকেছে। রেনোয়াঁ আর 'মানে' উপস্থিত, আরও একজন মধ্যমণি ছবিটি দেখছিলেন। ছবিটির উৎকর্ষ নিয়ে শৈল্পিক বিচার চলল কিছুক্ষণ। ক্ষণিক ছেদ পড়তেই বুশ্যো সেই মধ্যমণিকে বললে, মস্যুয়ে জোলা, আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দিই : অগুস্ত রেনে রোদ্যাঁ ! এ হচ্ছে—

এমিল জোলা ঘুরে দাঁড়ালেন। হাত তুলে থামতে বললেন বুশ্যোকে। আগন্তুককে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, আপনার 'জন' আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি আনন্দিত যে, আপনি ধর্মীয় নীতিবাগিশ নন, প্রকৃতি-প্রেমিক।

অগুস্ত একটি কার্টসি বাও করে বলে, দুটোর একটাও নই, আমি ভাস্কর।

—হতে পারে। কিন্তু আপনি বিদ্রোহী ভাস্কর।

—বিদ্রোহ আমি করতে চাইনি। পাকেচক্রে—

—এবার আমি দুঃখিত। সজ্ঞান বিদ্রোহীকে আমি সম্মান করি, পাকে-চক্রে বিদ্রোহীকে আমি করুণা করি। শিল্প একটি যুদ্ধক্ষেত্র। বিদ্রোহ যে সজ্ঞানে করতে নারাজ সে অচিরেই রাম-শ্যাম-যদুর দলে নাম লেখায়।

আলোচনার একটা সূত্র পাওয়া গেল। পাত্রাধার তৈল অথবা তৈলাধার পাত্র অর্থাৎ 'শিল্পের প্রয়োজনে বিদ্রোহ, না বিদ্রোহের প্রয়োজনে শিল্প' এই বিতর্ক নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল অগুস্তকে ছেড়ে।

বুশ্যো ওর হাত ধরে অন্যত্র নিয়ে চলে। রেনোয়াঁ বলে, জোলার কথায় মন খারাপ কর না অগুস্ত। ও একটু আগে তোমার সেন্ট জন-এর দারুণ প্রশংসা করছিল।

অগুস্ত গম্ভীর হয়ে বলে, আমি তার প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করতে যাইনি।

—অমন করে বল না, অগুস্ত। এমিল জোলা আমাদের পক্ষে, তরুণদের পক্ষে।

—এদগার দেগাকে দেখছি না যে?

—দেগার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি রিপাবলিকান নয়। শার্পেতিয়েরা মনেপ্রাণে রিপাবলিকান।

—অর্থাৎ রাজনীতি? আর মনে?

—মনে? তুমি জান না কামীল মারা গেছে গত সপ্তাহে?

অগুস্ত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কী বলছ? কী করে?

—এই পরিবেশে দাঁড়িয়ে সেটা বলতে আমার খারাপ লাগবে, শুনতে তোমারও। 'মনে' একেবারে ভেঙে পড়েছে। আহার নিদ্রা তো বৌ-র অসুখের সময়েই ছেড়ে দিয়েছিল। এখন ছেড়েছে ছবি আঁকা। ও তোমাকে ভীষণ ভালবাসে। সুযোগ মত একদিন ওর সঙ্গে দেখা কর। কেমন?

অগুস্ত কেমন যেন উদাস হয়ে যায়। কামীল মনে-কে মনে পড়ে যাচ্ছে তার। প্রাণচঞ্চলা শিল্পীগৃহিণী। প্রাণ দিয়ে আগলে রাখত মনে-কে। বললে, রেনোয়াঁ, আমাকে বল, কী হয়েছিল কামীলের? এমন রাতারাতি....

রেনোয়াঁ অস্ফুটে ওর কানে কানে বলে, রাতারাতি নয় বন্ধু। ডাক্তারেরা সার্টিফিকেট দিয়েছেন রক্তাল্পতাজনিত অসুস্থতার। সাদা ফ্রেঞ্চে যাকে বলে : অনাহারে।

শার্পেন্তিয়ে প্রাসাদের মহামূল্য শ্যান্ডেলেয়ার, চিপেন্ডেল ফার্নিচার, বাগানের ফোয়ারা, মর্মর-নগ্নিকা, প্রবেশপথের সারি সারি ব্রুহাম-ল্যান্ডো-ভিক্টোরিয়া মনে হল সব মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে।

এ সন্ধ্যায় ফরাসী শিল্প আশ্রয় নিয়েছে 'মনে'র সেই ঝোপড়িতে। ইউরিডিস-এর বিরহে যেখানে অরফিউস বীণা বাজাতে পারছে না আর। রঙ-তুলি ক্যানভাসের মাঝখানে নিশ্চুপ বসে আছে মহান শিল্পী 'মনে'। 'ওয়াটার লিলি' ডুবে গেছে অশ্রুহ্রদে।

বুশো ওর কানে কানে বলে, অগুস্ত, প্রবেশদ্বারের দিকে তাকিয়ে দেখ।

অগুস্ত মনে মনে 'মনে'র ঝোপড়ি ছেড়ে নেমে এল শ্যাম্পেন সমুদ্র সৈকতে।

প্রবেশদ্বারের কাছে একটা জটলা। নবাগতকে ঘিরে। নবাগতর পরিচয় ঘোষিত হল না। সেটুকু তাঁর সম্মানে। অশীতিপর ভিক্টর হ্যুগো আজকের পারীতে একজন ডেমিগড। ত্রিশের দশকে কলকাতা-শহরের কোনও জনসভায় রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করলে যে গুঞ্জন-প্রতিক্রিয়া হত সেটাই কল্পনা করুন।

তফাৎ আছে। হ্যুগো আশী বছরেও এক গাছের মতো সোজা ; তারুণ্যের সঙ্গে তাঁর অন্য জাতের প্রতিযোগিতা চলে আজও—প্রতি রাত্রে না হলেও প্রতি সপ্তাহেই তাঁর শয্যাসঙ্গিনীর বদল হয়। গোপন জনশ্রুতি—সাঁঝরাতে ও মাঝরাতে নায়িকার পরিবর্তন পর্যন্ত হয়ে থাকে মাঝে মাঝে। তাঁর লেখনী আজও সচল—এটুকু সবাই জানে ; কিন্তু অল্প কিছু অভিজ্ঞ মহল খবর রাখেন হ্যুগো ইদানীং লর্ড বায়রন কিংবা তাঁর মানসপুত্র ডন জুয়ানের রেকর্ড বিচূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর।

অগুস্ত আপনমনে বলে ওঠে : ঐ মাথাটা আমার চাই।

—মাথাটা ! হ্যুগোর মাথা। ক্ষেপে গেলে নাকি ?

অগুস্ত লজ্জা পায়। বলে, না, মানে কী অসাধারণ মাথাটা। মিকেলাঞ্জেলো ওঁকে দেখলেও ঐ কথা ভাবতেন। অমন একটা হেডস্টাডি করতে পারলে সব ভাস্করই ধন্য।

—তুমি সিরিয়াস ?—বুশো জানতে চায়।

—মানে ? তুমি সুযোগ করে দিতে পারো ? হ্যুগো সিটিং দেবেন ?

—না, আমি পারি না। তবে, ম্যালার্মে পারে। কবি ম্যালার্মেকে উনি দারুণ স্নেহ করেন। ম্যালার্মের সঙ্গে তোমার আলাপ আছে ?

—আছে। সাঁলোর তরফে ম্যালার্মে এসেছিল আমার স্টুডিওতে 'সেন্ট জন'কে অলিভ পাতায় গ্রহণযোগ্য করার প্রস্তাব নিয়ে।

—এস তবে আমার সঙ্গে। আগে ম্যালার্মেকে ধরা যাক।

সব শুনে ম্যালার্মে বললে, আমি তোমার জন্যে চেষ্টা করে দেখতে রাজি আছি অগুস্ত। ভেব না, তোমাকে করুণা দেখাতে রাজি হলুম আমি—এ আমাদের নিজেদের স্বার্থে ! হ্যুগোর উপযুক্ত মূর্তি আজও কেউ বানাতে পারেনি যা ফ্রান্স অনাগতকালকে উপহার দিতে পারে। তোমার হাতের কাজ আমি দেখেছি। হয় তো তুমি পারবে।

—এস—

বুশ্যে বলে, একটা কথা। অগুস্ত্ যে একটু আগে জোলার সঙ্গে কথা বলছিল তা কি বুড়ো কর্তা দেখেছেন?

অগুস্ত বললে, কেন? তার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?

ম্যালার্মে বলে, সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। জোলা আর য়্যুগোর মধ্যে বাক্যালাপ হয় না। তুমি আগে জোলার কাছে গেছ জানতে পারলে—

অগুস্ত বলে, তাহলে শার্পেতিয়ে দুজনকে একসঙ্গে নিমন্ত্রণ করেন কেন?

—কাকে বাদ দেবে? য়্যুগো বাদে পার্টি হচ্ছে ডেনমার্কের রাজপুত্রহীন 'হ্যামলেট'; আর জোলার যাবতীয় গ্রন্থের প্রকাশক জর্জ শার্পেতিয়ে। বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা?

বুশ্যে আর রেনোয়াঁ মানে-জোলা জটলার দিকে এগিয়ে যায়, আর অগুস্তকে নিয়ে ম্যালার্মে চলে আসে য়্যুগোর কাছে।

য়্যুগোকে ঘিরে ধরেছেন ডজনখানেক 'ফ্যান'। কবি তাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, আধুনিক কবিতায় দোষ ত্রুটি কোথায় হচ্ছে। কেন নবীন গোষ্ঠী—বদলেয়ার, ম্যালার্মে প্রভৃতি য়্যুগো-চূড়ায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। হঠাৎ ম্যালার্মেকে আগিয়ে আসতে দেখে ওদের দিকে চোখ টিপে বলেন, আলোচনা এইখানেই অসমাপ্তভাবে সমাপ্ত; হেতু—কবি ম্যালার্মে স্বয়ং এগিয়ে আসছেন।

—এস এস, নবীন কবি। তোমারই জয়গান গাইছিলাম আমরা।

ম্যালার্মে বলে, আপনার সঙ্গে আলাপ করাতে নিয়ে এসেছি! আমার বন্ধু অগুস্ত রোদ্যাঁ। প্যরীর সবচেয়ে আলোচিত ভাস্কর।

—নাকি? খুব আনন্দের কথা।

—এবারের সালোঁতে 'সেন্ট জন দ্য ব্যাপ্তিস্ত' আর 'ব্রোঞ্জযুগ' নামে দুটি ভাস্কর্য—

—ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তোমার হাতের কাজ আমার ভালো লেগেছে, রোদ্যাঁ। অবশ্য সেন্ট জন-এর ঐ অলিভ পাতাটা অশ্লীল।

নিজের নামটা বিকৃত হওয়ায় রোদ্যাঁ ততটা আহত হয়নি, যতটা আনন্দ লাভ করেছে শুনে, অলিভ পাতাটাকে উনি অশ্লীল বলে বিবেচনা করেছেন।

ম্যালার্মে বলে, ওর আদম-ঈভ অনবদ্য, ব্রোঞ্জযুগ......

—আদম-ঈভ আমি দেখিনি। সে দুটোও কি ছাঁচে বানানো?

অগুস্ত্ স্তম্ভিত! বিরক্তি প্রকাশ করতে সে শুধু সশব্দে তার পানপাত্রটা টেবিলে নামিয়ে রাখে।

ম্যালার্মে যোগ করে, ও আপনার একটা হেডস্টাডি....

—এনাফ্! —মাঝপথেই থামিয়ে দেন মহাকবি। সক্ষেদে বলেন, ইতিপূর্বেই আট-দশবার আমার গিলোতিন হয়ে গেছে। আর আমার মুণ্ডুপাত কোরো না, ম্যালার্মে! অনাগতকাল যদি এই অযোগ্য কবির মূর্তি তার টেবিলে সাজিয়ে রাখতে চায় তবে তারা যেন একখণ্ড 'লে মিজারেবলস্' কিনে রাখে!

ম্যালার্মে তবু মিনতি করে, ওর মূর্তিগড়ার ঢঙ কিন্তু একেবারে অন্যরকম। আপনাকে

সিটিঙ দিতে হবে না আদৌ। আপনি নিজের মতো লিখে যাবেন, নড়াচড়া করবেন, ও তারই ভিতর আপনার মূর্তি গড়তে পারবে।

—হতে পারে। তার চেয়ে ওর পক্ষে সহজ হবে আমি মারা গেলে মুখের একটা মোমের ছাঁচ তোলা। মোট কথা, আমি যদি আদৌ কোন ভাস্করের যূপকাষ্ঠে মুণ্ডুটা আবার বাড়িয়ে দিতে রাজি হই তবে পরখ করে দেখে নেব সে শূন্য চষক কী কায়দায় টেবিলে নামিয়ে রাখে।

অগুস্ত্ একটা কড়া জবাব দিতে যাচ্ছিল কিন্তু তার পূর্বেই ঘটল একটা ঘটনা। সকলের দৃষ্টিই আকৃষ্ট হল দ্বারের দিকে। একটি অপূর্ব সুন্দরী যুবতী সদ্য উপস্থিত হলেন সান্ধ্য সম্মেলনে।

মহিলার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। কালো ভেলভেটের লো-কাট ব্লাউস, বাহুদুটি নিরাবরণ, গলায় মুক্তার একটি শতনরী, যার দুটো মুক্তো দলছুট হয়ে ওর কানের লতি থেকে ঝুলছে। মেয়েটি ওদের দিকেই অগ্রসর হয়ে আসছে। নিঃসন্দেহে ভিক্তর য়্যুগোর ফ্যান—তাঁকে দেখতে পেয়েছে। য়্যুগো মহিলাটির হস্তগ্রহণমানসে নিজের ডান হাতখানা বাড়িয়ে পর্যন্ত দিয়েছেন। আশ্চর্য। মেয়েটি তা লক্ষ্য করল না। সরাসরি এগিয়ে এল অগুস্তের সামনে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, পারদঁ, আপনিই কি মস্যুয়ে অগুস্ত রেনে রোদ্যাঁ?

অগুস্ত জবাব দিতে পারল না। অপরিচিত মেয়েটির দিক থেকে তার দৃষ্টি সরে গেল মহাকবির দিকে। তাঁর মুখখানা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। হাতটা তিনি গুটিয়ে নিয়েছেন। অগ্নিদৃষ্টি মেলে তিনি তাকিয়ে আছেন অগুস্ত-এর দিকে, যেন এতক্ষণে ঐ তরুণ ভাস্করের প্রকৃত স্বরূপটা তিনি প্রণিধান করতে পেরেছেন। অগুস্ত-এর মনে হল যেন ইন্সপেক্টর জ্যাভার্ত হঠাৎ চিনতে পেরেছে জাঁ ভালজাঁকে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রকাণ্ড হল-কামরার সবকটা গ্যাসের বাতি একসঙ্গে নিবে গেল। শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছাবাণী ধ্বনিত হল অতিথিদের সমবেত কণ্ঠে। রাত বারোটা। দূর বহুদূর থেকে ভেসে এল কিছু পটকার শব্দ, আর গীর্জার ঘণ্টাগুলি সমবেতভাবে দুলতে শুরু করল নববর্ষের আগমনীতে।

অগুস্ত্ অনুভব করল তার দুই স্কন্ধে পেলব স্পর্শ। কে যেন তাকে আলিঙ্গন করে আকর্ষণ করছে। নিচু হতেই ঘ্রাণে লাভ করল অত্যন্ত মহার্ঘ ফরাসী সুগন্ধীর সৌরভ। অগুস্ত্ অপরিচিতার কর্ণমূলে বলতে গেল : শুভ নববর্ষ—কিন্তু বলা হল না। ওর ওষ্ঠ মেয়েটির কর্ণমূল স্পর্শ করা মাত্র ও অনুভব করল সেখানে প্রত্যাশিত কর্ণাভরণটি অনুপস্থিত। নীরন্ধ্র অন্ধকারে চতুর্দিক থেকে শুধুমাত্র চুম্বন-শীৎকার। অগুস্ত্ ভাবতে গেল—মুহূর্তমধ্যে দুলটা কী ভাবে অপহৃত হল ; কিন্তু সে চিন্তার অবকাশটুকুও পেল না—কারণ তার পূর্বেই নিজ ওষ্ঠাধরে লাভ করল একটি কবোষ্ণ স্পর্শ।

ও কী যেন বলতে গেল—বলা হল না—মেয়েটি বন্ধনমুক্ত হতে চাইল। এতক্ষণে বিহ্বলতা থেকে মুক্তি পেয়েছে—ও নিবিড় করে মেয়েটিকে এইবার আলিঙ্গন করে ধরতে গেল, কিন্তু সেটাও হল না। মেয়েটি অস্ফুটে বললে, ছেড়ে দাও। এক্ষণি আলো জ্বলে উঠবে, 'মন-আমি'!

ঠিক কথা। খণ্ডমুহূর্ত পরেই হল-কামরায় আলোর শতনরী খিলখিলিয়ে হেসে উঠবে—ব্যঙ্গ বিদ্রূপে অপ্রস্তুতের একশেষ হবে যারা মুহূর্তের অন্ধ-আনন্দ-শিহরণকে দীর্ঘায়ত করবার মূর্খামি করেছে। প্রতিবর্তী-প্রেরণায় অগুস্ত্ আলিঙ্গন-মুক্ত হয়ে সরে দাঁড়ালো। আর তখনই জ্বলে উঠল হাজার বাতি! অর্কেস্ট্রা প্রস্তুতই ছিল। তৎক্ষণাৎ শুরু হয়ে গেল নববর্ষের আগমনী সঙ্গীত।

হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চোখটা ধাঁধিয়ে গেছিল। একটু সয়ে যেতে অগুস্ত্ তাকিয়ে দেখল চারপাশে। ওর অতি সন্নিকটে কোনও মহিলা নেই। ম্যালার্মে ওর দক্ষিণে, বাঁয়ে অপরিচিত একজন মধ্যবয়সী পুরুষ, ঠিক সামনে—যেখানে ঐ অপরিচিতার থাকার কথা—যদি না সে বিদ্যুল্লতার মতো দ্রুতসঞ্চারিণী হয়, সেখানে বুশো। য়ুগো কর্পূরের মতো উবে গেছেন। আর অনুপস্থিত—গত বৎসরের শেষ মুহূর্তটিতে যে মেয়েটি তাকে শেষ-প্রথম প্রশ্নটি পেশ করেছিল: আপনিই কি মস্যুয়ে অগুস্ত্ রোদ্যাঁ?

বৎসরের প্রথম মুহূর্তটাই এ কী অদ্ভুত ভেল্‌কি নিয়ে এল ওর জীবনে?

ম্যালার্মে বলে, এস, তোমার সঙ্গে গাম্বেতার আলাপ করিয়ে দিই।

অগুস্ত-এর উৎসাহের পুঁজি ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত হয়েছিল, পর পর দুই মহান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়ে—জোলা আর য়্যুগো। তাছাড়া ও-বছরের শেষ যেভাবে এ-বছরের প্রথম মুহূর্তটির সঙ্গে মিলেমিশে একটি রহস্যজাল বিস্তার করল তাতে সে বেশ কিছুটা বিমূঢ় হয়ে গেছে। তবু গাম্বেতা—নব-প্রজাতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ফরাসী দেশের মুকুটহীন রাজা।

গাম্বেতা ওর পরিচয় পেয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দন করলেন। বললেন, আপনার 'জন' আমাকে মুগ্ধ করেছে। কী জানি কেন আমার মনে হয়েছে আপনার 'জন' ফরাসী!

প্রতিবাদ করাটা মূর্খামি জেনেও অগুস্ত্ বললে, সেটা আপনার জাতীয়তাবোধের প্রাবল্যের জন্য। আমার কল্পনায় 'জন' ফরাসী নন, শুধু সেন্টও নন, তিনি মানুষ।

গাম্বেতা হাসলেন। বললেন, আপনার কথা প্রথম শুনেছিলাম 'মনে'-র মুখে। 'মনে' বলেছিল আপনার একটি নগ্নিকা—'ব্যাকান্তি'-র মতো ন্যুড সে জীবনে কখনও দেখেনি—ল্যুভারেও নয়। সেটা দেখাতে পারেন?

অগুস্ত্ স্তম্ভিত। 'মনে' তাকে কিন্তু কোন দিন একথা বলেনি। 'মনে' স্বভাবত স্বল্পভাষী, উচ্ছ্বাস তার জিহ্বায় নয়, তুলির ডগায়—কিন্তু 'ব্যাকান্তি' মূর্তিটা 'মনে'-র এত ভাল লেগেছিল সে-কথা সে ব্যাকান্তির সৃষ্টিকর্তাকে একবারও তো বলেনি। কেন?

—'ব্যাকান্তি' মূর্তিটা কি আপনার স্টুডিওতে আছে?

—আমি দুঃখিত মস্যুয়ে গাম্বেতা, 'ব্যাকান্তি' নেই। একটি দুর্ঘটনায় সেটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। ওটার প্লাস্টার-কাস্ট বানানো হয়নি। সেটা ছিল মাটির।

—আপনার স্টুডিও একদিন দেখতে যাব! ধরুন, আগামী রবিবার সকালে? আপনার সময় হবে?

অগুস্ত্ উচ্ছ্বসিত। স্বয়ং গাম্বেতা তার স্টুডিওতে যেচে আসতে চাইছেন! বলল, আমি নিজেকে সম্মানিত মনে করব, স্যার।

—তাহলে আসুন, আপনাকে প্রুস্ত-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ওঁকে সঙ্গে নিয়েই আমি যাব। জানেন নিশ্চয়, আন্তোনি প্রুস্ত নতুন সরকারের ললিতকলা মন্ত্রী।

আন্তোনি প্রুস্ত দীর্ঘকায়। সুগঠিত সুন্দর পুরুষ। সাজপোশাকের বিষয়ে যত্নবান, গাম্বেতা যেমন সাজপোশাকের বিষয়ে একেবারেই অনবহিত। প্রুস্ত কেতাদুরস্তভাবে অগুস্ত-এর সঙ্গে করমর্দন করলেন। তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে ভাব দেখালেন যেন তিনিই গৌরবান্বিত।

কথা প্রসঙ্গে গাম্বেতা বললেন, মস্যুয়ে রোদ্যাঁ, কিছুদিন ধরেই আমি আর প্রুস্ত আলোচনা করছিলাম ব্যোয়ে দ' অর্সে নতুন যে কলাভবনটি নির্মিত হবে—'ম্যুসে দে আৎর্ঝ দেকরেডিভ' (মিউজিয়াম অব ডেকরেটিভ আর্ট) তার এক জোড়া ব্রঞ্জের প্রবেশ-তোরণ বানানো দরকার। ফ্লোরেন্সে যেমন আছে ঘিবার্টির ব্রোঞ্জ-তোরণ স্বর্গদ্বার, তারই ক্ষুদ্রতর এক সংস্করণ। এ কাজ বুড়োহাবড়ার নয়। তুমি....আই মীন, আপনি এ কাজটা নিতে পারেন?

অগুস্ত রীতিমতো বিহ্বল হয়ে পড়ে। ফ্লোরেন্সের সেই গীর্জাটিকে চোখের সামনে দেখতে পায়। ঘিবার্টি সমস্ত জীবনব্যাপী পরিশ্রমেও সেই বিশাল তোরণটি শেষ করতে পারেননি। পাঁচ-দুকুনে দশটি প্যানেলে ওল্ড-টেস্টামেন্ট বিধৃত। মিকেলাঞ্জেলো সেটি দেখে বলেছিলেন, এই গেট স্বর্গের বাস্তব তোরণ দ্বারে স্থানান্তরিত হবার উপযুক্ত।

—অবশ্য আমাদের তোরণদ্বার কত বড় হবে, কত খরচ হবে এসব প্রুস্ত স্থির করবে। আমার উপর শুধু দুটি দায়িত্ব—ভাস্কর নির্বাচন এবং বিষয়বস্তু।

—বিষয়বস্তুটা কী?

গাম্বেতা হেসে বলেন, সেটা শিল্পী-নির্বাচনের পরের ধাপ নয় কি? আপনি এখনও বলেননি—দায়িত্বটা নিতে প্রস্তুত কি না।

অগুস্ত একটি বাও করে বললে, আপনি আমাকে এতবড় সম্মান দিচ্ছেন--

—আমি নই, ফ্রান্স! থার্ড রিপাবলিক।

—আমি সানন্দে স্বীকৃত।

প্রুস্ত হেসে বলে, দরদাম না জেনেই?

অগুস্তও হেসে বলে, নিশ্চয়ই। এ তো কোন সম্রাটের খেয়াল-খুশীর উচ্ছ্বাস নয়। আমার নিয়োগকর্তা ফ্রান্স। থার্ড রিপাবলিক।

—ব্রাভো। এ জাতীয় প্রত্যুত্তরই প্রত্যাশায় ছিল আমাদের।

—কিন্তু বিষয়বস্তুটার কথা আপনি এখনও বলেননি।

—না, বলিনি। এটা তার অনুকূল পরিবেশও নয়! আগামী রবিবার, আপনার স্টুডিওতে সে কথা হবে। আজকের আলোচনার এখানেই শেষ, মস্যুয়ে রোদ্যাঁ।

—না, শেষ নয়। একটা উপসংহার বাকি আছে—আপনি আমাকে 'তুমিই' বলবেন। মস্যুয়ে রোদ্যাঁ নয়। অগুস্ত।

—তাই হবে, অগুস্ত।

☆ ☆ ☆

পার্টির বাকি পর্যায়টুকু অগুস্ত শার্পেতিয়ের প্রাসাদে ছিল না। ছিল আকাশে। কখনও ফ্লোরেন্স ব্যাপতিস্তির প্রবেশ-তোরণের সমুখে, কখনও বা প্রবেশ-তোরণের ওপারে, অর্থাৎ

দুঃখের সপ্তম স্বর্গে। কত পাত্র শ্যাম্পেন গলাধঃকরণ করেছে, কী কী দুর্লভ খাদ্যের জীবনে প্রথম রসাস্বাদন করেছে কিছুই মনে নেই। এমনকি মনে নেই যখন এক ভদ্রলোক ওকে জনান্তিকে ডেকে বললেন, মস্যুয়ে রোদ্যাঁ, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি আপনার পুত্রের স্কুলের হেডমাস্টার—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনব না কেন? খুব চিনেছি। আপনার মতো শিক্ষক পেয়ে ফ্রান্স ধন্য।

—কিন্তু আপনি আমার কথাটায় কান দেননি। অগুস্ত্ গত বছর ক্লাস প্রমোশন পেল না বলে তাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে দিলেন কেন?

—না, না, ছাড়িয়ে তো দিইনি। প্রমোশন পায়নি সেটা অবিশ্যি আমি জানতুম না। কিন্তু ও তো প্রতিদিন স্কুলে যায়। মাস-মাস স্কুলের মাইনেও দিয়ে যাচ্ছি।

—সে কথাই তো বলছি আমি তখন থেকে। প্রতিদিন স্কুলে যাবার নাম করে সে অন্য কোথাও যায়। স্কুলের মাইনে সে অন্যভাবে খরচ করে—

অগুস্ত্ জড়িয়ে ধরে বক্তাকে। জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, তা হতেই পারে না মস্যুয়ে হেডমাস্টার। আপনাকে পেয়ে ফ্রান্স ধন্য! এমন সোনামণি হেডমাস্টারকে ছেড়ে পেতি অগুস্ত কোন চুলোয় যাবে বলুন? আমি নিত্যি ত্রিশ দিন দেখি সে বইখাতা বগলে আপনার ইস্কুলে যায়। ...আপনি ফ্রান্সের গৌরব।....বয়স থাকলে আম্মো সে শুয়োরের বাচ্চার সঙ্গে নিত্যি ত্রিশ দিন ইস্কুল যেতুম। আপনি সোনামণি হেড়ু।...লক্ষ্মীমণি হেড়ু।

বৃদ্ধের গণ্ডে চুম্বন করে অগুস্ত্।

হেডমাস্টার মশাই মদ্যপের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে পালাবার পথ খুঁজতে থাকেন।

☆ ☆ ☆

সতেরই জুলাই ১৮৮০। ললিতকলা বিভাগের আন্ডার-সেক্রেটারী মস্যুয়ে তার্কুয়ে অগুস্তকে সরকারীভাবে জানালেন, প্রবেশ-তোরণের প্ল্যানটি মন্ত্রিপরিষদ অনুমোদন করেছেন। গায়েতো এবং প্রুস্ত-এর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর অগুস্ত্ তোরণের খশড়াটি প্রস্তুত করেছে। ঘিবার্টি নির্মাণ করেছিলেন : স্বর্গদ্বার, অগুস্ত্ বানাবে : 'নরকের দ্বার'।

প্রথমে শুনেই সকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। সেটাই স্বাভাবিক। ললিতকলার প্রবেশদ্বারে 'নরক'। এ কেমন কথা? অগুস্ত্ বলেছিল, এটাই বাস্তব সত্য। স্বর্গ আছে কল্পনায়। নরক চোখের সামনে। থার্ড রিপাবলিক যদি মরুভূমির উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে বলতে চায়—ফ্রান্সে অনাহার নেই, অত্যাচার নেই, মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার অবকাশ নেই, তাহলে সে আলাদা কথা। না হলে, নরকের দৃশ্যটি জনগণের চোখের সামনে মেলে ধরতে হবে—যেমন ভাবে মেলে ধরেছিলেন মিকেলাঞ্জেলো, সিস্তিন চ্যাপেলে, শেষবিচার দৃশ্যে।

—আপনি কি মিকেলাঞ্জেলোকে অনুসরণ করতে চান?

—না! দান্তের 'ডিভাইনা কমেডিয়া'-য় বর্ণিত নরক, যার প্রতিচ্ছবি দেখেছি জোলায়, বদলেয়ারে, ম্যালার্মের কাব্যে! আজকের ফ্রান্সে!

স্থির হল তিন বছরে এই তোরণটি শেষ করবে অগুস্ত্। পারিশ্রমিক ষাট হাজার ফ্রাঁ। সরকার এজন্য ওকে একটি পৃথক স্টুডিও ভাড়া করে দিলেন ব্ু দ ল' য়ুনিভার্সাইৎ-এ। অগুস্ত্ কিছু আগাম টাকা পেল মালপত্র কিনতে। ঐ সঙ্গে ভাড়া করল দ্বিতীয় একটি স্টুডিও, বুলেভাদ দে ওয়া গিরাদ-এ। সেখানে সে অন্যান্য কাজ করে। সরকারী স্টুডিওতে শুধু মাত্র 'নরকের দ্বার'।

কয়েক মাসের মধ্যেই সরকারী স্টুডিওটা হয়ে গেল শিল্পতীর্থ। নানান ছাত্রদল আসে, লক্ষ্য করে ওর কর্মপদ্ধতি। স্কেচ করতে থাকে। প্রতি শনিবার বিকালে দল বেঁধে আসে প্যারীর সাধারণ মানুষ। অগুস্ত্ কিছু সহকারীও নিয়েছে।

একদিন লেকক্ স্বয়ং এসে দেখে গেলেন। অগুস্ত্ জানতে চাইল তাঁর সাজেশন। লেকক্ সব কিছু খুঁটিয়ে দেখলেন—অসমাপ্ত স্কেচ, ডিজাইন। বললেন, তোর স্বকীয় চিন্তায় আমি কোনও বাধা-নিষেধ আরোপ করব না। তুই যেভাবে চিন্তা করছিস সে ভাবেই এগিয়ে যা ; কিন্তু আমার তিনটে সাজেশ্শান আছে ; সেগুলিকে আমার 'আদেশ' বলে মনে করবি না।

অগুস্ত্ হেসে বলে, মেৎর, আপনার পরামর্শে জন-এর নগ্নতাকে আমি আচ্ছাদিত করেছিলাম। আপনার 'আদেশ' হিসাবে ? নাকি সেটা 'শুভবুদ্ধি'র নির্দেশ বলে ?

—জানি না। আমি আজও তা ভেবে পাইনি। কোন্‌টা সত্য ?

—দুটোই। আপনার 'আদেশ' এবং আমার 'শুভবুদ্ধি' একাত্ম হয়ে গিয়েছিল বলে। এখন বলুন, আপনি কী কী পরামর্শ দিতে চান ? কথা দিচ্ছি, সেগুলি আমি 'আদেশ' বলে ধরে নেব না। ছাত্রের প্রতি গুরুর পরামর্শ বলেই গ্রহণ করব।

—প্রথম কথা : তুই ঘিবার্টির অনুকরণে গেটটাকে দশটা প্যানেলে ভাগ করেছিস। মিকেলাঞ্জেলো সিস্‌তিন চ্যাপেলেও ঐ ভাবে ভাগ করেছেন। কিন্তু ওঁরা দুজনেই ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে কতকগুলি খণ্ড-খণ্ড কাহিনী উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। তোর পরিকল্পনা তা নয়। তুই অখণ্ড নরক ফুটিয়ে তুলতে চাস্। তাই আমার প্রথম সাজেশ্শান, প্যানেল-পরিকল্পনা তুই বাদ দে।

অগুস্ত্ লাফিয়ে ওঠে। বলে, মেৎর ! ঠিক ঐ কথাই ভাবছিলাম আমি কদিন ধরে। আজ আপনাকে ঐ প্রশ্নটা করব ভেবে রেখেছিলাম ; অথচ আপনি নিজে থেকেই—

—দ্বিতীয় কথা : দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'-র বহু সচিত্র সংস্করণ আছে। আমার ইচ্ছে নয় তুই দান্তেকে আক্ষরিক ভাবে অনুসরণ করে চলিস্। দান্তে মহান কবি—কিন্তু তাঁর চোখ দিয়ে তুই নরক দেখবি কেন ? দান্তের হাত ধরে নরকের দ্বারপথে পৌঁছে নিজের চোখ দিয়ে যদি—

অগুস্ত্ উচ্ছ্বসিত হয়ে বাধা দেয়। বলে, মনে আছে মেৎর ! আপনি ক্লাসে বারে বারে বলতেন 'ওল্ড-মাস্টার্সরা হচ্ছেন সিঁড়ির ধাপ। থাপন জুড়ে সেখানে বসে পড়ার জন্য নয়। উত্তরণের জন্যই সোপানের প্রয়োজন।' দান্তেও তেমনই একজন নরকের সিঁড়ি ! এ-কথাই তো বল্‌তে চান ?

—ঠিক তাই !

—আর শেষ সাজেস্শান ?

—আমি খুব খুশি হব যদি তুই 'স্বর্গীয় নরকের দ্বার' গড়ে তুলিস্ !

—'স্বর্গীয় নরকের দ্বার' ! তার মানে ?

—দ্যাখ্ অগুস্ত্ ! আমি দান্তের ঐ পংক্তিটা বিশ্বাস করি না : 'Abandon all Hopes, Ye who enter here! আমার একান্ত কামনা : তোর নরকে'র দ্বারে যেন 'প্রমিথিউস'-এর আভাস পাই, 'ফাউস্ট'-এর ইঙ্গিত পাই। সিস্তিন চ্যাপেলে 'শেষ বিচার' দৃশ্যের কেন্দ্রবিন্দু যেমন যীসাস্-এর উৎক্ষিপ্ত দক্ষিণহস্তের দাক্ষিণ্য, তেমনি একটা-কিছু 'রিলিফ' তুই দিতে ভুলিস্ না অগুস্ত্। দান্তের বর্ণনায় নরকে নীরন্ধ্র অমারাত্রি ; কিন্তু শিল্পী হিসাবে বিশ্বাস রাখিস্ অগুস্ত্, নীরন্ধ্রতম রাত্রিও নিষ্প্রভাত হতে পারে না।

অগুস্ত্ লেকক্-এর সামনে নতজানু হয়ে বলে, আমেন। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন মেৎর।

লেকক্ ওর শিরশ্চুম্বন করে বললেন, ওরা বলেছে তিন বছর, —আমি জানি বিশ বছরেও এ-কাজ শেষ হবার নয়। তবু তুই এটা একদিন শেষ করে যাবি। আমি হয়তো সেদিন থাকব না—কিন্তু মনে রাখিস্, অমর্ত্যলোক থেকে আমি লক্ষ্য রাখব ; দেখব—তোর নরকের দ্বারে প্যান্ডোরার মুখ-বন্ধ মণি-মঞ্জুষাটি আছে কি না।

☆ ☆ ☆

অগুস্ত্ একদিন গেল 'মনে'-র সঙ্গে দেখা করতে। ভেথিয়ুল গাঁয়ে। পারী থেকে বেশ কয়েক মাইল উত্তর-পশ্চিমে। সে'ন-এর ধারে। না গেলেই ভাল হত। 'মনে' একেবারে ভেঙে পড়েছে। কামীলের মৃত্যুতে। বললে, তুই এসেছিস ভাল লাগছে। সবচেয়ে মজা কী জানিস্ ? কামীলের অসুখের সময় আমি ঘটি-বাটি বাঁধা দিয়েছি ; তার সৎকারের সময় ভিক্ষা করতে হয়েছে আমাকে—

—আমি দুঃখিত মনে। আমাদের কেন জানাসনি ?

—আমি যে আমার ক্রুশ নিজেই বইব ভেবেছিলাম। বয়েছিও। কথা তা নয়, কথা হচ্ছে—কামীল মারা যাবার পর থেকেই একের পর একটা ছবি বিক্রি হতে শুরু হয়েছে। পারী থেকে আমার এজেন্ট টাকা পাঠাতে শুরু করেছে। শালা যেন রসিকতা করছে ! প্রতি সপ্তাহেই মনি-অর্ডার আসছে, আর আমি রিফিউজ্ করছি।

—রিফিউজ্ করছিস। টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছিস্ ?

—দেব না ? কী হবে এখন টাকায় ? ওকে কি এখন মুরগীর সুরুয়া রেঁধে খাওয়াতে পারব ? ভাল ডাক্তার দিয়ে কি ওকে.....আর ঈশ্বরের কী স্থূল রসিকতা দেখ্—আমার সেই এজেন্ট জানতে চেয়েছে বড় কোনও কমিশন নিতে আমি রাজি আছি কিনা। শালাহ্।

—কী জবাব দিয়েছিস্ তুই ?

—কী আবার জবাব দেব ? কোনও জবাবই দিইনি। ছবি আঁকা যে জন্মের মতো ছেড়ে দিয়েছি তা ওকে জানাতে যাব কেন ?

—জন্মের মতো ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছিস্ ?

—আলবাৎ ! ঈশ্বর-নামের ঐ লোকটার স্থূল রসিকতার ঐটাই উপযুক্ত স্থূল জবাব !

কী প্রচণ্ড অভিমানে একথা বলছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ছবি ছিল ওর প্রাণ।

ওদের দুজনের। আহার-নিদ্রা বাদ দিয়ে কত দিবস-রজনী যাপন করেছে ওরা স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু রঙ-তুলি ক্যানভাসহীন দিন আসেনি ওদের দাম্পত্য জীবনে। 'মনে' আঁকে ক্যানভাসে, কামীল আঁকে মনে মনে, সিটিং দেবার সময়।

অগুস্ত্ বলে, তবে তো বিপদে ফেল্‌লি ভাই। আমি তো জানি না তুই ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছিস্। আমি তাই রঙ তুলি ক্যানভাস সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম, তোর বাগানে বসে দুজনে ছবি আঁকব বলে।

মনে চুপ করে কী ভাবল। তারপর বলে, তা তুই আঁকতে চাস্, আঁক না।

দুজনে গিয়ে বসে ওদের বাগানে। অগুস্ত্ স্ট্যান্ড-ঈজেল সাজিয়ে বসে। ক্যানভাস সে নিয়েই এসেছিল মনেকে দেবে বলে। টুলে বসে আপন মনে বলতে থাকে, তুই কী সৌভাগ্যবান! দুনিয়ায় এমন একজনকে পেয়েছিলি যার প্রতি ভালোবাসায় ছবি আঁকা পর্যন্ত ছেড়ে দিলি!

মনে ওর শূন্যপট ক্যানভাসটাকে দেখছিল পাশের একটা ইজিচেয়ারে অর্ধশয়ান হয়ে। বললে, একে তুই আমার সৌভাগ্য বলিস্?

—বল্‌ব না? আমার দিকে তাকিয়ে দেখ্; দুনিয়ায় আমার কি কেউ আছে যে মরে গেলে আমি মূর্তি গড়ার কাজ ছেড়ে দিতে পারব?

মনে ধমক দেয়, ও কী করছিস্? অত লিনসীড-অয়েল মেশাচ্ছিস্ কেন?

অগুস্ত্ হেসে বলে, বহুদিন তেল-রঙে কাজ করি না তো, ভুলে গেছি—

—দে, প্যালেটটা আমাকে দে।

রঙ আর প্যালেটটা মনের দিকে এগিয়ে দিয়ে অগুস্ত্ আপন মনে বল্‌তে থাকে, কামীল তো আমার বন্ধুপত্নী, কতটুকুই বা চিনতুম ওকে, বল? অথচ আজ এই বাগানে বসে আমার মনে হচ্ছে সমস্ত প্রকৃতিটাই বুঝি কামীলময়। ঐ উইলো গাছের পাতাগুলো যেন তার চুল—ঐ আকাশের নীলটা যেন তার চোখের তারা।....সূর্যের আলো পড়ে সীডার আর এল্‌ম্‌গুলোর পাতা কী অদ্ভুত চিক্‌চিক্ করছে দেখেছিস? কামীল ঐ রকম করে হাসত না?

'মনে'-র চোখে একটা স্বপ্নালু ছায়া নেমে এসেছে। অস্ফুটে, যেন আপনমনে বলে, সমস্ত প্রকৃতিটাই আজ কামীলময়! দারুণ বলেছিস্ কিন্তু!

অগুস্ত্ বন্ধুর হাত দুটি ধরে ধীরে তাকে বসিয়ে দিল নিজের ওয়ার্ক টুলে। ডান হাতে ধরিয়ে দিল মোটা তুলিটা। এগিয়ে দিল রঙের ঈজেল। কানে কানে বললে, আকাশ-প্রান্তর-বনানী যাই আঁকিস্ না কেন সে তো শুধু কামীল-এরই পোর্ট্রেট! সব কিছুতেই তো সে মিশে আছে! তাই নয়?

'মনে' জবাব দিল না। উন্মাদের মতো ক্যানভাসের উপর টানতে থাকে রঙে-ভেজা তুলির আঁচড়। আপন মনে বিড়বিড় করতে থাকে: কামীল কি আমাকে ছেড়ে যেতে পারে?—সে মিশে আছে আকাশের নীলে, বনের সবুজাভায়, ওয়াটার-লিলির হাসিতে।

পারী ফেরার পথে অগুস্ত্ মনে মনে বলেছিল, সুযোগ পেলে তোর একটা মূর্তি গড়ব, মনে: অরফিউস্।

☆ ☆ ☆

পেতি-অগুস্ত্ এখন ওর সহকারী। স্টুডিওর দেখ্ভাল করে, মালের হিসাব রাখে, মূর্তিগুলোর ঝাড়পোঁছ করে, কাদার তাল বানায়। কে বলেছে মনে নেই, অগুস্ত্ টের পেয়েছিল, আজ বছরখানেক ধরে পেতি অগুস্ত্ স্কুলে যাবার নাম করে আড্ডা মেরে বেড়ায়। তাই এই শাস্তি।

একদিন পেতি-অগুস্ত্ এসে বলল, মেৎর, এক ভদ্রমহিলা আপনার খোঁজ করছেন। ডেকে নিয়ে আসব ?

—না তো কি আমি স্টুডিও ছেড়ে যাব মাঝ-সড়কে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে ?

পেতি-অগুস্ত্ বিড়বিড় করতে করতে বেরিয়ে গেল। একটু পরে এলেন একজন ঘরানা ঘরের মহিলা। তাঁকে দেখেই চমকে ওঠে অগুস্ত্। একেই সে দেখেছিল শার্পেতিয়ের পার্টিতে। বলল, আপনাকেই কি বছরের প্রথম দিন মস্যুয়ে শার্পেতিয়ের পার্টিতে—

কথাটা শেষ হল না। মেয়েটি বলল, না। আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল—মস্যুয়ে শার্পেতিয়ের পার্টিতেই—কিন্তু গত বছর—

—গত বছর ? ও, হ্যাঁ ! ও বছরের শেষ সম্ভাষণটা ছিল আপনার। কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেছিলেন আপনি ?

—সে অনেক কথা। সুযোগ মতো বলব। আপাতত আমার পরিচয়টা দিই। আমার নাম মাদ্‌মোয়াজেল মাদেলিন ব্যুফে। আপনার কাছে এসেছি একটি প্রস্তাব নিয়ে। আপনি কি আমার একটা হেড্‌স্টাডি করতে রাজি আছেন ? মার্বেলে ? রাজি থাকলে কতদিন লাগবে এবং আমাকে কী দিতে হবে ?

অগুস্ত্ জবাবে বললে, আপনার মুক্তোর দুল-জোড়া খুঁজে পেয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত ?

—দুল-জোড়া ? হারিয়েছিল কে বললে ?

—আমি নিজে। মধ্যরাত্রে যখন বাতি নিবে যায় ঠিক সেই মুহূর্তে অন্তত আপনার বাঁ-কানে দুল তো ছিল না।

খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে মাদেলিন। বলে, তার অনুসিদ্ধান্ত : আপনি অন্ধকারে যে মেয়েটিকে চুমু খেয়েছিলেন তার কানে দুল ছিল না। কিন্তু আমি সেই সৌভাগ্যবতী নই ! কারণ আমি সেই মুহূর্তে যে 'স্যাটীর'-এর বাহুবন্ধনে পিষ্ট হচ্ছিলাম তিনি এক 'ল্যা মিজারেবল।'

—সত্যি বলছেন ?

—মা মেরীর দিব্যি !

—আপনিই তাহলে সেই সৌভাগ্যবতী যিনি সেই খণ্ডমুহূর্তে ডেমি-গড-এর চুম্বনধন্যা ?

—না। বুড়োভাম চেষ্টার ত্রুটি করেনি, কিন্তু পারেনি। আমার কানে কানে বলেছিল, 'ওগো সুন্দরি !' আমি ওর কানে কানে বলেছিলাম : কী গো কোয়াসিমোদো ? তারপরেই একটি বিশ্রি হুটোপুটি। টানা-হেঁচড়ায় আমার ব্লাউসটা যায় ছিঁড়ে আর বুড়োর কোটের দু-তিনটে বোতাম নিশ্চিহ্ন। ফলে দুজনেই অন্ধকারে কক্ষ ত্যাগ করি এবং গোপনে পার্টি ত্যাগ করে পালাই।

—একত্রে ?

—না মশাই ! পৃথক পৃথক ! কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাবটা মুলতুবি আছে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি হেডস্টাডি করতে রাজি আছি। মার্বেলেই। কতদিন লাগবে বলা শক্ত। আপনাকে খুশি করতে মাসখানেক, আর আমাকে খুশি করতে মাসছয়েক। আর দামটা ? মার্বেলের দাম বাদে মজুরীটা নির্ভর করবে অনেক কিছুর উপর।

—যথা ?

—যথা, খদ্দের কতটা খুশি হল মূর্তিটাকে পেয়ে, এবং.....

—এবং ?

—এবং ভাস্কর কতটা খুসি হল মডেলটাকে পেয়ে।

খিলখিল করে হেসে উঠল আবার। বলল, কবে থেকে কাজ শুরু হবে ?

—কাল থেকেই। সকাল দশটায়। দৈনিক দু ঘণ্টা করে।

মাদমোয়াজেল মাদেলিন-এর বাস্ট-এর সঙ্গে ও তৈরী করেছিল আন্তোনি প্রুস্ত্ আর কারিয়া বল্যুজ-এর দুটি হেডস্টাডি। মাদেলিনের মূর্তি শেষ হয়নি, অসমাপ্ত অবস্থায় সেটি সে উঠিয়ে নিয়ে যায়। অপর দুটি সে নামমাত্র মূল্যে—বস্তুত ব্রোঞ্জের দামে বিক্রয় করে, প্রতিটি পাঁচশ ফ্রাঁতে। দুজনের কাছেই সে উপকৃত। ঐ সময়ে শিল্পী দালুর একটি হেডস্টাডিও করে। সেটি বিক্রয় করে না। এক্সচেঞ্জ করে—কারণ দালুও ওর একটি হেডস্টাডি তৈরী করে ওকে উপহার দিয়েছিলেন।

একদিন কবি ম্যালার্মে এসে হাজির। অগুস্ত্ হাসতে হাসতে বলে, নরক-দর্শনার্থীর সংখ্যা যদি এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে স্বর্গে যে টুরিস্ট সিজিনে মন্দা পড়ে যাবে।

—আমি তোমার নরকের দ্বার দেখতে এসেছি থোড়াই। তোমার সঙ্গে গোপন কথা আছে।

আড়ালে এসে ম্যালার্মে বলে, একটা কথা বলতো রোদ্যাঁ, শার্পেতিয়ের পার্টিতে তুমি কি ব্যুশেকে বলেছিলে—য়্যুগোর মাথাটা আমার চাই ?

অগুস্ত্ স্তম্ভিত। বলে, কোন অর্বাচীন বুঝি তাই শুনে রটিয়েছে আমি য়ুগোকে খুন করতে চাই ? কে সে ? বুশ্যে এমন কথা বলবে না। সে জানে, আমি কী 'মীন' করেছিলাম।

—কী, কী 'মীন' করেছিলে তুমি ?

—কোন ভাস্করের পক্ষে যে কথা 'মীন' করা স্বাভাবিক। য়্যুগোর হেডস্টাডি।

—সেটাই তোমার মুখ থেকে শুনতে চাইছিলাম আমি। সে বাসনা কি তোমার আজও আছে ? য়্যুগো সম্বন্ধে ইতিমধ্যে যা জেনেছ তারপরেও ?

—য়্যুগো দেবতাও নয়, দানবও নয়। সে—সে। তার মুখে ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। যেকোন ভাস্কর তার মূর্তি বানানোর সুযোগ পেলে ধন্য হবে, তার জীবনদর্শন মানুক আর না মানুক।

—একজন য়্যুগোর একটি হেডস্টাডি বানাতে চায় তোমাকে দিয়ে। ব্যুশে-র কাছ থেকে শুনেছে, তুমি ইন্টারেস্টেড।

—কে সে ? য়্যুগো নিজে নয় ?

—না ; জুলিয়েৎ ড্রোলে নামটা শুনেছ কখনও ?

—না শোনার কারণ নেই। সবাই জানে, বুড়ি ড্রোলে এককালে য়্যুগোর রক্ষিতা ছিল—এখন আখের ছিবড়ে ! কেন ?

ম্যালার্মে একটু চুপ করে থেকে বলে, একটা কথা বলি রোদাঁ, কিছু মনে কর না। এখানেই ভাস্করের সঙ্গে কবির পার্থক্য। তুমি যা বলেছ, তা সত্য—মার্বেলের মত নিরেট সত্য, ব্রোঞ্জের মত কঠোর সত্য। কিন্তু মাদমোয়াজেল ড্রোলেকে দেখে ঐ কথাকটা কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারতাম না আমি।

—কেন?

—মাদমোয়াজে ড্রোলে এক অসামান্যা মহিলা! পঞ্চাশ বছর আগে তাঁর মতো সুন্দরী পারীতে দুটি ছিল না। থাকলেও তারা তাঁর মতো বিদুষী ছিল না, কবি ছিল না। রূপ ও আভিজাত্য—শিল্প ও সংস্কৃতি কোনদিকেই তাঁর কোন খামতি ছিল না। য়ুরোপের একাধিক ধনী ঘরের যুবরাজ—আর্ল, ডিউক এবং হ্যাঁ, একজন 'কিং' পর্যন্ত তাঁর পাণিপ্রার্থী হয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, তা জানো? মেয়েটি তার সমস্ত জীবন ও যৌবন বিলিয়ে দিল ফ্রান্সের এক বিশ্রুতকীর্তি প্রতিভার পায়ে। সংসার পেল না, সন্তান পেল না, 'মাদাম য়্যুগো' খেতাবটা পর্যন্ত পেল না। আজ তিনি সত্তর বছরের বৃদ্ধা! সেই মহান মহিলার উপমা, 'আখের ছিবড়ে'?

অগুস্ত্ ওর হাত দুটি টেনে নিয়ে বলে, আমার অন্যায় হয়েছে, মাপ কর কবি!

ম্যালার্মের কানে সে কথা যায় না। একইভাবে বলতে থাকে, সত্তর বছরের বৃদ্ধার একমাত্র দুঃখ—শয্যালীনার চোখের সামনে য়্যুগো সবসময় থাকতে পারে না। য়্যুগো এখনও নিত্য নতুন অভিসারে মাতে—সারাজীবনই সেভাবে কেটেছে তার। ড্রোলে জানে, আপত্তি করেনি কখনও, বলে—'এটাতো স্বাভাবিক! তার 'ভিরিলিটি' অমলিন! সে কবি!' তবু দিনান্তে একবার য়্যুগো তার জীবনসঙ্গিনীর কাছে আজও আসে। শয্যাপার্শ্বে বসে। নিজের লেখা প্রেমের কবিতা পড়ে শোনায়। বুড়ি চায়, তুমি তার একটা মূর্তি গড়ে দাও গোপনে—

—গোপনে?

—হ্যাঁ। বুড়ির পালঙ্কটা যেখানে পাতা আছে তার পিছনেই আছে একটা জানলা। ভেনিশিয়ান লুভার—খড়খড়ি পাল্লা। তুমি ও-দিক থেকে বুড়ো-বুড়িকে দেখতে পাবে। য়্যুগো তোমাকে দেখতে পাবে না; বুড়ির গভর্নেস সব ব্যবস্থা করে দেবে! তুমি ঢুকবে পেছনের দ্বার দিয়ে, বেরিয়েও যাবে সেদিক দিয়ে। কাক-পক্ষীতে টের পাবে না। রাজী?

অগুস্ত্ দীর্ঘ সময় জবাব দিল না। এই অদ্ভুত চ্যালেঞ্জ সে গ্রহণ করবে কি করবে না। য়্যুগো চায় না কেউ তার মূর্তি গড়ুক—বিশেষ সেই ছোকরা যে, ওঁর বিরাগভাজন হয়েছিল শাপেতিয়ের পার্টিতে। অথচ বুড়ি চায়—

—কী স্থির করলে?

—মাদমোয়াজেল ড্রোলের সঙ্গে কথা না বলে কিছু বলতে পারব না।

—বেশ, কাল সকালে এসে আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

পরদিন ম্যালার্মে ওকে নিয়ে গেল নিজের বুহামে। এ্যাভিন্যু দ' এ্যাইলতে একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকা—'য়্যুগো নিবাস'; না ভুল হল। সড়কটার নাম প্যারী মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সম্প্রতি পরিবর্তন করেছেন, য়্যুগোর অশীতিতম জন্মদিনে। রাস্তাটার নাম: ভিক্টর য়্যুগো এভিন্যু। দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষায় ছিলেন একটি বর্ষীয়সী মহিলা, ড্রোলের গভর্নেস। তাঁর সঙ্গে অগুস্ত্-এর পরিচয় করিয়ে দিয়ে ম্যালার্মে বিদায় চাইলেন। বললেন, মহিলা হয়তো

শিল্পীকে কিছু মরমী কথা বলতে চাইবেন, তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি শুধু বাধা।

ঘুরপথে অগুস্তকে নিয়ে গভর্নেস উপস্থিত হল একটি প্রশস্ত কক্ষে। প্রকাণ্ড পালঙ্কে বৃদ্ধা অর্ধশয়ান। অগুস্ত নত হয়ে 'বঁজু' বলার সঙ্গে সঙ্গে পথপ্রদর্শিকা নিষ্ক্রান্ত হল। অগুস্ত-এর নজর গেল ম্যান্টেলপীস-এর উপর একটি ছবির দিকে। ও চোখ ফেরাতে পারল না। বৃদ্ধা বললেন, তখন আমার বয়স ছাব্বিশ। য়্যুগোর সঙ্গে প্রথম আলাপের পর য়্যুগোই ছবিটা আঁকায়। অরিজিনাল আঙরে।

অগুস্ত অনেকক্ষণ ছবিটা একদৃষ্টে দেখল। তারপর বললে, আমার ধারণা ছিল আঙরের 'লা সুর্স'-এর মডেলই সবচেয়ে সুন্দরী। ধারণাটা ভুল।

বৃদ্ধা হাসলেন। বললেন, ম্যালার্মে আমার মনোগত বাসনার কথা নিশ্চয়ই তোমাকে বলেছে ? তুমি বলেছিলে, আমার সঙ্গে কথা বলে সম্মতি জানাবে। বল, কী তোমার প্রশ্ন ?

অগুস্ত কুণ্ঠভাবে বললে, মাদাম—

—মাদামোয়াজেল। বল ?

—আমি য়্যুগোর মূর্তি যদি গড়ে দিই তা তো যৌবনের ভিক্তর য়্যুগো হবে না।

—জানি ! কিন্তু আমার চোখে তো য়্যুগো বৃদ্ধ হয়নি। সে চিরতরুণ।

—কিন্তু আমার চোখে তো তিনি তা নন মাদাম।

এবার আর ওকে সংশোধন করলেন না বৃদ্ধা। বললেন, তা হোক। তুমি ওকে যে চোখে দেখেছ সে চোখে তো মূর্তি গড়ার সময় মডেলকে দেখবে না।

—ঠিক বুঝলাম না। কী বলতে চাইছেন ?

—শুনেছি তুমি তাকে একবারমাত্র দেখেছ ; পার্টিতে। তোমাদের প্রথম সাক্ষাৎকার সুখের হয়নি, এইটুকু জেনেছি। কিন্তু মূর্তি গড়বার সময় তো তুমি অন্য য়্যুগোকে দেখবে। তার প্রেমিকার রোগশয্যার পাশে। প্রতিদিন সে আমার জন্য নিয়ে আসে টাটকা গোলাপ ; প্রতিদিন সে পড়ে শোনায় পঞ্চাশ বছর আগেকার লেখা প্রেমের কবিতা। সে পরিবেশে য়্যুগোকে তো তুমি আগে দেখনি মস্যুয়ে রোদ্যাঁ। আমি পারী শিল্পের ভিতর দিয়েই জীবন কাটিয়েছি। জাকুই দাভিদ দিয়ে যার শুরু ! আমি বাজি রাখতে রাজি—সেই অশীতিপর তরুণ প্রেমিককে দেখে তুমি চেষ্টা করেও একটা বুড়ো-হাবড়া বানাতে পারবে না।

অগুস্ত অবাক হয়ে গেল মহিলার কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায়। বললে, আমি স্বীকৃত।

—দুটি কথা বলার আছে। প্রথম কথা, তুমি জান কিনা জানিনা, যে রোগে আমি ভুগছি তার নাম ক্যান্সার। আমার মেয়াদ বড় জোর একবছর। একটু তাড়াহুড়ো করতে হবে। দ্বিতীয় কথা, য়্যুগো যেন কোনদিন না জানতে পারে।

—কোনদিন না ?

—না। তারও বয়স আশী। বেশিদিন তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে না। আমার উইলে ওটার উল্লেখ থাকবে না—তাহলে য়্যুগো জানতে পারবে। কিন্তু আমার অ্যাটর্নিকে নির্দেশ দেওয়া থাকবে—আমরা দুজনেই বিদায় হলে ওটা হবে ফ্রান্সের সম্পত্তি ! তখন ওটাকে স্থাপন করা হবে পারীর কোন চৌমাথার মোড়ে।

এরপর অগুস্তের পরিচিত দুনিয়ার নেমে এল একঝাঁক মৃত্যু। 1882 সালের শেষদিনে একটি দুর্ঘটনার মারা গেলেন গাম্বেতা। বয়সে তিনি ছিলেন অগুস্তের চেয়ে মাত্র দু বছরের বড়। রাজকীয় মর্যাদায় সমাধিস্থ করা হল গাম্বেতাকে। কিছুদিন পরেই প্রয়াত হলেন ইম্প্রেশানিস্ট্ শৈলীর আদিগুরু মানে। মাত্র একান্ন বছর বয়সে। তাঁকে সবে সরকারী স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল—লীজন অব অনার। ভোগে এল না। মানের শোকযাত্রায় লোক হয়েছিল অল্প—তাঁর খ্যাতি মরণোত্তর কালে। তবু যাঁরা শোকযাত্রায় সামিল হয়েছিলেন তাঁরা আমাদের অচেনা নন : দেগা, ফাঁতি, মনে, পিসেরো, ম্যালার্মে, বুশ্যো, জোলা, সেজান এবং ললিতকলা মন্ত্রী প্রুস্ত।

অগুস্ত-এর সঙ্গে মানের খুব কিছু ঘনিষ্ঠতা ছিল না, যেমন ছিল মনে, ফাঁতি, ম্যালার্মে বা ব্যুশ্যোর সঙ্গে। তবু শিল্পী হিসাবে মানেকে সে শ্রদ্ধা করত। যোগ দিল শোকযাত্রায়।

ভিক্টর য়্যুগো (1910)

এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রয়াত হলেন জুলিয়েৎ ড্রোলে। সংবাদপত্রের এক কোণে ঠাঁই পেয়েছে খবরটা। সবাই আন্দাজ করল কী দারুণ আঘাত পেয়েছেন য়্যুগো ; কিন্তু কেউ জানল না, কী প্রচণ্ড আঘাত পেল অগুস্ত্। শুধু আর্থিক ক্ষতির জন্য নয়। মূর্তিটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। দিনের পর দিন অগুস্ত্ গোপনে তৈরী করেছে য়্যুগোর মূর্তি। জানলার ফাঁক দিয়ে

দেখে দেখে। মডেলের মুখে দুহাতের দশটা আঙুল না বোলালে ওর আবেগ আসে না—এক্ষেত্রে সেটা সম্ভবপর নয়। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর য়্যুগো যখন ফিরে যেতেন তখন অগুস্তকে এঘরে আসতে হত। ধরাধরি করে অগুস্তের মূর্তিটাকেও নিয়ে আসা হত শয্যালীন বৃদ্ধার দৃষ্টি সম্মুখে। এক-মাথা শুপোগলানো চুল, কোটরগত মরকত মণির মত চোখের মণি, বলিরেখাঙ্কিত সর্বাবয়ব, তবু ঐ মৃত্যুলীন বৃদ্ধার মুখে ফুটে উঠত অদ্ভুত একটা হাসি—কিছুটা তৃপ্তির, কিছুটা প্রেমের, কিছুটা আবেগের, আর অনেকখানিই কুলের-আচার-চুরি করা কিশোরীর দুষ্টুমির। অগুস্ত-এর সঙ্গে এতদিনে যেন একটা নাতি-দিদিমা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে বলতেন, ও বেচারি স্বপ্নেও ভাবতে পারছে না এ বয়সেও আমি লুকিয়ে আর কারও সঙ্গে প্রেম করছি!

—প্রেম করছেন, মাদাম?

—করছি না? তোমার এই অসমাপ্ত তরুণ য়্যুগোর মূর্তিটার সঙ্গে? এই বুড়ি বয়সে!

অসমবয়সের দুই নাতি-দিদিমা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতেন, মেৎর! আর কতদিন লাগবে?

—এই হয়ে এল। আর একটা মাস।

সেই সমাপ্তিটা আসার আগেই সমাপ্তি এল জুলিয়েতের জীবনে।

খদ্দের চলে গেছেন, তবু শেষ করল মূর্তিটা! শুধু তাই নয়, য়্যুগোর আরও দু-দশটা মূর্তি ও গড়ল একান্তে। ওর মনে হল ভিক্তর য়্যুগোর স্বরূপটা তখনই বিকশিত হবে যখন য়্যুগোকে রূপায়িত করা যাবে ন্যুডে! তৃতীয় একটা স্টুডিও ভাড়া করেছিল ইতিমধ্যে, সেন্ট লুইয়ে—সম্পূর্ণ গোপনে। কেউ তার সন্ধান জানে না। সপ্তাহে একদিন সে ওখানে গিয়ে গড়ত নিরাবরণ য়্যুগো।

অগুস্ত-এর খ্যাতি ইতিমধ্যে বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক শিক্ষার্থী ওর কাছে কাজ শিখতে এসেছে। সে আমলের শিষ্যদের মধ্যে তিনটি নাম উল্লেখযোগ্য। ভাস্কর হিসাবে এর মধ্যে সবচেয়ে নাম করেছেন জুলে দেবয়। তাঁকে বলা যায় রোদ্যাঁর অন্যতম উত্তরসূরী। অপর দুই শিষ্য অন্য কারণে বিখ্যাত। প্রথমত রবার্ট ব্রাউনিঙ জুনিয়ার, বিখ্যাত কবি রবার্ট ও এলিজাবেথ ব্রাউনিঙ-এর পুত্র। দ্বিতীয়ত, বেডেন পাওয়েল—যিনি 'বয়েজ-স্কাউট'-এর জনক। পেতি অগুস্ত তখন সতের-আঠেরো—ভাস্কর্যের শিক্ষানবিশী।

1883 সালেই প্রয়াত হলেন পাপা রোদ্যাঁ। একাশি বছর বয়সে।

মৃত্যুকালে সবাই ছিল তাঁর শয্যা ঘিরে—অগুস্ত, পেতি অগুস্ত, মেরী রোজ, থেরেস পিসি। অগুস্ত বৃদ্ধের হাতটি তুলে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে বললে, কষ্ট হচ্ছে?

বৃদ্ধের জ্ঞান টনটনে। বললেন, হচ্ছে। তুই যে আমাকে কথা দিলি না? এতে কষ্ট হয় না?

—বললাম তো! কথা দিচ্ছি—রোজ ব্যুরের দায়-দায়িত্ব আমার। সে যাতে কখনও কোন....

—বাজে কথা বলিস না অগুস্ত! তুই জানিস আমি কী চাই। বৌমাকে তুই বিয়ে করবি এই কথা দে, আমি হাসতে হাসতে চলে যাই!

থেরেস্ পিসি—তাঁরও বয়স সাতাত্তর—ঝুঁকে পড়ে বলে, আমি তো রইলাম দাদা ; কিছু চিন্তা করনা তুমি।

মেরী রোজ অগুস্ত্-এর হাত ধরে আড়ালে টেনে নিয়ে গেল। দু-চোখের জলে সে ভাসছে। বললে, জীবনে মিছে কথা যে কখনও বলনি এমন তো না, পাপা রোদ্যাঁকে না হয় একটা মিথ্যে সান্ত্বনাই দিলে! তুমি তো জানই—আমি কোনদিন তোমাকে এ নিয়ে পীড়াপীড়ি করব না।

পাশের ঘরে পাপা রোদ্যাঁ তখন থেরেস্ পিসিকে বলছে, ওদের ডেকে নিয়ে এস। বৌমা বোধহয় চেষ্টা করছে বোঝাতে—এ সময়ে মিথ্যা স্তোক দিতে হয়। লাভ নেই থেরেস্। ও হবার নয়। ওর মা বলত—খোকনের সব ভালো, শুধু জিদ্দিবাজির জন্য ওর কিছু হবে না!

এই তার শেষ কথা!

ভিক্তর য়্যুগো মারা গেলেন 1885তে—জুলিয়েতের মৃত্যুর দু বছর পরে।

☆ ☆ ☆

রমণীজাতির মোহিনী, নন্দা ও হ্লাদিনী শক্তির বিষয়ে রোঁদ্যার শিল্পমানস কী বলতে চায় তা বুঝে নিতে কলকাতা প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত তিনটি ভাস্কর্যকে আমরা যৌথভাবে আলোচনা করব। যে কথা ইতিপূর্বই বলেছি, আবার তাই বলতে হচ্ছে : রোদ্যাঁ গ্রীকযুগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর চুম্বকসার এবং তিনি প্রাচ্যধারার প্রতিও আগ্রহী। ফলে রমণীর রমণীয় রূপকে গ্রীকদর্শন কী চোখে দেখেছিল তা আমাদের সংক্ষেপে জেনে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে :

প্লেটো তাঁর 'সিম্পোজিয়াম'-এ বলেছেন . ভেনাস দু জাতের : Venus Coelesus এবং Venus Naturalis; অর্থাৎ 'অপার্থিব ভেনাস্' এবং 'প্রাকৃতিক ভেনাস'। প্রভেদটা জননী ও স্ত্রীর নয়, লক্ষ্মী ও উর্বশীর নয়। এখানে উর্বশীর দ্বৈতসত্তার কথাই বলা হচ্ছে। তাই বাঙলায় অনুবাদ করে বলব, প্রভেদটা জীবনসঙ্গিনীর দ্বৈতরূপের—এক, সে নর্মসহচরী, শয্যাসঙ্গিনী ; দুই, সে সহধর্মিণী, হ্লাদিনী। উদ্ধৃতি দেব না, বিষয়টা বুঝে নিতে হলে কৌতূহলী পাঠক দিলীপ কুমার ও রবীন্দ্রনাথের কথোপকথনটা পড়ে নিতে পারেন 'তীর্থঙ্কর' গ্রন্থে।

রমণীর ঐ রমণীয় রূপকে—নর্মসহচরীর ব্যঞ্জনাকে আলোচনা করতে আমরা দুটি উদাহরণ পেশ করছি। তৃতীয়টি দ্বিতীয় সত্তার · নারীর হ্লাদিনী শক্তির ব্যঞ্জনাময়।

☆ ☆ ☆

THE KISS (1888) : **চুম্বন**—প্রথমেই উল্লেখ্য, এ ভাস্কর্য 'নরকের দ্বার'-এর অঙ্গীভূত। সম্ভবত পাওলো ও ফ্রাঁসেস্কার অবৈধ প্রণয়-এর বিষয়বস্তু এবং তাই এর স্থান 'নরকের দ্বার-এ। অথচ এ মিথুনমূর্তিতে যে ভাবের ব্যঞ্জনা তাতে নরক নিঃশেষে মুছে গেছে। পরিবর্তে আমরা পেলাম একটি স্বর্গীয় মিথুন। ভুবনেশ্বর, পুরী, খাজুরাহো, কোণার্কের মৈথুনরত মিথুনের সঙ্গে এর প্রভেদ যেটুকু তা শিল্প-শৈলীতে, রসের বিচারে নয়। লক্ষণীয়, প্রকৃতি এখানে যেন অধিক পরিমাণে অগ্রসর, পুরুষ কিছুটা নিষ্ক্রিয় ; নায়িকার আশ্লেষ শয়না ভঙ্গিমায় যতটা ভাবাবেগ পুরুষের যেন ততটা নেই। আমরা, শক্তিভাবনায় জারিত দর্শকেরা, বলব : তাই তো হবে। দেখছ না, প্রকৃতির বাম পদপল্লবটি পুরুষের দক্ষিণ চরণের উপর

ন্যস্ত। বিপরীত রত্যাতুরার এই শক্তি ব্যঞ্জনাটি শিল্পী এক তির্যক ইঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলেছেন : শেক্সপীয়রের দেশের সমালোচক ধমকে উঠবেন : বলডারড্যাশ। শিল্পীর মানসচক্ষে তখন ভাসছিল 'ভেনাস অ্যান্ড এ্যাডনিস্'-এর সেই অনবদ্য পংক্তি দুই—'O, pity', con she cry, Flint-hearted boy! 'Tis but a kiss I beg, why art thou coy ?'
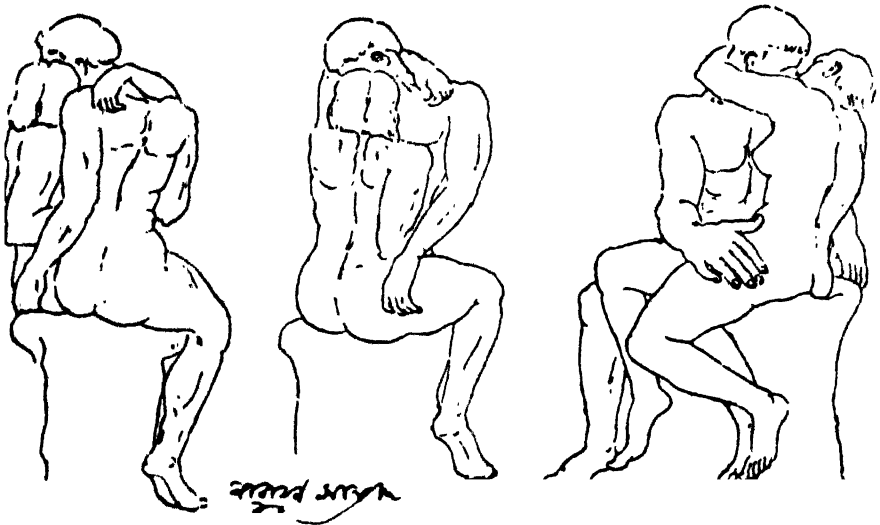
চুম্বন (১৮৮৮)

একটি তথ্য প্রসঙ্গত পেশ করা যাক : সৃষ্টির পাঁচ বছর পরে শিকাগো শহরে বিশ্ব-প্রদর্শনীতে এটিকে যখন দেখানোর ব্যবস্থা হল তখন রোদ্যাঁকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছিল, অশ্লীলতার দায়ে। সেটাই ক্লাইম্যাক্স নয়, অতি সাম্প্রতিক কালে, বস্তুত পঞ্চাশের দশকে, লন্ডনের স্টেট গ্যালারীর কর্তৃপক্ষ যখন ঐ মূর্তির একটি মর্মর প্রতিকৃতি সংগ্রহে উৎসাহী হলেন তখনও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল।

ETERNAL SPRING (1884) : **চিরবসন্ত** : যদি বলেন, এর নামও তো 'চুম্বন' হতে পারত তাহলে আমি আপত্তি করব। পূর্ববর্তী উদাহরণে ছিল—'দুখানি অধর হতে কুসুম চয়ন/ মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে।' এখানে তা নয়। ঘরে ফেরার অবকাশ আর নেই। উভয়েই উত্তেজিত উত্তাল, উদ্দাম। প্রকৃতি এখানে পুষ্পধনুকাকৃতি। জ্যামুক্ত সেই পুষ্পধনুর পঞ্চশর দয়িতের মর্মমূল বিদীর্ণ করেছে। পুরুষ এবার আর আধা-উদাসীন নয়। নিষ্ক্রিয় মহাশিব যেন এবারে চোল-ব্রোঞ্জ ভঙ্গিমায় নটরাজ। ধ্বংসের নয়, সৃষ্টির। তার পদদ্বয় ভূমিস্পর্শ করে নেই, সে যেন নন্দনলোকে ভাসমান। দক্ষিণ হস্তে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেছে প্রিয়তমাকে ; কিন্তু সেখানেই যেন তার কামনা-বাসনার শেষ নয়। মানছি, ওর বাম হস্তের উৎক্ষেপ কম্পোজিশনের নির্দেশে, নায়িকার পদদ্বয়কে ব্যালেন্স করতে ; কিন্তু ভাবের রাজ্যে

মনে হচ্ছে সে যেন ঐ বাঁ হাতে বিশ্বপ্রপঞ্চকে জড়িয়ে ধরতে চায়। পুরুষের বহুমুখী আকাঙ্ক্ষার কি আদি-অন্ত আছে? হেলেন-প্রাপ্তির পরেও প্যারিস যেন বলছে : ধনং দেহিং, জয়ং দেহি, যশো দেহি।' সুবর্ণগোলকের আলোকবিচ্ছুরণ একমুখী হয় না। নারীর তা নয়। তার একমুখী আত্মসমর্পণের ভঙ্গিমাটি যেন পঞ্চশরের কার্মুক।

আমরা, ভারতীয় দর্শকেরা, বলব : মিথুনমূর্তিটা অতিভঙ্গ মূর্ছনার। ওঁরা, পশ্চিমী দর্শকেরা বলবেন, A couplet of eternal ecstasy!

THE ETERNAL IDOL (1889) : **শাশ্বত হ্লাদিনী** –Venus Coelestis! অপার্থিব ভেনাস। পূর্ববর্তী নারীমূর্তিদুটির এ যেন বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। এর মুখে এক স্বর্গীয় দ্যোতনা। অপাপবিদ্ধ নিকশিত হেম! সে বরদা, হ্লাদিনী শক্তির মূর্ত প্রতীক। পুরুষ তাকে সৌন্দর্যের পাদপীঠে বসিয়ে পূজা করতে চায়। দেহজ কাম অপসৃত; তাই পুরুষের হাত নারীকে বেষ্টন করেনি, তাই ওর মাথা স্তনাগ্রচূড়ার নিচে। প্রকৃতির দক্ষিণ হস্ত ও মস্তক আলম্ব, ঋজু ভঙ্গিমায় যেন নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখা। যদিও পুরুষের গুরুভারে কাঁধ থেকে জানু পুরুষমূর্তির বঙ্কিম ভঙ্গিমার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেছে। অপরপক্ষে নায়ক কায়মনোবাক্যে পতনোন্মুখ ওক গাছের মতো সৌন্দর্য দেবীর পাদপীঠে আশ্রয় খুঁজছে। ভারতীয় নিরিখে নায়িকার দক্ষিণ হস্তে ভূমিস্পর্শমুদ্রা, বাম হস্ত : বরদা। উর্ধ্বাঙ্গে প্রকৃতি ঋজু, পুরুষের সাপোর্ট; নিম্নাঙ্গে সে পুরুষের সঙ্গে ঐকতানে একটি বঙ্কিম সরলরেখায় একাত্ম।

'চুম্বন' বা 'চিরবসন্তের' 'ভেনাস ন্যাচুরালিস'-এর সঙ্গে এ ভাস্কর্যের আর একটি বৈপরীত্য লক্ষণীয়। প্রথম দুটিতে মনে হচ্ছে মূর্তিগুলি পরমুহূর্তেই নড়েচড়ে উঠবে। যেন গতিময় ভঙ্গিমার ক্ষণিক স্ন্যাপশট। যেন নায়াগ্রা প্রপাতের আলোকচিত্র। স্থিতির মধ্যে গতির ব্যঞ্জনা। অপর পক্ষে এখানে স্থিতির মধ্যে শুধু জ্যোতির আভাস। যেন অচঞ্চল মানস সরোবরে প্রতিবিম্বিতা ফুলেভরা রোডোডেনড্রন!

এই হ্লাদিনী শক্তিই যুগে যুগে বীরকে করেছে বিজয়ী, গায়ককে সরব, শিল্পীকে যুগে যুগে সৃজনধর্মী আর নীরব কবিকে মুখর। প্রথম দুটি মিথুন মূর্তির যে ব্যঞ্জনা তার তুল্যমূল্য মিথুন আমরা অসংখ্য দেখেছি ভারতীয় মন্দিরে, কিন্তু এই তৃতীয় মূর্তির যে রস—নারীর হ্লাদিনী শক্তির বহিঃপ্রকাশ এবং সৌন্দর্যের বেদীমূলে প্র্যাক্সিটেলীজ-এর সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি 'দেহিপদপল্লবমুদারম্'—ভারতীয় কোনও মিথুনমূর্তিতে তা আমার অন্তত নজরে পড়েনি।

☆ ☆ ☆

লেঅনার্দোর সঙ্গে রোদ্যাঁর একটা চরিত্রগত সাদৃশ্য আছে। অপ্রাপণীয়ের শিখরচূড়ায় কল্পনাকে অধিষ্ঠিত করে অন্তর্লীন সৃজন বারুদের স্তূপের উপর শিল্পী বসে আছেন অর্থীর প্রদীপশিখাটির প্রত্যাশায়। নিয়োগকর্তা লেঅনার্দোকে বললেন, বড় জলাভাব, কী করা যায় ? লেঅনার্দো আঁক কষতে বসলেন—আর্নো নদীকে ভিন্নখাতে বইয়ে দেবেন, যা নাকি তদানীন্তন প্রযুক্তি-বিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে নিছক পাগলামী। নিয়োগকর্তা বললেন, শহরে মাঝে-মাঝেই মহামারী লাগে, কী করা যায় বলত ? লেঅ তৎক্ষণাৎ মিলান শহরের এমন এক পুনর্বিন্যাস পরিকল্পনা ফাঁদলেন যা অপূর্ব কিন্তু অবাস্তব। নিয়োগকর্তা বললেন, বাবার একটা মূর্তি মিলানে বসালে কেমন হয় ? লেঅ তৎক্ষণাৎ মূর্তি গড়তে বসলেন—তদানীন্তন পৃথিবীর বৃহত্তম অশ্বারোহী মূর্তি, তাও অশ্ব চার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবে না ; দুটি পা থাকবে শূন্যে।

রোদ্যাঁ তাই। তাঁকে বলা হল—মাঝারি মাপের একটি প্রবেশ-তোরণ বানাতে, তিনি নিজেই তার মাপকে করলেন দ্বিগুণ ; প্রস্তাবিত মূর্তি সংখ্যা হয়ে গেল তিন গুণ।

কর্তারা বললেন, এ কী ? তিন বছরের ভিতর শেষ করার কথা ছিল যে ?

শিল্পী বললেন, তা কি হয় ? দেখছেন না, কী পরিকল্পনা ফেঁদেছি ? এ দ্বার হবে বিশ্বের বিস্ময় !

—কিন্তু এগ্রিমেন্টে যে লেখা আছে—

—ছিঁড়ে ফেলে দিন সেটা। আমি যা গড়ছি তা দেখতে বিশ্ব সমবেত হবে পারীতে !

—আমরা তো তা চাইনি ?

—কিন্তু আমি যে তাই চাই।

গাম্বেতা—ওর পৃষ্ঠপোষক, গত হয়েছেন। এখন যাঁরা ফ্রান্সের কর্ণধার তাঁরা বললেন, হয় আর এক বছরের ভিতর কাজ শেষ কর, অথবা সুদ সমেত টাকা ফেরত দাও। অগুস্ত্ কর্ণপাত করল না, প্রাণপাত করল। দ্বিগুণ উৎসাহে গড়তে থাকে নূতন নূতন মূর্তি—কুম্ভিপাকে যারা কাৎরাচ্ছে।

কিন্তু একান্ত হয়ে কি সে কাজটাই করতে পারছে ছাই ? আসছে নতুন নতুন অর্ডার—নতুন নতুন সৃষ্টির উন্মাদনা। রিপাবলিক্ অব চিলির প্রতিনিধি এসে ওকে অনুরোধ করল, সান্তিয়াগোতে জেনারেল লিঞ্চ্ -এর একটি অশ্বারোহী মূর্তি বানাতে চান চিলি সরকার। অগুস্ত্ কি কাজটা নিতে পারেন না ?

—পারি না ? বল কি ? এই প্রথম অশ্বারোহী মূর্তি গড়ার বায়না এল যে !

ফরাসী চিত্রকর বাস্তিয়-লেপাজ অকালে প্রয়াত হলেন—মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে। দাম্ভিলের্স—ওঁর জন্মস্থানের নগরপাল চিঠি লিখলেন—'আমাদের কবির একটি মর্মর মূর্তি তাঁর সমাধিস্থানে বসাতে চাই। আপনি কি— ?'

—বিলক্ষণ ! লেপাজ এক মহান শিল্পী। সে আমার বন্ধু ছিল যে।

পারীর বিখ্যাত নিসর্গ-চিত্রকর ক্লদ লোরেনের একটি মূর্তি। নগরপালের এ সিদ্ধান্ত শ্রবণমাত্র অগুস্ত্ প্রস্তাব পাঠালো সে স্বহস্তে ক্লদ লোরেনের শ্রদ্ধার্ঘ্যটি নির্মাণ করতে ইচ্ছুক ; অগত্যা—

তারপরেই এল এক অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জ—'বার্গার্স্ অব ক্যালে' : ক্যালে-নাগরিকবৃন্দ।

'শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের' এক খণ্ডকাহিনী। চতুর্দশ শতাব্দীর ঘটনা। ইংলন্ডেশ্বর তৃতীয় এডওয়ার্ড-এর নৌবাহিনী ক্যালে নগরীকে বিচ্ছিন্ন করেছে ইংলিশ চ্যানেল থেকে ; স্থলবাহিনী অবরোধ করে রেখেছে বাকি তিনদিক। যে কোনও একদিক দিয়ে ফরাসী বাহিনী নগরে সাহায্য প্রেরণ করতে সক্ষম হবে এই আশায় ক্যালে আত্মসমর্পণ করেনি। দুর্ভেদ্য নগর প্রাচীরের বাধাও অতিক্রম করতে পারেনি ব্রিটিশ বাহিনী। দীর্ঘ এক বৎসর ক্যালের নাগরিকবৃন্দ যুদ্ধ করেছে। ব্রিটিশ সেনাদলের বিরুদ্ধে নয়, অনাহার মৃত্যুর বিরুদ্ধে। অবশেষে যখন ক্যালে-নগরবাসী নিশ্চিত প্রণিধান করল—সাহায্য কোনোদিনই আসবে না, তখন তারা আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠালো ব্রিটিশ জেনারেলের কাছে।

অবরোধকারী সেনাপতি জবাবে জানালেন, দুটি বিকল্প প্রস্তাব আছে। তোমরাই বেছে নাও। এক : আমার বিজয়ীবাহিনী ক্যালে প্রবেশ করে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দেবে। জনহীন ক্যালে-নগরীতে আমরা নিয়ে আসব ব্রিটিশ নাগরিক। ক্যালে হবে একটি ব্রিটিশ উপনিবেশ। দুই : নগরের বাছা বাছা ছয়জন নাগরিক গোটা শহরের অনিবার্য ধ্বংস এড়াতে আত্মবলি দেবেন। তাদের নগ্নপদে নিরস্ত্র অবস্থায় আত্মসমর্পণ করতে হবে বিজয়ী সেনাপতির শিবিরে—হাতে ক্যালের প্রবেশ-তোরণের কুঞ্চিকা, গলায় ফাঁসির দড়ি—স্বহস্তে পরানো। প্রবেশ-তোরণের সম্মুখেই আমরা ফাঁসির মঞ্চটা নির্মাণ করে রাখব।

ক্যালে দ্বিতীয় প্রস্তাবটি গ্রহণ করল। ক্যালে নগরীর সবচেয়ে ধনবান নাগরিক ঔস্তাস্ দে সেন্ত-পীয়ের সর্বাগ্রে স্বীকৃত হলেন। সম্মান ও প্রতিপত্তির বিচারে আরও পাঁচজন স্বনির্বাচনে হলেন তাঁর পাঁচজন সহযাত্রী : পীয়ের দে উইসান্ত, আঁদ্রে দ' আন্দ্রে, জাকুয়ে দে উইসাঁৎ, জাঁ দ' এয়ার, এবং জাঁ দে ফীনে। এতদিন যাঁরা ছিলেন নগরের সবচেয়ে সম্মানিত নাগরিক, তাঁরা রওনা হলেন পদযাত্রায়—নগ্নপদে, সাধারণ নাগরিকের বেশে, হাতে শহরের প্রবেশ-তোরণ-কুঞ্চিকা, গলায় ফাঁসির দড়ি—স্বহস্তে পরানো। তাঁদের পরিবারবর্গও নগ্নপদে প্রিয়জনদের পৌঁছে দিয়ে গেল নগর প্রান্তের মৃত্যু-তোরণ পর্যন্ত। তাদের চোখে জল ছিল না আগুন ছিল, ইতিহাস সেকথা লিখে রাখতে ভুলেছে!

1884 সালে ক্যালের নগরপাল 1347 সালের ঐ অবিস্মরণীয় ঘটনাটি শাশ্বত করে রাখার বাসনা জ্ঞাপন করলেন। দেশের যাবতীয় প্রথম শ্রেণীর ভাস্করের কাছ থেকে প্রতিযোগিতা-মূলক 'টেন্ডার' আহ্বান করা হল। বুশ্যে আপত্তি করেছিল, প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছিল মেরী-রোজ—হাতে যা কাজ আছে তাই পর্যাপ্ত! আবার বোঝা বাড়ানো কেন? কারও কোনো পরামর্শ শুনল না অগুস্ত্। দাখিল করল তার স্কেচ্—প্রতিযোগিতায়।

গৃহীত হল সেটাই। অতএব বোঝার উপর শাক-আঁটির জগদ্দল পাহাড়।

আঠাশে জানুয়ারী 1885 কন্ট্রাক্টে সই হল।

মজা এই, যদিও তাকে বলা হয়েছিল শুধুমাত্র দে সেন্ত্-পীয়র'-এর দণ্ডায়মান মূর্তি বানাতে, অগুস্ত্ পরিবর্তে দাখিল করল ছয়-ছয়জনের নমুনা-মডেল! ক্যালে নগরপাল প্রতিবাদ জানালেন : এ কী! ছয়জন নাগরিক তো আমরা চাইনি?

অগুস্ত্ বলল, না, আপনি চাননি ; চেয়েছিল ব্রিটিশ সেনাপতি!

—সে তো জানিই! কিন্তু ঐ ছয়জনের প্রতীক হিসাবে আমরা তো একটিই মূর্তি

চেয়েছি—শুধুমাত্র উস্তাস্ দে সেন্ত্-পীয়র !

—সে তো জানিই ! কিন্তু বাদবাকি-পাঁচটি প্রাণকে কোন অধিকারে আপনি অপমান করবেন ? তারা প্রাণ দিতে পারল, আর আপনি মান দিতে পারবেন না ?

—কিন্তু ছয়টা মূর্তি নির্মাণে আমাদের বাজেটে যে ছয়গুণ টান পড়বে ।

—কে বলেছে ? চুক্তিনামা অনুযায়ী একটি মূর্তি নির্মাণের মজুরিই আপনি মেটাবেন। শুধুমাত্র ঢালাই-খরচ বৃদ্ধি পাবে। আমার শ্রমমূল্য নয় !

এই হলেন অগুস্ত্ রোদ্যাঁ !

মেরী-রোজ বলল, তুমি কি ক্ষেপে গেলে অগুস্ত্ ! একটা মূর্তির মজুরি নিয়ে ছয়টা মূর্তি গড়বে ? কী জন্য ? শুধুমাত্র দেশপ্রেম ?

—না ! শুধুমাত্র দেশপ্রেম নয় ! তার চেয়েও বড় কিছু !

—আর কী ? ক্যালের হতভাগ্য সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে ছয়-ছয়জন মহাশহীদ আত্মবলি দিলেন—এটাই তো এ ভাস্কর্যের বক্তব্য ?

—না রোজ, তা নয় ! গল্পের বাকিটুকু তুমি জান না। শোন বলি ! ঐ ছয়জনের শেষ পর্যন্ত ফাঁসি হয়নি, তা জানো ? মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়েছেন ছয়জন শহীদ। দাঁড়িয়েছেন সারি দিয়ে। তাঁদের গলায় স্বহস্তে পরানো ফাঁসের দড়ি। কাতারে কাতারে ব্রিটিশ সৈনিক তাঁদের সামনে—পুরোভাগে ব্রিটিশ সেনাপতি। আর নগর প্রাচীরের উপর ভীড় উপচে পড়ছে ক্যালে নগরবাসীর। এমন সময় এসে উপস্থিত হল এক অশ্বারোহী ! সেনাপতিকে স্যালুট করে দাখিল করল স্বয়ং ইংলন্ডেশ্বরের সীলমোহরাঙ্কিত লেফাফা।

ইংলন্ডেশ্বর তৃতীয় এডওয়ার্ড সেনাপতিকে আদেশ দিয়েছেন—সসম্মানে ছয়জন বন্দীকে মুক্তি দিতে !

—সেকি ! কেন ?

—সেনাপতিও তাই ভাবছিল ! এমন অদ্ভুত আদেশের কী হেতু হতে পারে ? বৃদ্ধ সমরনায়ক যুদ্ধটাকেই জীবনের পরমার্থ হিসাবে জানে—জানে না, 'শান্তি' তার চেয়েও বড় ! দীর্ঘ এক বৎসর ফরাসী বাহিনীর দুঁদে সেনাপতিরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্রিটিশ বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করতে পারেনি। ব্যর্থ হয়েছিল ক্যালের নাগরিকদের কোনও সাহায্য পৌঁছে দিতে। কিন্তু সেই অসাধ্যই সাধন করেছিলেন এক অবলা ফরাসী তরুণী, তাঁর ঐকান্তিক প্রেমের হ্লাদিনী শক্তিতে !

—মানে ?

ইংলন্ডেশ্বর তৃতীয় এডওয়ার্ড-এর রানী ছিলেন ফরাসী ! 'ক্যালে' শহর তাঁর মাতুলালয় ! ফরাসী কামান যেখানে ব্যর্থ হল, ফরাসী কামিনী সেখানে বিজয়িনী। ইংলন্ডেশ্বর প্রেমের মর্যাদা মিটিয়ে দিয়েছিলেন রানীর চোখের জল মোছাতে ! এ ভাস্কর্যের নেপথ্যে শুধু ফ্রান্সের বীরত্ব আর ইংলন্ডের মহত্বই নয়,— আছে বিশ্বনিয়ন্তার শ্রেষ্ঠ কীর্তির ব্যঞ্জনা— প্রেমের জয়গান !

রোদ্যাঁর কিছু বিতর্কিত ভাস্কর্য

ডাফ্নি ও লাইসিনিয়

একটি জটিল ও বিতর্কমূলক শিল্প। বিড়লা আকাদেমির রোদ্যাঁ প্রদর্শনীতে আমি যখন এটি দেখছিলাম তখন আমার পাশে ছিলেন মধ্যবয়সী এক দম্পতি। ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীকে ইংরাজিতে বললেন, 'ভারতীয় মন্দিরে এ জাতের মিথুনমূর্তি অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু য়ুরোপীয় ভাস্কর্যে...'

ভদ্রলোক তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি নিঃসন্দেহ যে, এটি একটি মিথুন? আমি কিন্তু দুটি স্ত্রীলোককে দেখতে পাচ্ছি। সম্ভবত 'লেস্‌বিয়ান ইন্টিমেসি।'

আমিও এতক্ষণ ঐ কথাই ভাবছিলাম। দুটি চরিত্রই স্ত্রীলোকের। নিচে বাধাদানকারী মূর্তিটি নিঃসন্দেহে নারীর—সনাক্তিকরণের বক্ষস্থ প্রত্যঙ্গদ্বয় অবশ্য দু হাতে ঢাকা পড়েছে; কিন্তু তার পেলব দেহাবয়ব একটি যুবতীর, বলা যায় প্রায়-কিশোরীর। অপূর্ব লাবণ্যময়ী, অসহায় সে। অপরপক্ষে উপরের ফিগারটির দেহসৌষ্ঠব পুরুষালি; কিন্তু তার দক্ষিণস্তন সন্দেহাতীতভাবে বলে দেয় সে একজন 'আমেজন'। পুরুষভাবাপন্ন বলিষ্ঠগঠনা নারী। কী বক্তব্য শিল্পীর?

ক'লকাতা ও দিল্লি প্রদর্শনীতে এই এক্সিবিট্-এর ক্রমিক সংখ্যা ছিল সত্তর। উভয় ক্যাটালগেই ব্যাখ্যা হিসাবে যা বলা হয়েছে তার আক্ষরিক অনুবাদ "—এ ভাস্কর্যে দেখা যাচ্ছে আলিঙ্গনবদ্ধ দুটি রমণীকে; এটি লঙ্গাস-বিরচিত একটি প্রখ্যাত লোকগাথা অনুসরণে নির্মিত। সেই কাহিনীতে মূল চরিত্রের একজন ছিল পুরুষ। মিথুন ভাস্কর্যগুলি নির্মাণকালে মূর্তির যৌনাঙ্গ বিষয়ে রোদ্যাঁ কী-পরিমাণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়তেন এ ভাস্কর্য তারই একটি দলিল।"

ব্যাখ্যাটা কিছুতেই মেনে নিতে পারিনি। রোদ্যাঁর অনেকগুলি মিথুনমূর্তি প্রদর্শনীতে দেখেছি, অনেক-অনেক আলোকচিত্রও দেখেছি—কিন্তু ভ্রমক্রমে পুরুষমূর্তির 'টর্‌সো'-তে নারীস্তন কোথাও যুক্ত হতে দেখিনি। মুণ্ডহীন মূর্তি দেখেছি। হাত-পা-হীন ধড় দেখেছি—কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিল্পী সজ্ঞানে, বিশেষ একটি রস-পরিবেশনের উদ্দেশ্যে সেগুলি ইচ্ছা করেই গড়েছেন। অন্যমনস্কতা অথবা 'Lack of attention'-এর জন্য এ-জাতীয় ভ্রান্তি তো কখনও নজরে পড়েনি। প্রসঙ্গত বলি, প্রাথমিক পর্যায়ে প্রখ্যাত বালজাক মূর্তিতে রোদ্যাঁ দুটি হাত গড়েছিলেন; কিন্তু ওঁর প্রিয় শিষ্য বোর্দেল মতামত প্রকাশ করেছিলেন যে, হাত দুটি বাদ দিলেই ভালো হয়। রোদ্যাঁ কিছুক্ষণ চিন্তা করে শিষ্যের সঙ্গে একমত হন এবং ড্রেসিং-গাউন থেকে বেরিয়ে থাকা দুটি হাত কব্জি থেকে কেটে বাদ দেন। আলোচ্য ভাস্কর্যে ঐ তথাকথিত 'ত্রুটি' যদি রোদ্যাঁ'র অন্যমনস্কতা বা অনবধানতাজনিত কারণে হয়ে থাকে তাহলে সেটা কি

তাঁর কোনও শিষ্যেরও নজরে পড়ল না? তাহলে তাঁর কোন শিষ্য কেন কখনও বলল না, 'মেৎর! আপনি ভুলে পুরুষের টরসোতে নারীস্তন গড়েছেন!' এ ভাস্কর্য নির্মিত হবার পর দীর্ঘ ত্রিশ বছরের উপর তো রোদ্যাঁ বেঁচেছিলেন। নাকি ধরে নিতে হবে ভারতীয় ব্যাখ্যাকারের আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত একশ বছর ধরে সবাই ভুগছিলেন ঐ একই রোগে, "Lack of attention to the sexual appearance of the figures..."

অভিদের রূপান্তর (1886)

অগুস্ত্ রোদ্যাঁর উপর যে-কয়খানা গ্রন্থ যোগাড় করতে পেরেছি তাতে এ ভাস্কর্য নিয়ে কোনও আলোচনা আমার নজরে পড়েনি। অগত্যা স্মারক-পুস্তিকার নির্দেশমতো সন্ধান করেছি। জানা গেল, 'লঙ্গাস্ তৃতীয় খ্রীস্টাব্দের এক প্রতিষ্ঠিত গ্রীক সাহিত্যিক। গদ্যে রচনা করেছিলেন Dapnis and Chloa কাহিনী। ডাফনে (অ্যাপোলতাড়িতা হতভাগিনী 'ডাফনি' নয়, এ পুরুষ) সিসিলির একজন মেষচারক।

Chloa হচ্ছেন ডিমিটার, অর্থাৎ গ্রীক শস্যদেবী—গ্রীক-ইন্দ্র জিয়ুস-এর ভগ্নী তথা পার্সিফোন-এর জননী। লঙ্গাস্-এর রচনা আমি পড়িনি, আন্দাজ করছি, লাইসিনিয় ঐ কাহিনীর অপর কোনও চরিত্র। সে যাই হোক, দেখা যাচ্ছে লঙ্গাস্ রচিত কাহিনীতেও আছে পুরুষ ও রমণী....দুটিই নারী নয়।

অথচ লক্ষ্য করছি, ফাইডন প্রকাশনা এ ভাস্কর্যের নামকরণ করেছেন (প্লেট : 52) 'দ্য মেটামর্ফসিস্ অব অভিদ'; নিউ ইয়র্কের দ্য মডার্ন লাইব্রেরী রোদ্যাঁর উপর যে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন সেখানে ভাষ্যকার লুই উইনবের্গ এ ভাস্কর্যের নাম দিয়েছেন 'মেটামর্ফসিস্ অ্যাকর্ডিং টু অভিদ'। ফরাসী ভাষায় মূল নামকরণ কী করা হয়েছিল জানি না। সে যাই হোক, এবার ঐ সূত্র ধরে অগ্রসর হওয়া গেল।

অভিদ (43 B.C.-17 A.D.) লাতিন কবি। পঞ্চদশ খণ্ডে রচিত বিরাট কাব্যগ্রন্থ মেটামর্ফসিস। এ কাব্যের উপজীব্য অরফিউস্ ও ইউরিদিসের মর্মন্তুদ কাহিনীটি। সুধীজন মাত্রেই জানেন সেই গ্রীক উপকথাটি। কবি অরফিউস মৃত্যুরাজ্যে গিয়েছিলেন মৃত স্ত্রী ইউরিদিসের সন্ধানে। যমরাজাকে সঙ্গীতে মুগ্ধ করে তিনি সঙ্গিনীকে ফিরিয়েও আনছিলেন, কিন্তু ক্ষণিক অসতর্কতায় তাঁর স্ত্রী পুনরায় ফিরে গেল মৃত্যুরাজ্যে। অরফিউস বাকি জীবন বনে-জঙ্গলে শুধু বিরহের গানই গেয়ে গেছেন। রোদ্যাঁর অরফিউস মূর্তিটি প্রদর্শনীতে ছিল অন্যতম আকর্ষণ। ঐ কাহিনীর উপসংহারটি এবার কবি বুদ্ধদেবের ভাষায় শুনুন :

"অভিদ-এর 'রূপান্তর' কাব্য থেকে তা বিবৃত করছি। পাতাল থেকে সন্তপ্ত চিত্তে

পৃথিবীতে ফিরে অর্ফিয়ুস আর তিন বছর বেঁচেছিলেন। এই তিন বছরে, বহু রমণীর যাচনা সত্ত্বেও, তিনি কোনও স্ত্রী-সংসর্গ করেননি ; দ্বিতীয় দারগ্রহণও তাঁর পক্ষে অচিন্তনীয় ছিলো। এ-সময়ে তাঁর প্রণয়পাত্র ছিলো শুধু বালকেরা—থ্রেশীয়দের তিনি বোঝাতেন যে, সেটাই 'শ্রেয়তর পথ'। কিন্তু এই উপেক্ষা-অপমান থ্রেশীয় নারীদের পক্ষে অসহ্য হলো, ক্রোধ ও লালসায় উন্মাদ হয়ে তারা দলবেঁধে নিষ্ঠুরভাবে অর্ফিয়ুসকে বধ করল।" ('রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা', বুদ্ধদেব বসু পৃঃ 203)।

অভিদ বর্ণিত এই অংশটির স্বচ্ছন্দ ও ঈষৎ সংক্ষেপিত অনুবাদ করেছিলেন কবি বুদ্ধদেব বসু ঐ গ্রন্থে—রলফ্ হামফ্রীস্-এর ইংরাজি থেকে। শেষ দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে বিরহী অরফিউস্ নির্জন অরণ্যপর্বতে একদিন বীণা বাজিয়ে গান করছে—বৃক্ষ, শিলা, সিংহ ও পশুপক্ষীরা তন্ময় হয়ে শুনছে। সহসা দূর থেকে তাকে দেখতে পেল ঐ প্রত্যাখ্যাতা রমণীর দল। প্রতিহিংসায় উন্মত্তা হয়ে তারা সদলবলে বিরহী কবিকে আক্রমণ করল:

"কেউ ছুঁড়লো মাটির ঢেলা, কেউ পাথর, কেউ বা ভেঙে নিল গাছের ডাল.....গেলো ডুবে তার মধ্যে বীণাধ্বনি, আর তাই অবশেষে পাথরগুলো—রক্তে লাল, গায়কের রক্তে লাল—"

কবি অর্ফিয়ুস প্রতিরোধের চেষ্টাই করল না। মেনে নিল দুর্দৈবকে। প্রতিবর্তী প্রেরণায় "বিনতিতে হাত বাড়িয়ে দিল কবি, মুখটা ঢাকল।" নিষ্ঠুর যৌথ আক্রমণে অরফিউস প্রাণ দিল বিনা প্রতিবাদে। আর তারপর :

"তার জন্য অশ্রুপাত করল পাখিরা, আর জন্তুর পাল, আর কঠিন শিলা, আর যত বৃক্ষ চলে আসত তার গান শুনতে—

সকলে হলো শোকার্ত। যেমন নারীরা চুল ছেঁড়ে মনের দুঃখে। তেমনি পাতা ঝরিয়ে দিলো বৃক্ষেরা, নদীরা স্ফীত হলে অশ্রুধারায়, বনদেবী ও জলকন্যারা হলো কৃষ্ণবেশে শোকময়ী।" (বু. ব.)

আপাতত না হয় ধরে নিন ফাইডন প্রকাশনাই ঠিক বলেছেন—স্মারক-গ্রন্থের ভাষ্যকার তাঁর Lack of attention-এ এটিকে lack of attention বলেছেন। তাহলে কী দাঁড়ালো ?

রোদ্যাঁ একটি ক্লাসিকাল কাব্যকাহিনী 'রূপান্তর'কে ভাস্কর্যে রূপান্তরে প্রয়াসী। সেক্ষেত্রে দু-দুটি শিল্পগত সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে ভাস্করকে। শিল্পের 'মিডিয়ম' পরিবর্তনের জন্য। কাব্য থেকে ভাস্কর্যে। প্রথম কথা একাধিক প্রতিহিংসা-পরায়ণার মূর্তি ভাস্কর্যে জটিলতার সৃষ্টি করবে—শিল্পে যে বেদনার মূর্ছনা, সেখানে ভিড় বরদাস্ত হবে না। 'গ্রুপ' চলবে না। এ সমস্যার একমাত্র সমাধান নিষ্ঠুরা রমণীকুলের প্রতীক হিসাবে একটিমাত্র বলিষ্ঠগঠনা নারীমূর্তির সংস্থাপন। সে হবে বলশালিনী আমেজন। দ্বিতীয় সমস্যা, দেখতে হবে একটিমাত্র রমণী একজন যুবককে হত্যা করছে। দৃশ্যকাব্য হিসাবে সেটাও যে বেমানান—কারণ যুবকটি নির্জীব নয় আদৌ, সে কাব্যের নায়ক। দর্শনযোগ্য শিল্প হিসাবে সেটাও যে দৃষ্টিকটু।

হয়তো এই দুটি সমস্যার সমাধানে রোদ্যাঁ অভিদ রচিত কাব্যটির নামকরণকে কাজে লাগালেন : রূপান্তর ! অরফিউস্-এর রূপান্তর ঘটালেন ! অরফিউস্—হোক সে পুরুষ—এখানে সে কিসের প্রতীক ? ঐকান্তিক প্রেমের, বিরহবেদনার, কবিতার, সঙ্গীতের—এ পুরুষ

পৃথিবীতে যা কিছু পেলব, তার। সৌকুমার্য, রমণীয়তা, পেলবতা। তাই অরফিউস্ রূপান্তরিত হল ধর্ষিতা রমণীতে। হয়তো সেজন্যই লুই উইনবের্গ শিল্পটির নামকরণ করেছেন "Metamorphosis according to Ovid" (অভিদ অনুসরণে রূপান্তর) ; ফাইডন প্রকাশনার "অভিদের রূপান্তর" নয়।

আর তাই আমরা রোদ্যাঁর শিল্পে দেখছি অরফিউস একটি ধর্ষিতা রমণী—প্রায় কিশোরী। বিনতিতে সে বাড়িয়ে দিয়েছে হাত প্রতিবর্তী প্রেরণায়। উপরের শ্রেণীয় রমণী প্রায় পুরুষ ; "আমেজন'। তার প্রকাশমান স্তন সত্ত্বেও সে মূর্তিতে একটা পুরুষজনোচিত কাঠিন্য!

এ ব্যাখ্যাটা মানতে পারলেন?

হয়তো এখনও আপনি মানতে রাজি নন। বেশ, আসুন, তাহলে অরফিউস-তত্ত্বের মূলে প্রবেশ করা যাক।

বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর 'এ হিস্ট্রি অব ওয়েস্টার্ন ফিলসফি'-তে বলছেন, প্রাক-হোমার যুগের গ্রীকদর্শনে ছিল দুটি ধারা—ব্যাকাসতত্ত্ব এবং অরফিউস্-তত্ত্ব। 'ব্যাকাস' হচ্ছেন ইন্দ্রিয় কামনা-বাসনা ও মদিরার দেবতা—যেমন আমাদের কামদেব। অপরপক্ষে অরফিউস্-তত্ত্ব বলে সুখ নয়, আনন্দই মানব-জীবনের লক্ষ্য। এ তত্ত্ব আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসী—ব্যাকাস-তত্ত্ব যেমন বলে যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ। রাসেল আরও বলছেন, "Orpheus is said to have been a reformer who was torn to pieces by frenzied Maenads actuated by Bacchic orthodoxy." (শোনা যায়, ব্যাকাসের মতাবলম্বী ক্ষিপ্ত পুরোহিতেরা সমাজ-সংস্কারক কবি অরফিউস্কে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।) অর্থাৎ ঐ আমেজন-নারী ধর্মান্ধ ব্যাকাস-পন্থী নিষ্ঠুর পুরুষ-পুরোহিত-এর প্রতীক।

প্রশ্ন হতে পারে—একশ বছর পূর্বে রোদ্যাঁ কি এ তত্ত্ব জানতেন? বার্ট্রান্ড রাসেলের গবেষণাগ্রন্থ তো সে তুলনায় হাল-আমলের। তা ঠিক! কিন্তু ব্যাকাস-তত্ত্ব আর অরফিউস-তত্ত্ব কি শাশ্বত সত্য নয়? রোদ্যাঁর সমকালেও এ দুই সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত। বোদলেয়ার, এমিল জোলা, ম্যালার্মে, মোপাসাঁ ব্যাকাস তত্ত্বের ধ্বজাধারী। আর শাশ্বত-সৌন্দর্যের দরদী প্রবক্তা লেও টলস্টয় প্রায় সমকালে রাশিয়ায় বসে রচনা করছেন What is Art? মোপাসাঁর অবক্ষয়ে কাউন্ট টলস্টয়ের হাহুতাশটা পড়ে দেখুন—শুনতে পাবেন একই আক্ষেপ! উনবিংশ-শতাব্দীর অরফিউস্ মোপাসাঁর ধর্ষণে যেন টলস্টয় বেদনাহত।

প্রসঙ্গত বলি, জার্মান কবি মারিয়া রিলকে রোদ্যাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন, এমনকি তাঁর অবৈতনিক সচিবের কাজও করেছিলেন কিছুদিন। রোদ্যাঁর ভাস্কর্য দর্শনের পর তিনিও একগুচ্ছ কবিতা লিখেছিলেন অরফিউস্কে উপলক্ষ করে।

ফুজিতামোর

বন্ধুবর ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলেছিলেন, এমন 'কিম্ভুত' মিথুন আমি জীবনে দেখিনি—কী ভারতে, কী পাশ্চাত্যে! নারী নিচে, উপুড় হয়ে শুয়েছে, পুরুষ তার উপর চিৎ হয়ে। 'অ্যাবসার্ড কম্পোজিশান'।

কথাটা ভাববার !

এমন অদ্ভুত অবাস্তব পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাটা কী? বিড়লা আকাদেমী প্রকাশিত স্মারক-পুস্তিকায় ব্যাখ্যাকার বলেছেন, "This pair symbolizes the carnal side of human love. The work also portrays the illusive appeal of beauty, embodied by the woman evading the outstretched arms of the man who vainly tries to hold her back." (এ মিথুন মানবপ্রেমের রিরংসার প্রতীক। শিল্পটির আরও একটি আবেদন আছে : সৌন্দর্যের পলায়নী মনোবৃত্তি। তাই দেখছি, মেয়েটি পুরুষের প্রসারিত বাহুর প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে পলায়নোদ্যতা।)

Fugit Amor, পলাতকা প্রেম (1884)

ব্যাখ্যাটা মেনে নেওয়া যায় না। Carnal side of human love (মানব প্রেমের রিরংসার দিক) কোথায়? 'মানবপ্রেম' তো একতারায় বাজে না, বাজে দোতারায়, খঞ্জনীতে। এক হাতে যেমন তালি বাজে না, একপাটি খঞ্জনীতেও তেমনি আদিরস বাজে না। বোধ করি ব্যাখ্যাকার বলতে চেয়েছিলেন 'ম্যাসকুলিন ল্যভ' বা পুরুষের রিরংসার কথা। রমণী যে পলায়নপরা, রমণ-বিমুখ, সেকথা তো নিজেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু সেটাই যদি এ-শিল্পের মৌল প্রতিবেদন হয় তাহলে ব্যাখ্যাকার দুটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের কী জবাব দেবেন? এক : পুরুষ যদি প্রকৃতির নাগালই পেতে চায়, তাকে যদি ধরতেই চায়, তাহলে চিৎ-হওয়া কাছিমের মতো অসহায় ভঙ্গিতে শুয়েছে কেন? দুই: মেয়েটি যদি পলায়নপরাই হবে, তবে পুরুষের প্রসারিত বাহুর আলিঙ্গনপাশ দু'হাতে ছাড়াতে চাইছে না কেন? কী কারণে সে শুধু দুহাতে নিজের দুই কান চেপে ধরেছে?
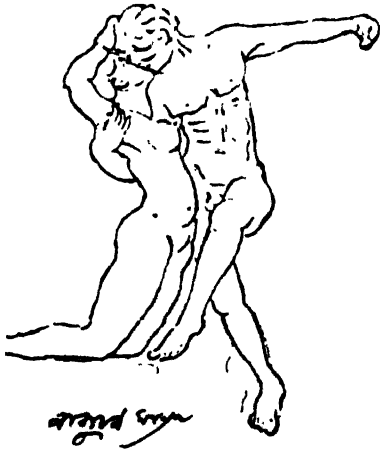
চিরবসন্ত-রোদাঁ (1884)

এ-দুটি সমস্যার সমাধান না হয় পরে খুঁজে দেখা যাবে, আপাতত স্বীকার্য যে, যে কোন মিথুনে আছে দ্বৈতসত্তা—তাদের ব্যক্তি মানসের মিলনেচ্ছার তারতম্যে শিল্পের আবেদনে প্রকারভেদ হতে পারে। যথা, এক : নারী উত্তেজিত, সকর্মক—পুরুষ উদাসীন (যেমন, রোদ্যাঁর 'দ্য কিস্')। দুই : নারী-পুরুষ উভয়েই উত্তেজিত এবং সকর্মক (যেমন, রোদ্যাঁর 'দ্য ইটার্নাল স্প্রিং')। তিন : পুরুষ সকর্মক—নারী উদাসীন বা অকর্মক এবং চার : পুরুষ সকর্মক নারী অনিচ্ছুক বা বাধাদানেচ্ছু (যেমন, ব্যাখ্যাকারের মতে আলোচ্য ভাস্কর্য।)

অ্যাপোলো-তাড়িতা ডাফনে

-বার্নিনী

প্রেমের এই যে তৃতীয়-চতুর্থ পর্যায় এটি ভারতীয় মিথুন ভাস্কর্যে উপেক্ষিত। পাশ্চাত্যে এর ভূরি ভূরি শিল্প উদাহরণ আছে। রোমকসভ্যতার পত্তনই তো হয়েছিল সাবাইন রমণী-কুলের অপহরণে। রোমকশিল্পে এবং মধ্যযুগে ঐ 'ম্যাস্-অ্যাবডাকশন' নিয়ে বহু শিল্প রূপায়িত হয়েছে। লোরেঞ্জো বার্নিনী অথবা ফ্রাঁসোয়া গিরারগঁর 'পারসফোনের অপহরণ' অনবদ্য শিল্প। অথচ ভারতীয় মন্দির ভাস্কর্যে অপহরণ দৃশ্য আদৌ প্রতিভাত নয়। পুরাণেও অপহরণের, বলাৎকারের বহু কাহিনী আছে, কিন্তু ভাস্কর সেগুলিকে শিল্পের উপজীব্য করেননি। রোম নগরীর উত্থানের মতো মথুরাপুরীর পতনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'ম্যাস-অ্যাবডাকশন'। তা নিয়ে কোন শিল্প গড়ে তোলার কথাও কেউ চিন্তা করেননি। বোধকরি রবি বর্মার পূর্বে রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের অনবদ্য কাহিনীকে রূপায়িত করার কথা কখনো চিন্তা করেননি কোন ভারতীয় শিল্পী।

চতুর্থ পর্যায়, অর্থাৎ বলাৎকারের কথা না হয় বাদই দেওয়া যাক, সেটিকে শিল্পের বিষয়বস্তু করার হয়তো আপত্তি ছিল ভারতীয় ভাস্করের, কিন্তু তৃতীয় পর্যায়টিই বা কেন এভাবে উপেক্ষিত? অর্থাৎ পুরুষ যেখানে কামার্ত, প্রকৃতি অনিচ্ছুক? বাস্তব জীবনে এটি তো পরীক্ষিত সত্য। বস্তুত বাৎস্যায়ন থেকে হ্যাভলক এলিস্ বলেছেন তিন-চারটি সন্তান

উন্মাদনা'র পরে এটাই নাকি সচরাচর দাম্পত্য জীবনের অভিজ্ঞতা। তবু এটি ভাস্কর্যে স্বীকৃত নয়। উপন্যাসে পাই প্রচুর পরিমাণে, কাব্যেও। পুরুষের খেদ শুনি : "কেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে, রহিলে না ধ্যান-ধারণায়" ; তার "প্রাণপাখি কাঁদে এই বাসনার টানে" ; অপরপক্ষে নারীর উক্তিও সমান সকরুণ—'কেন কাঁদি বুঝিতে পার না ? তর্কেতে বুঝিবে তা কি ? এই মুছিলাম আঁখি, এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভৎসনা।"

প্রেমের এই যে পরিণতি— Love's sad satiety—এর প্রতিফলন আমরা ভাস্কর্যে অতি অল্পই দেখেছি—কী প্রাচ্যে, কী প্রতীচ্যে।

রোদ্যাঁকৃত আলোচ্য ভাস্কর্যে ফিরে আসা যাক। শিল্পটির নাম—রোদ্যাঁর দেওয়া নাম : Fugit Amor, ইংরাজি অনুবাদে যা নাকি : Fleeing Love, এবং বাঙলায় : 'পলাতকা প্রেম'।

উদ্বেজিত মিথুন
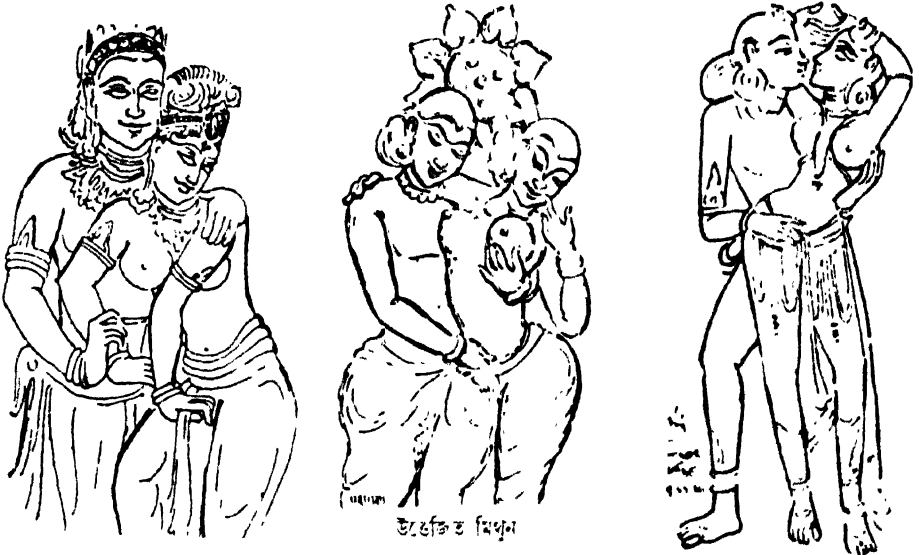
বিষয়বস্তুটা ব্যাখ্যা করতে একটা তুলনামূলক ভাস্কর্য আগে দাখিল করি বার্নিনীর : 'অ্যাপোলো এবং ডাফনে'। কাহিনীটি সুপরিচিত—জলকন্যা ডাফনেকে অঙ্কশায়িনী করার উদ্দেশ্যে অ্যাপোলো পাগল হয়ে ওঠে। কিন্তু ডাফনে তাকে পিতৃস্থানীয় মনে করে বলে পালিয়ে বেড়ায়। একদিন অ্যাপোলো ঐ জলকন্যাকে তাড়া করে এবং নিরুপায় ডাফনে অলৌকিক ক্ষমতাবলে স্বেচ্ছায় আত্মবিলুপ্তি ঘটাতে একটি বৃক্ষে রূপান্তরিতা হয়ে যায়। এই গ্রীক উপকথাটি অবলম্বন করে অসীম প্রতিভাধর ভাস্কর লোরেঞ্জো বার্নিনী (1598–1680) যে শিল্পটি গড়েছিলেন তারই রেখাচিত্র এখানে দেবার চেষ্টা করেছি। এখানেও পুরুষের রিরংসার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মেয়েটি পলায়নপরা। এক্ষেত্রে মেয়েটির দুই হাতের উৎক্ষিপ্তি এবং অসহায়ত্ব অপহৃতা পারসিফোনের (বার্নিনী এবং গিরারর্গাঁ) অনুরূপ। রোদ্যাঁর নায়িকা এ-জাতীয় অসহায় ভঙ্গি করেনি আদৌ—তার মুখভাবে আতঙ্কও নেই, আছে বেদনার বহিঃপ্রকাশ। কেন ?

কারণ, আমাদের মতে, মেয়েটি আদৌ পালাতে চায় না, সে ধরা দিতেই চায়। পালাচ্ছে

'প্রেমিকা' নয়, Amor—'প্রেম'। ট্র্যাজেডি সেটাই।

স্মর্তব্য : ইবসেন-এর 'A Doll's House' (পুতুল খেলা) প্রকাশিত হয়েছিল 1870 সালে ; আর তার ফরাসী অনুবাদ হয়— 1882 সালে। আলোচ্য ভাস্কর্য তার দু-বছরের ভিতর নির্মিত। শুধু ইবসেন-এর 'পুতুল খেলা'ই নয় ; সমকালীন ফরাসী সাহিত্যে দাম্পত্য জীবনের এই ট্রাজিডিটুকু নানাভাবে ফুটে উঠেছে। উচ্চ ও মধ্যবিত্তের সমাজে স্বামী তার নিজের কর্মজগৎ নিয়ে মশগুল—বাড়ি-বুহ্যাম-বিত্তের মতো বনিতা বাবুর কাছে এক ব্যবহারের বস্তু, উপভোগের উপচার। শিল্পবিপ্লবের পর পুরুষমানুষ ঘর ছেড়ে বাইরে তাকাতে বাধ্য হচ্ছে। কাজের অবকাশে গৃহে ফিরে সে জীবনসঙ্গিনীকে দেখতে চায় মহিমময়ী সম্রাজ্ঞীরূপিণী ক্রীতদাসীর ভূমিকায়। গৃহস্বামিনীরও যে একটা নিজস্ব জগৎ আছে, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, বিকশিত হবার বাসনা থাকতে পারে এ-বোধ স্বামীর নেই। যেন ভূপতি তার সাংবাদিকতার মাধ্যমে দেশসেবার অবকাশে চারুলতাকে সময় ও সুযোগমতো কাছে পেতে চায় ; যেন মহিম তার মহিমা দিয়েই অচলাকে বাঁধতে চায়। যেন নিখিলেশ ... থাক, আর উদাহরণ বাড়াবোনা না। ডল্স-হাউস্-এর নোরা, নষ্টনীড়-এর চারুলতা, গৃহদাহের অচলা অথবা ঘরে-বাইরের মক্ষিরাণী কেউই উদাসীন, নিষ্প্রেম ছিল না—তবু তারা মাঝে মাঝে দুহাতে নিজের কান চাপা দিয়ে ভালবাসার বাঁধা বুলিকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। স্বগতোক্তি করেছে—'এখন হয়েছে বহু কাজ, সতত রয়েছ অন্যমনে/সর্বত্র ছিলাম আমি, এখন এসেছি নামি/হৃদয়ের প্রান্তদেশে/ক্ষুদ্র গৃহকোণে।" দুর্ভাগ্য তারা—যেভাবে, যে-ভঙ্গিমায় জীবনসঙ্গিনীর মন ছোঁওয়া যায় তা ওদের প্রেমাস্পদেরা জানত না। ভুল পথে, ভুল ভঙ্গিমায় তারা নায়িকাকে পেতে চেয়েছিল। জানত না—হাত দিয়ে সে-দ্বার খোলে না, গান গেয়ে সে-দ্বার খোলা যায়।

এ ব্যাখ্যা যদি মেনে নিতে পারেন তাহলে বন্ধুবরের মতে—ঐ 'কিম্ভুত' মিথুনমূর্তিটি সার্থক হয়ে উঠবে। ওদের ঐ বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে শয়নের অবাস্তব ভঙ্গিমা, ভ্রান্তভঙ্গিতে পুরুষটির ঐ অপ্রাপণীয়াকে প্রাপ্তির প্রয়াস এবং নায়িকার দু-হাতে নিজের কান চেপে ধরার ব্যঞ্জনাটি বাঙ্ময় হয়ে উঠবে।

আবার বলি, পালাচ্ছে 'প্রেমিকা' নয়, 'প্রেম'।

Fugit Amor !

"...পয়োমুখম্"

অমৃতকুম্ভের খোঁজে নয়, হরিদ্বার গিয়েছিলাম কুম্ভমেলার উৎসসন্ধানে।

কুম্ভমেলায় ইতিপূর্বে কখনো যাইনি, ইচ্ছাই হয়নি, এবার যেতে হল নেহাৎ ঘটনাচক্রে। যেতেই যখন হল তখন কিছু বই ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখতে হয়। প্রথম কথা এ মেলার উৎপত্তির ইতিহাস :

অমৃতকুম্ভযোগের আদি ইতিহাস ও মাহাত্ম্যের বিষয়ে পৌরাণিক কাহিনীটা আপনাদের নিশ্চয় জানা। উপায় নেই। আবার আমাকে সংক্ষেপে সেটি নিবেদন করতে হবে :

পুরাণকার নাকি বলছেন, 'দেবাসুর মিলিত হয়ে সমুদ্রমন্থনের আয়োজন করলেন।'

এখানেই থামতে হবে আমাদের। প্রথমে জেনে নেওয়া দরকার 'দেবাসুর' কে, 'সমুদ্র'টা কোথায় এবং হঠাৎ সেটা 'মন্থন' করারই বা কী প্রয়োজন হল ? স্থূল অর্থে দেবতারা হচ্ছেন পার্টি-ইন-পাওয়ার। অসুরেরা আছেন অপজিশনে। দেবতাকুলের গদী-আসীন হচ্ছেন ইন্দ্র, চীফ হুইপ বৃহস্পতি। লীডার অফ্ দ্য অপোজিশনটি যে ঠিক কে, এ নিয়ে নানা পুরাণের নানামত, তবে বিরোধীদলের মস্তিষ্ক তথা চীফ-হুইপ : শুক্রাচার্য। দ্বিতীয়ত, সমুদ্র বলতে কোনো লবণাম্বুরাশি নয়, হিমালয় পর্বতের উত্তরে অবস্থিত একটি ক্ষীরসমুদ্র। তার ভৌগোলিক অস্তিত্ব নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে। প্রথমত ক্ষীর আমাদের হজম হয় না ; আমরা ফুচ্‌কা খেতে অভ্যস্ত। দ্বিতীয়ত, হিমালয় যে এককালে সমুদ্রগর্ভে ছিল তার জিওলজিক্যাল এভিডেন্স আছে ; তৃতীয়ত, এ কাহিনীর কারবার 'ফ্যাক্ট' নিয়ে নয়—'ফ্যান্টাসি' নিয়ে। তিন নম্বর প্রশ্নটা ছিল, ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করার প্রয়োজন হল কেন ? সরকারী প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এ একটি যৌথ প্রচেষ্টা—রত্নাকরের অমূল্য সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে। প্রাপ্তব্য সম্পদ একটি সমঝোতার মাধ্যমে দেব ও অসুরদের মধ্যে বণ্টিত হবে এমন এক পূর্ব-প্রতিশ্রুতি মোতাবেক এ এক জয়েন্ট-ভেঞ্চার। কোনো কোনো দুর্মুখ অবশ্য রটনা করেছেন—সমুদ্রমন্থনের প্রয়োজন হয়েছিল একটি গূঢ় কারণে : দেবরাজ ইন্দ্র নাকি ঋষি গৌতমের স্ত্রী অহল্যার প্রতি একটু 'ইয়ে' হয়ে পড়েছিলেন : কিছু বেলেল্লাপনাও করেছিলেন ; তাতে দুর্বাসামুনি নাকি ইন্দ্রকে অভিশাপ দেন। তাই রোগমুক্তির জন্য ইন্দ্রের এক বোতল অমৃতের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তা সে সব রিঅ্যাক্‌শানারিদের অপপ্রচারে আমরা কান দেব না।

মন্থনদণ্ড হলেন মন্দর পর্বত, রজ্জু হলেন বাসুকি এবং স্বয়ং বিষ্ণু কূর্মরূপ ধারণ করে মন্দরপর্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করলেন। বৃহস্পতির গোপন ইঙ্গিতে দেবগণ রইলেন বাসুকির লেজের দিকে, যাতে বাসুকির বিষ-নিঃশ্বাসে তাঁদের কোনো ক্ষতি না হয়। বোকাসোকা অসুরেরা রইল বাসুকির মুখের দিকে। শুরু হল পর্যায়ক্রমে টানা ও ছাড়া।

সমুদ্রমন্থনে যেসব সম্পদ একে একে উঠে আসতে থাকে তা ছলে-বলে-কৌশলে ক্রমাগত দখল করতে থাকেন পার্টি-ইন-পাওয়ার দেবগণ। সব শেষে উঠলেন ধন্বন্তরি, অমৃতভাণ্ডটি হাতে নিয়ে। এবার অসুরেরা তার ভাগ চাইল। কারণ 'অমৃত' বস্তুটা তরল, তা বিভাজ্য। লক্ষ্মী-কৌস্তভ-উচ্চৈঃশ্রবা-ঐরাবতের মতো অবিভাজ্য নয়। কিন্তু ইন্দ্র হচ্ছেন টিপিক্যাল শোষক-শাসক! ডাইনেস্টিক-রূলে বিশ্বাসী। নিজে ইন্দ্রত্ব খোয়ালে যাতে তাঁর অপোগণ্ড পুত্রটি গদী দখল করতে পারে এটাই তাঁর একমাত্র চিন্তা। তাই অনেকানেক কেষ্ট-বিষ্ণুকে উপেক্ষা করে হস্তলাঘবতার মাধ্যমে ভাণ্ডটি তিনি পাচার করে দিলেন পুত্র জয়ন্তকে। তার কর্ণমূলে বললেন, বাছা! 'ফোট'! অর্থাৎ কেটে পড়!

তাই পড়লেন জয়ন্ত। কেটেই পড়লেন তিনি। পিছন পিছন ধাওয়া করল অসুরকুল। লেগে গেল ধুন্ধুমার যুদ্ধ! দ্বাদশদিবসব্যাপী সে যুদ্ধ। ইন্দ্র যদি পাত্রটা দেবসেনাপতি কার্তিক বা ঐ জাতীয় কোনো উপযুক্ত বীরের হাতে গচ্ছিত রাখতে দিতেন, তাহলে হয়ত সে রুখে দাঁড়াত। কিন্তু জয়ন্তের সে চিন্তাই হল না। সে প্রাণপণে পালাতে থাকে। গোটা জম্বুদ্বীপ দাবড়ে বেড়াচ্ছে জয়ন্ত তার চোরাই-মাল নিয়ে।

কাহিনী অনুসারে জয়ন্ত চার স্থানে দম নিতে থেমেছিলেন। চোরাই মালটা মাটিতে নামিয়ে বোধকরি তাঁর ঠ্যাঙে আয়োডেক্স জাতীয় কোনো আয়ুর্বেদিক ঔষধ মালিশ করেছিলেন। জয়ন্তের অনবধানতায় ঐ চার স্থানেই কিছুটা অমৃত উছলে পড়ে। তাই জম্বুদ্বীপের চারস্থানে গড়ে উঠল সেই মহাচৌর্যাপরাধের পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত চার মহাতীর্থ।

পুরাণকার আরও বলেছেন :

"দেবতানাং দ্বাদশাহোভির্মর্তে দ্বাদশবৎসরৈঃ।
জায়ন্তে কুম্ভপর্বাণি তথা দ্বাদশসংখ্যয়াঃ॥

যেহেতু দেবতাদের প্রতিটি দিন ইকুয়্যালটু মানুষের এক বছর, সুতরাং দেবতাদের হিসাবে দ্বাদশ দিবসব্যাপী যুদ্ধের মানবিক হিসাব হল গিয়ে দ্বাদশ বৎসর। তাই প্রতি বারো বছর পর পর ঐ পুণ্যতীর্থে কুম্ভযোগ অনুষ্ঠিত হইবেক।

কোন্ কোন্ স্থানে? সমাধান আছে শাস্ত্রবাক্যে। অবধান কর :

"গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ ধারা গোদাবরীতটে।
কলসাখ্যোহি যোগোহয়ং প্রোচ্যতে শঙ্করাদিভিঃ॥"

অর্থাৎ হাজার হাজার বছর পূর্বে গড়ে ওঠা সেই অমৃতকুম্ভযোগের তীর্থ-চতুষ্টয় হচ্ছে :

এক : হরিদ্বার—যেখানে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা নেমে এসেছেন গাঙ্গেয় উপত্যকায়।

দুই : প্রয়াগ—সেই যেখানে গঙ্গা মিলিত হয়েছেন তাঁর দুই সখী অনসূয়া-প্রিয়ংবদার সঙ্গে।

তিন : ধারা—শিপ্রানদীতীরে মহাকাল-মন্দির-বিম্বিত উজ্জয়িনীর ঘাট।

চার : গোদাবরী তীরে নাসিকতীর্থ।

আমি অবিশ্বাসী। আমি পাপী, নাস্তিক, নরকের কীট—সব মানছি। তাই আমার কলমে কেবলই কালিমারেখা। এই পৌরাণিক উপকথাটিই আপনারা ইতিপূর্বে পাঠ করেছেন অন্যান্য

ভ্রমণ-সাহিত্যিকদের গ্রন্থে, ভক্তি-রসাপ্লুত সুমধুর ভাষায়। আমার সেইসব পূর্বসূরীরা ছিলেন বিশ্বাসী, আস্তিক, পুণ্যাত্মা এবং সরস্বতীর বরপুত্র-কন্যা। সবই মানছি! কিন্তু বলুন—যে ভাষাতেই রচনা করে থাকি—মূলকাহিনী থেকে আমি কি তথ্যগতভাবে কোথাও বিচ্যুত হয়েছি?

কাহিনীটি আজগুবি, আষাঢ়ে বলে আমার আপত্তি নয়, আমি আহত হয়েছি তার স্থূলতায়! কাহিনীটির নিকৃষ্ট মানের জন্যে। মহাদেবের হলাহলপানের খণ্ডকাহিনী ব্যতিরেকে গোটা উপকথায় কোথাও কোনো 'রিডীমিং ফিচার' নেই। কাহিনীকার কেমন করে আশা করেন, ঐ তৃতীয় শ্রেণীর গপ্পোটা আমাদের ভক্তিরসে আপ্লুত করবে? আমাদের কুম্ভমুখী করে তুলবে? গল্পের নটে গাছটি মুড়িয়ে যাওয়া মাত্র আমরা অমৃতকুম্ভের সন্ধানে যাত্রা করব?

আবার বলি, আজগুবি-আষাঢ়ে বলে নয়, আমার আপত্তি সেটি অপ-রচিত বলে।

অস্কার ওয়াইল্ড-এর 'দ্য সেলফিশ্ জায়েন্ট' কাহিনীও তো আজগুবি, আষাঢ়ে। কিন্তু স্বার্থপর দৈত্য যখন রক্তাপ্লুত বালকটিকে প্রশ্ন করে, 'বল, কে তোমাকে মেরেছে, আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেব'; আর তার জবাবে যখন শিশুটি বলে, 'Nay! These are but the wounds of love!'—তখন আমার মতো অবিশ্বাসী নরকের কীটের চোখও অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। মেটারলিংক-এর 'ব্লু বার্ড', হান্স-এর 'দ্য লিট্‌ল মারমেড' আর ঘরের কাছে মহাভারতের অসংখ্য খণ্ডকাহিনী, 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী'ও তো আজগুবি, আষাঢ়ে! 'ফ্যাক্ট' নয়, 'ফ্যান্টাসি' নিয়ে তাদের কারবার। কিন্তু তারা রসোত্তীর্ণ, তারা আনন্দের দিশারী!

জানি, আপনারা বলবেন, বাপু হে লেখক! তুমি গোড়ায় গলদ করছ! পৌরাণিক কাহিনীটিকে তুমি স্থূল অর্থে গ্রহণ করেছ। তাই রস পাচ্ছ না। এ কাহিনী তো প্রতীকী।

বেশ তাই। তার মানে এই প্রপঞ্চময় জগৎ ভালোয়-মন্দয় মেশানো। দেবতারা হচ্ছে সদ্‌গুণের অধিকারী, সেই সুকৃতি বলেই তাঁরা বাসুদেবের বরে অমৃতলাভ করলেন। অসুরেরা তামসাচারী, তাই তাদের ললাট-লিখন বাসুকির বিষনিঃশ্বাস! সে-ক্ষেত্রে আমি বলব, এই যদি প্রতিপাদ্য বিষয় হয় তবে কাহিনীকার সে-কথা বলতে পারেননি, তাঁর কাহিনীর জাল বুনোনিতে। আপ্তবাক্যের ঘোষণা ছাড়া কোথায় প্রমাণ পেলাম যে, দেবতারা সাত্ত্বিক? নীলকণ্ঠ শিব ব্যতিরেকে কাহিনীটির প্রতিটি দেবতা তমো-গুণান্বিত। তারা বিশ্বাসঘাতক, অসুরদের সাহায্য নিয়েও তাদের ন্যায্য প্রাপ্য দেয় না! দেবরাজ শুধু একদেশদর্শী নন, স্বজনপোষক, স্বার্থপর! জয়ন্ত তস্কর! বিষ্ণু ভণ্ড! অপরপক্ষে তথাকথিত তামসাচারী অসুরদের আঁকা হয়েছে সত্ত্বগুণাশ্রয়ী করে। তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বাসুকির মুখের দিকে সরে এল। দেবতাদের স্বার্থপরতা দেখেও কর্তব্যে অবহেলা করল না—একে একে লক্ষ্মী-ঐরাবত-উচ্চৈঃশ্রবা-কৌস্তুভ ইত্যাদি অসমবণ্টনে ক্ষমতাশীল দল দখল করার পরেও বিদ্রোহ করেনি। কর্তব্য করে গেছে নিরলস নিষ্ঠায়।

এই অপকাহিনীটি শ্রবণের পর বিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী মানুষ কীভাবে মেনে নেবে—জয়ন্তের সেই চোরাই মালের ছিটে-ফোঁটা সংগ্রহ পুণ্যকার্য? এ পথেই করতে হবে অমৃতকুম্ভের সন্ধান?

তাই আমার প্রথমেই মনে হয়েছিল সবার আগে দেখা দরকার মূল কাহিনীটি কী ছিল ? সংস্কারাচ্ছন্ন ভক্তিবাদী মানুষের নিরন্তর কথনে মূল পৌরাণিক কাহিনীটি পরিবর্তিত হয়ে যায়নি তো ?

শুরু হল অমৃতকুম্ভ-কাহিনীর গঙ্গোত্রী-অভিযান।

☆ ☆ ☆

কুম্ভমেলা সংক্রান্ত যতগুলি মাহাত্ম্যগ্রন্থ, ধর্মপুস্তক, ভ্রমণ-কাহিনী বা সংবাদপত্রের রিপোর্টাজ পড়েছি সর্বত্রই ঐ কাহিনীটি একই কাঠামোয় গড়া। সেই সমুদ্রমন্থন, জয়ন্ত কর্তৃক চারতীর্থে ঘট সংস্থাপন, ঘট থেকে অমৃত বিন্দুক্ষরণ। কিন্তু আশ্চর্য। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই নান্দী-ভাষণে একটি বাঁধা-বয়ান : 'পুরাণে কথিত আছে...'।

মাহাত্ম্যগ্রন্থ অথবা ধর্মপুস্তকের পাঠক হাতে তামা-তুলসী নিয়ে বসে, কোনোও বেয়াড়া প্রশ্ন করে না—'কোন্ পুরাণ ?' ভ্রমণকাহিনীর লেখক রসের কারবারী। তাঁরা কিছু ফুট-নোট কণ্টকিত গবেষণাপুস্তক লিখতে বসেননি যে, শুধু 'পুরাণে আছে' বলেই পার পাবেন না। গল্পটি তো খাশা ! লিখে লেখকের আনন্দ, পড়ে পাঠকের। আমিই পড়েছি বিপাকে। কুম্ভের ভিতরে কী-আছে না জেনে তার সন্ধানে দু-হাত তুলে 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ' বলে দৌড়াতে রাজি নই।

'সমুদ্র-মন্থন' কাহিনীটি আমি অনেক প্রামাণিক গ্রন্থে পেয়েছি; কিন্তু বিশ্বাস করুন—জয়ন্তের ঐ কীর্তির কথা কোথাও পাইনি। কোনও প্রামাণিক আকর-গ্রন্থে 'সমুদ্র-মন্থন' কাহিনীর প্রসঙ্গে এই কয়টি শব্দ আমি খুঁজে পাইনি—(1) জয়ন্ত, (2) হরিদ্বার-প্রয়াগ-ধারা-নাসিক, (3) কুম্ভমেলা।

আমার সে অনুসন্ধান-কার্যের ফিরিস্তিটা শোনাই :

রামায়ণের বালকাণ্ডে[1] 'সমুদ্রমন্থন' কাহিনীটি আছে। শ্রীরামচন্দ্র বিশাল নগরীর কাছাকাছি এসে বিশ্বামিত্র মুনির কাছে অতীতকালের কিছু দেবকীর্তির কথা শুনতে চাইলেন। মুনিবর তখন সমুদ্রমন্থন কাহিনীটি রামচন্দ্রকে শুনিয়েছিলেন। বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সেখানে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত অনুল্লেখিত। অমৃতকুম্ভের উছলে ওঠা ছিটেফোঁটা যে জম্বুদ্বীপের কোন তীর্থে আদৌ পড়েছিল এমন নির্দেশ নেই।

মহাভারতের আদি পর্বেও[2] সমুদ্রমন্থন কাহিনীটি আছে। এখানে শৌনিক সে কাহিনীর কথক। এখানেও জয়ন্তের কোনো ভূমিকা নেই। বলা হল, দেবতারাই পূর্ণকুম্ভকে চেটে পুটে শূন্যকুম্ভ করেছিলেন। হরিদ্বার—প্রয়াগ—নাসিক—উজ্জয়িনীর প্রসঙ্গ আদৌ ওঠেনি।

শ্রীমদ্ভাগবতে[3] অতি বিস্তারিতভাবে সমুদ্রমন্থন কাহিনীটি লিপিবদ্ধ। বহু খুঁটিনাটি বর্ণনা আছে। রামায়ণ ও মহাভারতকে সংক্ষেপে সেরেছি—এবার কিন্তু একটু বিস্তারিত আলোচনা অপরিহার্য। শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা করে আমি অন্তত নরকে পতিত হতে চাই না। তাই শুধুমাত্র কয়েকটি মূল শ্লোক ও তার অনুবাদ পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে দিচ্ছি। ভাষ্য আপনারা করুন।

পাপাচারী দৈত্যগণের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যৌথভাবে সমুদ্রমন্থন করা উচিত হবে কী না

জ্ঞানতে দেবতারা •নারায়ণের সমীপে উপনীত হলেন। অর্থাৎ সমুদ্রমন্থনের সেটা প্ল্যানিং স্টেজ। তখনই নারায়ণ দেবতাদের আশ্বাস দিলেন, "মহায়েন ময়া দেবা নির্মথধ্বমতন্দ্রিতাঃ। ক্লেশভাজো ভবিষ্যন্তি দৈত্যা যূয়ং ফলগ্রহা।" অর্থাৎ—'হে দেবগণ! আমার সাহায্যে তোমরা অনলস হয়ে সমুদ্রমন্থন কর। এ ব্যাপারে দৈত্যগণ শুধুমাত্র ক্লেশভোগী হবে, আর তোমরা ফলভোগ করবে।'

সুতরাং বোঝা গেল, অন্তিমে যে সহযোগী দৈত্যগণকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হবে এ পরিকল্পনা কার্যারম্ভের পূর্ব থেকেই চীফ আর্কিটেক্ট শ্রীবিষ্ণুর ছিল।

বাসুদেব আরও পরামর্শ দিলেন, "যূয়ং তদনুমোদধ্বং যদিচ্ছন্ত্যসুরাঃ সুরা।'

"দেখ বাপু! সমুদ্রমন্থনকালে দৈত্যেরা যা চাইবে তা প্রদান করার জন্য মৌখিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ো।'

পরের পংক্তিতে শুকদেব গোস্বামী বললেন, এইভাবে বাসুদেবের পরামর্শ লাভ করে দেবগণ দানবদের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন করল...

"ততো দেবাসুরাঃ কৃত্বা সংবিদং কৃত সৌহৃদাঃ।"

তারপর পর্যায়ক্রমে উঠে আসতে থাকে নানান সম্পদ। শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে নিম্নলিখিত সম্পদগুলি পর্যায়ক্রমে উঠে এসেছিল—হলাহল, সুরভি, উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত, কৌস্তভ, অপ্সরা, লক্ষ্মী, অন্নময়ী সুরা এবং অমৃতভাণ্ড।

হলাহল পান করলেন মহাদেব। পরের ছয়টি সম্পদ অসুরদের লবডঙ্কা দেখিয়ে দেবতারা ভাগাভাগি করে নিলেন। পড়ে রইল অন্নময়ী সুরা ও 'অমৃতভাণ্ড'। 'অন্নময়ী সুরা'কে একটি নারীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। উর্বশী, অপ্সরার মতো। আমার পাপদৃষ্টিতে মনে হয়েছে সেটি নির্ভেজাল-ধেনোমদ।

এই সময় চল্লিশ-একচল্লিশতম শ্লোকে শোনা গেল দৈত্যগণ আবেদন করছে "সত্রযোগ ইবৈষস্মিন্নেষ ধর্ম সনাতন", অর্থাৎ—সত্রযোগে সমানভাগ হয়ে থাকে, এটাই সনাতন ধর্ম। 'সত্রযোগ' শব্দের অর্থ—'যজ্ঞসম্ভূত সম্পদের বণ্টন'।

এর পরেই দেবাসুরের মতপার্থক্য তীব্র হয়ে ওঠে। শুক্রাচার্যের নির্দেশে দানবগণ অমৃতের ভাগ না নিয়ে কিছুতেই ছাড়বে না। তখনই নারায়ণ এলেন দানবদের ভোলাতে। এক মোহিনীমূর্তি ধারণ করলেন নারায়ণ। সেই নারীর দৈহিক রূপ বর্ণনা শুকদেব গোস্বামী যে ভাষায় করেছেন তা তাঁর মতো জিতেন্দ্রিয়ের পক্ষেই সম্ভব। সেটুকু বাদ দিয়ে বরং বলি, দৈত্যগণ সেই নারীর রূপে মোহিত হয়ে গেল। তখন সেই মোহিনী নারীর বেশে শ্রীহরি কুম্ভপাত্রটি নিজ হস্তে ধারণ করে দৈত্যদের প্রশ্ন করলেন, "যদ্যজুপেত ক্ব সাধ্বসাধু বা কৃতঃ ময়া যো বিভজে সুধামিমাং..." ইত্যাদি। অর্থাৎ 'আমি যা করব তা ভালোমন্দ বিচার না করে মেনে নেবে এই প্রতিশ্রুতি যদি তোমরা দাও তাহলেই আমি ন্যায়সম্মতভাবে সমবণ্টন করে দেব।'

নারায়ণের সেই নিষ্পাপ রমণীমূর্তি দেখে দানবেরা ভাবল, ইনি ইন্দ্র, পবন, বরুণ ইত্যাদি দেবতাদের ঊর্ধ্বে। ইনি অন্যায় করতে পারেন না। এমন নিরপেক্ষ বিচারক ওরা কোথায় পাবে? তাই ওরা রাজি হয়ে গেল।

ধরে নিতে পারেন ইন্ডিয়ান অ্যার্বিট্রেশান অ্যাক্ট 1940, ক্লজ 9(b) মোতাবেক !

ন্যায়বিচার সুসম্পন্ন করে শ্রীহরি নারায়ণ অমৃতভাণ্ডটি দিলেন দেবতাদের হাতে এবং অম্লমধুরী সুরাপাত্রটি দিলেন দানবদের। কাউকেই বঞ্চিত করলেন না। অমৃতপানে দেবতাগণ হলেন অমর আর আকণ্ঠ ধেনোমদ গিলে দানবরা হয়ে রইল বুঁদ।

বলতে ভুলেছি, হাত-কাড়াকাড়ির সময় রাহু ঐ ভাঁড়ে একটা চুমুক দিয়েছিল। কিন্তু অমৃত তার কণ্ঠনালীর কাছাকাছি পৌঁছাতেই নারায়ণ সুদর্শন চক্র দিয়ে সেই দানবের শিরশ্ছেদ করলেন। তাই রাহুর মুণ্ডটাই শুধু অমর ! সে চন্দ্র-সূর্যকে গ্রাস করে, উদরস্থ করতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে এর পর একটি অনবদ্য খণ্ডকাহিনী আছে।

নারায়ণের সেই মোহিনী মূর্তি দেখে মহাদেব কামোন্মত্ত হয়ে ছুটে আসেন। নারীরূপী নারায়ণের পলায়ন এবং মদনভস্মকারী জিতেন্দ্রিয় মহাযোগীর পশ্চাদ্ধাবনের একটি কৌতুককর খণ্ডকাহিনীতে এখানে শ্রীমদ্ভাগবত কিছু বিমল হাস্যরস পরিবেশন করেছেন। সেই খণ্ডকাহিনীর 'ক্ল্যাইম্যাক্স' পরম ভাগবত শ্রীশ্রীশুকদেব গোস্বামী বিরচিত একটি অনবদ্য শ্লোকে : মহাদেবের রেতঃপাত হয়ে গেল।

সব শেষে ঈশপী-ঢঙে সমুদ্রমন্থন কাহিনীর একটি 'মর‍্যাল' :

"ইতি দানবদৈত্যয়া নাবিন্দন্নমৃতঃ নৃপ।
যুক্তাঃ কর্মনি যত্তাশ্চ বাসুদেবপরাঙমুখঃ ॥"

যার নির্গলিতার্থ—'দৈত্য দানবগণ যত্নপরায়ণ হইয়া কার্যে নিয়ত থাকা সত্ত্বেও অমৃতলাভ করিতে পারে নাই, কারণ বাসুদেব পরাঙমুখ ছিলেন।'

অতঃপর 'যত্নপরায়ণ হইয়া' কর্মে নিযুক্ত থাকবেন অথবা হৃদিস্থিতেন হৃষিকেশকে দায়ী করে গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে 'পাঁপ হমার কেন হোবে' ভাববেন, সেটা আপনাদের বিবেচ্য। আমি ওর ভিতর নেই।

মোট কথা—শ্রীমদ্ভাগবতে জয়ন্ত না-পাত্তা, কুম্ভযোগ-মাহাত্ম্য কর্পূর।

তাহলে ঐ কাহিনীর উৎস কী ?

ভারত সংস্কৃতি বিষয়ক আকর গ্রন্থগুলি—যেমন ব্যাশামের 'দ্য ওয়াণ্ডার দ্যাট ওয়াজ ইণ্ডিয়া' প্রভৃতিতে কুম্ভমেলার উল্লেখ নেই। অভিধানগুলির ভিতর—চলন্তিকা, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অথবা সুবল মিত্র 'কুম্ভমেলা'-সম্বন্ধে নীরব। সুবল মিত্র মশায়ের বৃহদায়তন অভিধানে হিন্দুধর্ম বিষয়ক অনেক খুঁটিনাটি আছে, যা অন্য অভিধানে সচরাচর পরিত্যক্ত। তবু তাতে 'কুম্ভমেলা' নেই। 'সমুদ্রমন্থন' এবং 'জয়ন্ত' দুটোই আছে ; কিন্তু আমাদের হারানিধি নেই ; অর্থাৎ সমুদ্রমন্থনের অব্যবহিত পরে জয়ন্তের অমৃতকুম্ভ নিয়ে পলায়ন ও চার তীর্থে অমৃতক্ষরণ।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির বিশ্বকোষে[১] 'কুম্ভমেলার' উল্লেখ আছে। কিন্তু সেই বাঁধা বয়ান—"পৌরাণিক প্রবাদ...সমুদ্রমন্থনের পর জয়ন্ত...মেলাটি অত্যন্ত প্রাচীন। হিউয়েন সাঙ এই মেলার উল্লেখ করেছেন।"

এখানেও সেই 'পৌরাণিক প্রবাদ'। তথ্যসূত্রের নির্দেশ নেই। 'হিউয়েন সাঙ এই মেলার

উল্লেখ করেছেন কী করেননি সে প্রসঙ্গে একটু পরেই আসছি।

'ভারতকোষে'ও আছে 'কুম্ভমেলার' এন্ট্রি। লিখেছেন মহাপণ্ডিত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। কিন্তু সেই একই মুখপাত—'পুরাণে কথিত আছে...'।

স্বামী বেদানন্দ মহারাজ একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তাঁর দু-খানি গ্রন্থে[6] কুম্ভমেলার উল্লেখ পেয়েছি। দুটিতেই সেই একই মুখপাত—"পুরাণে বর্ণিত আছে, হিমালয় পর্বতের উত্তরে...জয়ন্ত সেই কুম্ভ লইয়া..." ইত্যাদি।

কোন 'পুরাণে বর্ণিত আছে' তা উল্লেখ করেননি।

এরপর ভারত সংস্কৃতির আর এক মহান পণ্ডিতের প্রসঙ্গে আসতে হবে। পরমভক্ত দিলীপকুমার রায়। তাঁর রচিত—KUMBHA : India's Ageless Festival। বেশ বোঝা যায়, লেখক এটি পাশ্চাত্য পাঠকের মুখ চেয়ে লিখেছেন—না হলে 'সাধু, মেলা, কুম্ভ' প্রভৃতি শব্দকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন ছিল না। কুম্ভ-মাহাত্ম্যের প্রসঙ্গে আসার পূর্বে ভূমিকাতে তিনি আত্মজিজ্ঞাসা করেছেন, "Why then did we take so much pains to state this position, as old as the hills, since we know full well that it could not appeal to the die-hard sceptics among our modern intelligentsia?"

দিলীপকুমার 'কুম্ভ'-কে একটি প্রতীকরূপে কল্পনা করে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। 'কুম্ভ' এ-খানে শাশ্বত ভারত আত্মার প্রতীক—যার আকুতি উপনিষদের সেই মন্ত্রটিতে বিধৃত '—যেনাহম্ নামৃতা স্যাম কিমহং তেন কুর্যাম্?" কিন্তু দিলীপকুমার শুধুমাত্র তাত্ত্বিক আলোচনায়, প্রতীকধর্মী প্রবন্ধের আঙ্গিকে রচনাটিকে সীমিত করেননি। একটা তুলনা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করি : শ্রীঅরবিন্দের 'জগন্নাথের রথ'[8] একটি প্রতীকী প্রবন্ধ। সেখানে স্থান-কাল-পাত্র উহ্য। স্থান—পুরুষোত্তমক্ষেত্র নয়, কাল—রথযাত্রার দিন নয়, পাত্রও শ্রীঅরবিন্দ নন। অপরপক্ষে দিলীপকুমার তিনটিই চিহ্নিত করেছেন। স্থান—প্রয়াগের কুম্ভমেলা, সাল 1954, পাত্র—সশিষ্যা দিলীপকুমার রায়। এমনকি সেবারকার কুম্ভমেলায় কুখ্যাত স্ট্যাম্পিডে যে শ পাঁচেক তীর্থযাত্রী নিহত হয় সেই প্রসঙ্গটিও আছে। যদিচ সে দুর্ঘটনার জন্য আমাদের মতো অবিশ্বাসীদের ভর্ৎসনা করেই লেখক ক্ষান্ত হয়েছেন, "It was a great victory of the unbelievers as against believers. But the faith of the believers remained unbroken."

তাই আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ছে। শুধু অবিশ্বাসীর নয়, যুক্তিবাদীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। দিলীপকুমার 'কুম্ভমেলা'র আদি উৎস সম্বন্ধে লিখেছেন : "We do not know exactly when the legend of the Kumbha first became crystallised and began attracting pilgrims, but we know that the great Chinese traveller historian Hieun Tsang, who came to India in the seventh century, witnessed this magnificient religious festival of Prayag, for he left a graphic account of it·····The date of this celebration was 644 A. D., so that it can be taken as the first account of the Kumbha-mela in recorded history."

দুঃখের বিষয় আমরা প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি।

আমাদের জ্ঞানমতে চৈনিক পরিব্রাজক 'কুম্ভমেলা'র কথা আদৌ লেখেননি। হর্ষের সময় কুম্ভমেলা হত না। হতে পারে না—অঙ্কের হিসাবে। বীল[9] কিংবা ওয়াটার্স[10]-এর প্রামাণিক

গ্রন্থ জোগাড় করা কঠিন, চীনাভাষা তো বুঝবই না ; কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নিষ্ঠাভরে রচিত হিউএন-চাঙ[11] আদৌ দুষ্প্রাপ্য নয়। চৈনিক পরিব্রাজকের দিনলিপির আক্ষরিক অনুবাদ শুনুন—সত্যেন্দ্রনাথ বসুকৃত .

"প্রতি পাঁচ বছরে তিনি (হর্ষবর্ধন) এক মহামোক্ষপরিষদ আহ্বান করেন" (পৃ 66) "সঙ্গমস্থলে (প্রয়াগে) একটি প্রকাণ্ড বালুর চর আছে। এখানে জমি সম্পূর্ণ সমতল। প্রাচীনকাল থেকে রাজারা আর সম্ভ্রান্ত লোকেরা দান করবার জন্য এখানে আসেন। সেজন্য এ জায়গাকে 'মহাদানের মাঠ' বলা হয়। এখানে রাজা শীলাদিত্য (হর্ষবর্ধন) পঁচাত্তর দিন ধরে পঞ্চম-বাৎসরিক দান করতেন।" (পৃ 71)

মেলার নাম 'কুম্ভমেলা' নয় 'মহামোক্ষপরিষদ'। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গম যে বহু পূর্বযুগ থেকেই একটি স্বীকৃত তীর্থস্থান, এর বহু প্রমাণ আছে। ধরুন মহাভারত। শরশয্যায় শেষশয়নে শায়িত ভীষ্মকে ঋষি পুলস্ত ভারতভূখণ্ডের যাবতীয় তীর্থের কথা বলছেন। তাতে 'কুম্ভমেলা'র উল্লেখ নেই। বলা হয়েছে প্রয়াগের সঙ্গমস্থলে স্নান করলে 'কুলগুেব সমুদ্ধরয়েৎ'—সপরিবারে মুক্তিলাভ হয়। দ্বিতীয়ত হিউয়েন সাঙ দু-দুবার 'পাঁচ' বছর কথাটা বলেছেন। ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন, "Harsha was in the habit of making such distributions every five years and the celebration in which Hieum Tsang attended was the sixth of the reign."

চৈনিক পরিব্রাজক-দৃষ্ট মহোৎসব—যা তিনি 'মহামোক্ষপরিষদ' বলে লিপিবদ্ধ করেছেন, সেটি কুম্ভমেলা হতে পারে না অঙ্কশাস্ত্র মতে। কারণ বৃহস্পতি গ্রহ মাত্র পাঁচ বৎসরে একই রাশিতে ফিরে আসতে অক্ষম। তাঁর সময় লাগে পাক্কা বারো বছর। এখনো লাগে, হর্ষের সময়েও লাগত, আর্যরা ভারতবর্ষে আসার আগেও লাগত, মায় 'হোমো-স্যাপিয়ন্স' নামক দ্বিপদী জীব পয়দা হবার আগেও লাগত। 'হোয়ার‍্যাজ' হর্ষের রাজত্বকাল একচল্লিশ বছর (606 —647 খ্রীঃ) 'দেয়ারফোর' তার ভিতর ছয়টি দ্বাদশবর্ষ ব্যবধানের কুম্ভযোগ হতে পারে না—পঞ্চবর্ষ ব্যবধানের 'মহামোক্ষপরিষদ-উৎসবই' শুধু সংঘটিত হতে পারে। কিউ. ই. ডি।

☆ ☆ ☆

বেশ বোঝা যায় কুম্ভমেলার মাহাত্ম্য-কাহিনীটি অর্বাচীন রচনা। কোন প্রাচীন পুরাণে এ কাহিনী নেই। মেলার প্রচারকামী কোনো লোক এ কাহিনী রচনা করে বাজারে ছেড়েছেন। হিউয়েন সাঙের রচনাকে একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, কুম্ভমেলা অন্তত সপ্তম শতাব্দীর পূর্বযুগ থেকে চলে আসছে। আমি কোনো পুরাণে খুঁজে পাইনি বলে নয়, আপনারা হয়ত কোনো-না-কোনো পুরাণে ঐ কাহিনীটি খুঁজে পাবেন। কিন্তু সেটি নিঃসন্দেহে প্রক্ষিপ্ত রচনা। স্কন্দ-অগ্নি-বায়ু বা অন্য কোনো পুরাণে হাতে-লেখা পুঁথি অনুকরণ করবার সময়ে স্বার্থসন্ধানী কোনো অনুলেখক কয়েকটি শ্লোক অনুষ্টুপ ছন্দে রচনা করে দিয়েছেন মাত্র। না হলে কাহিনী এত নিম্নমানের হত না। ক্লাসিকাল পৌরাণিক কাহিনীতে যে মুন্সিয়ানা থাকে—যে হার্দিক প্রসারতার স্বাক্ষর প্রত্যাশিত তার নিতান্ত অভাব ঘটেছে এই গল্পটিতে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও দুটি কথা অনস্বীকার্য।

এক : কুম্ভমেলার আকর্ষণ। গুণোত্তর শ্রেণীতে তা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

দুই : গল্পটি কাঁচা হাতের লেখা হলেও বনিয়াদটি নিখুঁত। অর্থাৎ গল্পের সুপারস্ট্রাকচারটি যিনি নির্মাণ করেছেন তিনি পাকা সাহিত্যিক নন, কিন্তু কালনির্ণয়টি যিনি করেছেন তিনি অঙ্কশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত। অ্যাস্ট্রনমি-পেপারে তিনি একশয় একশ পেতেন। কেন, তাই বলি এবার। বেদানন্দ মহারাজের[12] সঙ্কলিত কয়েকটি শ্লোক শুনিয়ে চার তীর্থে কুম্ভযোগের কালনির্ণয় করি এবার।

হরিদ্বার : "বসন্তে বিষুবে চৈব ঘটে দেবপুরোহিতে।
গঙ্গাদ্বারে চ কুম্ভাখ্যঃ সুধামিতি নরো যতঃ॥"

অর্থাৎ বসন্তকালে সূর্য যখন বিষুবসংক্রান্তিতে আর দেবপুরোহিত বৃহস্পতি যখন 'ঘটে', অর্থাৎ কুম্ভরাশিতে, তখন গঙ্গাদ্বার বা হরিদ্বারে কুম্ভমেলা সংঘটিত হয়। এই যোগে স্নান করলে মনুষ্যকুল সুধা বা অমৃতলাভ করে।

শ্লোকান্তরেও একই নির্দেশ "পদ্মিনীনায়কে মেষে কুম্ভরাশিগতে গুরৌ
গঙ্গাদ্বারে ভবেৎ যোগঃ কুম্ভনামা তদোত্তমঃ॥"

পদ্মিনীনায়ক হচ্ছেন সূর্য। তিনি যখন মেষ রাশিতে এবং দেবগুরু বৃহস্পতি যখন কুম্ভরাশিতে তখন গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে) উত্তম কুম্ভমেলা সংঘটিত হয়।

তখন সেই হর-কী-পৌড়িতে স্নান করলে কী হয়? অপুত্রের পুত্র আর নির্ধনের ধন? না, বাছা। ওসব পার্থিব কামনা-বাসনা থাকলে ঘরে বসে বেস্পতিবারে লক্ষ্মী পুজো করগে যাও; কিম্বা সত্যনারায়ণ ব্রত।

আমরা ভারততীর্থের অভিযাত্রী : নাম্নে সুখমস্তি।

আমাদের মন্ত্র : যেনাহম্ নামৃতা স্যাম...

আমরা অমৃতকুম্ভের সন্ধানে অভিযাত্রী।

"কুম্ভরাশিগতে জীবে যদ্দিনে মেষগেরবৌ।
হরিদ্বারে কৃতঃ স্নানং পুনরাবৃত্তিবর্জনম্॥"

কিছু বুঝলেন?

শুনুন : 'জীব' শব্দের এক অর্থ 'বৃহস্পতি'। সুতরাং ঐ একই গ্রহসংস্থানে যদি হরিদ্বারের হর-কী-পৌড়ীতে একটা ডুব মারতে পারেন তাহলেই গো-জন্ম খালাস! আর পুনর্জন্মের কোনো চান্সই নেই!

একেবারে নেই একথা বলা ঠিক হল না। ধরুন, এই ছিয়াশি সালে আপনি অমৃত কুম্ভযোগে হরিদ্বারে একটা—না হয় তিনটেই ডুব মারলেন। পূর্বকৃত পাপ সব ক্ষয় হয়ে গেল। কেমন তো? তারপর আপনি বাড়ি ফিরে শুরু করলেন আপনার ব্যাওসা—কালোবাজার, ওষুধে ভেজাল, বিধবার সম্পত্তি গ্রাস। ইলেকশানে রিগিং। তাহলে তো আবার 'ইয়ে'-র পুঁজি জমতে থাকবে। তখন উপায়? একটিই পথ : নান্য পন্থাঃ! আপনাকে উন-আশির প্রয়াগকুম্ভে যেতে হবে—এই তিন বছরের ইয়েটা ধুয়ে ফেলতে। চৈত্র-বৈশাখে নয়, মাঘ মাসে।

কারণ :

"মেষরাশিগতে জীবে মকরে চন্দ্রভাস্করৌ।
অমাবস্যা তদা যোগঃ কুম্ভখ্যস্তীর্থনায়কে ॥"

জীব, অর্থাৎ বৃহস্পতি আছেন মেষে, চন্দ্রসূর্য মকররাশিতে। চন্দ্রসূর্য দুজনেই যখন একই রাশিতে গুঁতোগুতি করছেন তখন তিথিটা অমাবস্যা। সূর্য মকরে, অর্থাৎ মাসটা মাঘ।

কিন্তু হিসাবে একটা গড়বড় হল যে। হরিদ্বার-কুম্ভে বৃহস্পতি ছিলেন কুম্ভে, প্রয়াগে মেষে। দুই রাশির ব্যবধানে, তিন রাশি নয়। তবে কি হরিদ্বার-কুম্ভের দু'বছর পরে হবে প্রয়াগকুম্ভ ? না, তা হবে না। বৃহস্পতি দু-রাশি সরতে যেমন দু-বছর সময় নিয়েছেন, তেমনি সূর্যও মেষ থেকে মকরে যেতে সময় নিয়েছেন সাত মাস। সময়ের ব্যবধান একুনে প্রায় হরে-দরে সেই তিন বছরই—দু বছর সাত মাস।

নাসিক সূত্রটি হচ্ছে :

"সিংহরাশিগর্তে সূর্যে সিংহরাশ্যাং বৃহস্পতৌ।
গোদাবর্ষাং ভবেৎ কুম্ভো জায়তে খলু মুক্তিদঃ ॥"

এবার বৃহস্পতি আর সূর্য উভয়েই সিংহরাশিতে। আকাশে সেই উজ্জ্বল গ্রহটি অদৃশ্য। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এটা প্রয়াগ-কুম্ভের চার বছর পরে হবে। যেহেতু বৃহস্পতি মেষ থেকে সিংহে এসেছেন—চার রাশির ব্যবধান। কিন্তু তা হবে না। কারণ গোদাবরীতটে কুম্ভ হবে অমাবস্যায়। শ্রাবণের শেষাশেষি বা ভাদ্রমাসে। অর্থাৎ বৃহস্পতি কর্কট থেকে সবে সিংহে সংক্রামিত হচ্ছেন। নাসিকেও মেলা হবে প্রয়াগ-কুম্ভের গড়ে তিন বছর পরে।

আর কালিদাস পদরজধন্য উজ্জয়িনী-কুম্ভের গ্রহ-সংস্থানটা কী ?

"ঘটে সূরিঃ শশিসূর্যাঃ কুহ্বাং দামোদরে যদা।
ধারায়াশ্চ তদা কুম্ভো জায়তে খলু মুক্তিদঃ ॥"

এবার চন্দ্র সূর্য উভয়েই ঘটে বা কুম্ভরাশিতে, বৃহস্পতি তুলারাশিস্থ। সূর্য কুম্ভে, অর্থাৎ ফাল্গুন মাস। যেহেতু চন্দ্রও সেখানে, তাই অমাবস্যা। নাসিক থেকে উজ্জয়িনী তাহলে প্রায় তিন বছরের ব্যবধান।

তাই বলছিলাম, কালনির্ণয় করতে সূত্রগুলি যিনি বেঁধে দিয়েছেন তিনি গণিত জ্যোতিষে মহাপণ্ডিত। অ্যাস্ট্রনমি গুলে খেয়েছেন! সূর্য-চন্দ্র-বৃহস্পতিকে এমন অনুষ্টুপ প্যাঁচে প্যাঁচে বেঁধে ফেলেছেন যে, মোটামুটি তিন বছরের ব্যবধানে চারটি পুণ্যতীর্থে কুম্ভযোগ হতে বাধ্য!

আমার মনে হয়েছে এই গাণিতসূত্র যে মস্তিষ্কপ্রসূত, তাঁর কলম দিয়ে কুম্ভমাহাত্ম্যের ঐ নিকৃষ্টমানের কাহিনীটি রচিত হতে পারে না। এঁরা দুজন ভিন্ন ব্যক্তি। দুজনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। দুজন বিভিন্ন যুগের লোক। কে তাঁরা ?

☆ ☆ ☆

সমাধানে আমি উপনীত হয়েছি। গল্পটা কে, কেন রচনা করেছিলেন এবং কুম্ভমেলার কালনির্ণয়-সূচক সূত্রগুলি কে লিপিবদ্ধ করেছেন। স্থিরসিদ্ধান্ত নয়, অভ্যুপগম বা হাইপথেসিস্। আমার বিশ্বাস : সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

কিন্তু সেসব কথা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লেখার নয়। আরও একটু চিন্তাভাবনা করি ব্যাপারটা নিয়ে। ওয়ালেসের সন্ধান ইতিমধ্যে যদি পাই, তাহলে, নির্ভয়ে ছাপার অক্ষরে সেই বিপ্লবাত্মক থিয়োরিটা জানিয়ে দিতে পারি।

'ওয়ালেস্'-এর ধরতাইটা ধরতে পারলেন না, নয় ?

শুনুন বলি। আমার চেয়ে হাজারগুণ বুদ্ধিমান, লক্ষগুণ প্রতিভাসম্পন্ন এক মহাপণ্ডিতের অবস্থাও এইরকম হয়েছিল। আমি যেমন গেছিলাম উত্তরভারতে, তিনি তেমনি গেছিলেন দক্ষিণ আমেরিকায়। আমার যেমন সত্যদর্শন হল হরিদ্বারে, তাঁর তেমন হয়েছিল 'গ্যালাপাগোজ'-এ।

বিশ্ববিজ্ঞানের সেই ক্রান্তিকারী মহাপুরুষের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করতে হচ্ছে বলে আমি নিরতিশয় লজ্জিত। আমার এটুকুই বক্তব্য—উপমান-উপমেয়র মধ্যে শুধু একটিমাত্র যোগসূত্র :

সেই বিশ্ববন্দিত মহাবিজ্ঞানী সত্যটা আবিষ্কার করেছিলেন 1836 সালে, কিন্তু তার বাইশ বছর পরেও তথ্যটা প্রকাশ করতে সাহস পাননি। কারণ তিনি জানতেন, ধর্মব্যবসায়ীরা তাঁর আবিষ্কারের ঘোর বিরোধিতা করবে। জানতেন, তাঁর তথ্যটা ছিল ধর্মব্যবসায়ীদের মূল হাতিয়ার—'বাইবেল'-এর বিরোধী। তিনি বলতে চেয়েছিলেন—ঈশ্বর এই 'অমৃতস্য পুত্র'-দের নিজের আদলে বিশ্ব সৃষ্টির ষষ্ঠ দিবসে আদৌ পয়দা করেননি, 'হোমোস্যাপিয়ন্স' নামক দ্বিপদী জীবটি বিবর্তিত হয়েছিল প্রাইমেট বর্গ থেকে। তার মুখের আদল অ্যাঞ্জেল-এর ধাঁচে নয়, শিম্পাঞ্জি-গরিলা-বেবুনের ধাঁচে।

তথ্যটা তিনি ছাপার হরফে তখনই বলতে পারলেন যখন তাঁর দ্বারস্থ হলেন চৌদ্দ বছরের অনুজ আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস্ (1823-1913)। তিনি অস্ট্রেলেশিয়া পরিক্রমা করে এসে জনান্তিকে ঐ বিজ্ঞানীর সঙ্গে একই তথ্যের ইন্ধন যোগালেন! তারপরেই 1859 সালে প্রকাশিত হল বিবর্তনবাদ-বিষয়ক যুগান্তকারী গ্রন্থটি!

তৎক্ষণাৎ খ্রীষ্টান ধর্মজগৎ নিদান হাঁকল : লেখক নাস্তিক! চার্লস ডারউইন অ-খ্রীষ্টান!

কুম্ভমেলার ঐ নিকৃষ্ট উপকথাটি কে, কী উদ্দেশ্যে কবে রচনা করেছিলেন, কেমই বা কুম্ভের আকর্ষণ গুণোত্তর শ্রেণীতে বর্ধিত হচ্ছে, আর কোন্ মহাপণ্ডিত কুম্ভমেলার কালনির্ণয় সূচক শ্লোকচতুষ্টয় রচনা করেছেন, কেন করেছেন, তা আমি জেনেছি ; কিন্তু 'শৃণ্বন্তু' বলে হাঁক পাড়ার আগে আমাকে আর একটু প্রস্তুত হতে দিন। তারপর গ্রন্থাকারে তা প্রকাশ করা যাবে। না-হয় অ-হিন্দুই বনব!

ইতিমধ্যে কোনো ওয়ালেস্-এর সাক্ষাৎ পাওয়া কি নিতান্তই অসম্ভব ?

গ্রন্থনির্দেশ ও তথ্যসূত্র

1) রামায়ণ, বালকাণ্ড, পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ

2) মহাভারত, আদিপর্ব, অস্তীকামৃতমন্থন পর্ব, সপ্তদশ অধ্যায়

3) শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টম স্কন্ধ, শ্লোক সংখ্যা 6–42

4) 'The Wonder That Was INDIA,' by A. L. Basham, Sidgwick & Jackson, London.

5) 'বিশ্বকোষ', পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ৪র্থ খণ্ড।

6) 'ভারতে কুম্ভমেলা', 'কুম্ভমহামেলা', স্বামী বেদানন্দ, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।

7) KUMBHA : India's Ageless Festival, by D. K. Roy.

৪) জগন্নাথের রথ, শ্রীঅরবিন্দ, পণ্ডিচেরী আশ্রম।

9) 'Buddhist Records of the Western World', translated from Chinese, by S. Beal, 2 Vols., Trubner's Oriental Series, 1906.

10) 'On Yuan Chwang's Travels in India', by Thomas Walters, 2 Vols, Royal Asiatic Societies, 1904

11) 'হিউএনচাঙ', সত্যেন্দ্রকুমার বসু, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ।

12) 'ভারতে কুম্ভমেলা', স্বামী বেদানন্দ মহারাজ, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।
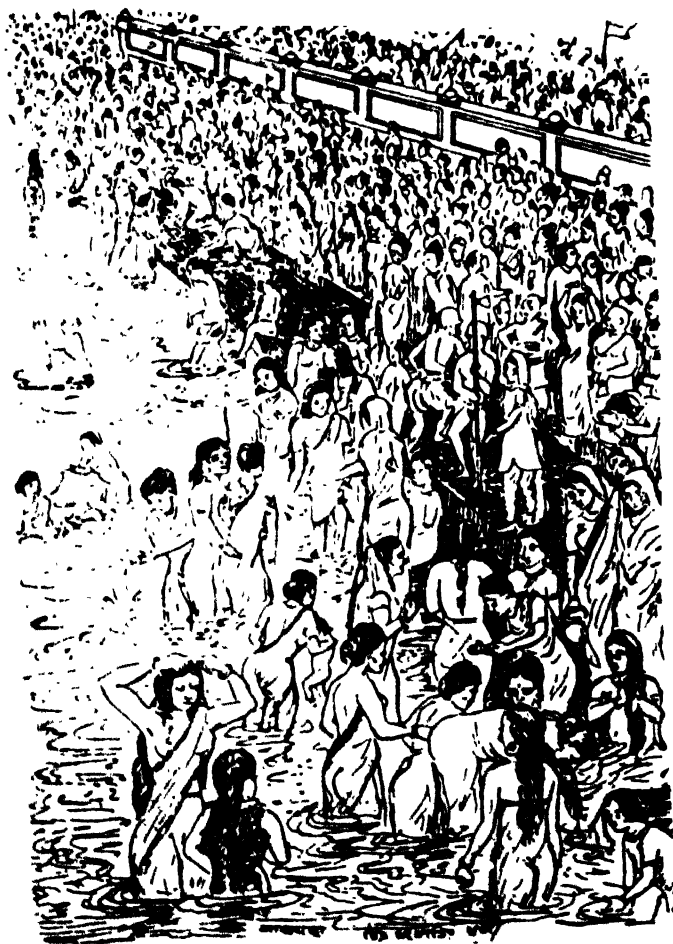
দেবদাসী প্রথার উৎস, ইতিহাস ও পরিণতি

সাধারণের বদ্ধমূল ধারণা 'কুম্ভমেলা' হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে, যদিও তার প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায় সপ্তমী শতাব্দীতে—হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্তে।

কুম্ভমেলা যে হাজার বছরের চেয়ে প্রাচীন, তার কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ নেই ; আর হিউয়েন সাঙ তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে 'কুম্ভমেলা'র উল্লেখ আদৌ করেননি। চৈনিক পরিব্রাজকের উল্লিখিত প্রয়াগতীর্থের সেই মহোৎসবের নাম মহাপাতিমোক্ষযোগ—সেটি পঞ্চবার্ষিক মহাদানের উৎসব, যাকে বৃহস্পতি গ্রহের সূর্য প্রদক্ষিণ-ছন্দের সঙ্গে কোনভাবেই যুক্ত করা যায় না।

ধান ভানতে শিবের গীত দিয়ে শুরু করতে হল একটি বিশেষ কারণে—আমি যখন বলব "দেবদাসী-প্রথা হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে যদিও তার প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায় দ্বিতীয় খ্রীষ্টপূর্বাব্দে" তখন আপনারা যেন না মনে করেন—এসব ঐ জাতের গল্পকথা।

মধ্যপ্রদেশে সরগুজা রাজ্যে অনুচ্চ রামগড় পাহাড়। পাশাপাশি ছটি অকৃত্রিম পার্বত্যগুহা—যোগীমায়া আর সীতাবেঙা। কে বা কারা ঐ অকৃত্রিম পার্বত্যগুহাকে ছেনি হাতুড়ির শাসনে রূপান্তরিত করেছিল গুহামন্দিরে। তার ভগ্নস্তূপ দেখলে ভাজা-কানহেরী-অজন্তা-এলোরার কথা মনে পড়ে যায়। এ দুটি কিন্তু বৌদ্ধ চৈত্য নয়, হিন্দুমন্দির। কিন্তু রূপদক্ষের দল মনে হয় বৌদ্ধ শিল্পসৌকর্যে অভ্যস্ত। বাস রিলিফগুলি ভারহুত সাঁচীর ঢঙে। উপরের খিলানে মৌর্যযুগের প্রচলিত লিপিতে কী যেন লেখা। ভারততত্ত্বের স্বনামধন্য পণ্ডিত এ. এল. ব্যাশম শ্লোকটির যে ইংরাজী তর্জমা করেছেন তার বঙ্গানুবাদ :

"কবি, নগর-নাগর নৃপতি
জ্বালিয়ে তোলে অন্তর,
নিরন্তর রিরংসা-জর্জরিতা
কৌতুক-কর্দম-ক্লিশিত
ঐ যে মেয়েটিকে নাগরদোলায় দোলায়,
ও কেমন করে নিঃশেষে বিলিয়ে দেয় নিজেকে এমন গভীর—সুগভীর প্রেমে ?"

এবং তার পরেই সহজ সরল গদ্যভাবে একটি অকুণ্ঠ স্বীকৃতি ; "সুতনুকা নাম দেবদাসিক্যী তং কাময়িথ বালানশেয়ে দেবদিন্নে নাম লুপদকখে।"

যার অর্থ—"সুতনুকা নামের জনৈকা দেবদাসী তরুণ শিল্পীচূড়ামণি দেবদিন্নকে ভালবেসেছিল।" "দেবদাসী" শব্দটির এটিই প্রথম ঐতিহাসিক দলিল।

কবি বলেছেন, মেয়েটি নাগরদোলায় দোলে। উভয় অর্থেই। চক্রাবর্তনের পথে কখনো উঠে যায় উদভ্রান্ত প্রেমের শীর্ষবিন্দুতে—আদরে সোহাগে প্রশংসায় সে তখন প্রাপ্তির সপ্তম স্বর্গে; তখন সে নগর-নাগর নৃপতিদের লালসাজর্জর কামনার ধন। কবি তখন তার রূপবর্ণনায় অভিধান হাতড়াতে ব্যস্ত। বাৎস্যায়নের হিসাবে তখন সে নৃপতি-শ্রেষ্ঠী-মহাপণ্ডিতদের সমপংক্তিতে উপবিষ্টা হবার মর্যাদাসম্পন্না।

কিন্তু তারপর? নাগরদোলার সেই শীর্ষবিন্দুতে ক্ষণিকবাদিনী স্থাবর নয়। পরমুহূর্তেই শুরু হয় অধঃপতন। নামতে-নামতে সে এসে উপনীত হয় সমাজের নিম্নতম 'নাদির'-এ। তখন সে শুধু কৌতুকের শিকার, কর্দমপঙ্কে ক্লেদাক্ততনু। জেরুসালেমের অধিবাসীদের মধ্যে তখন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়—কে ঐ ভ্রষ্টা রমণীকে লোষ্ট্রাঘাতে প্রথম ভূতলশায়িনী করবে।

এমন একটি বিচিত্র মেয়ে কেমন করে পড়ে অমন প্রেমে? অমন সুগভীর প্রেমে? জানি না। ইতিহাস নীরব।

বুদ্ধদেবের সমকালে অথবা প্রাক-বুদ্ধযুগের জাতককাহিনীতে জনপদকল্যাণীদের উল্লেখ আছে। তারা 'দেবদাসী' নয়; 'রাজনটী'। 'শ্যামা' অথবা 'বাসবদত্তা' আমাদের পরিচিতা। মহাভিক্ষুণী জীবকমাতা আম্রপালী প্রাক্-সন্ন্যাস জীবনে ছিলেন 'জনপদকল্যাণী', অর্থাৎ রূপোপজীবিনী।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে মৌর্যযুগে দেহ-ব্যবসায়ী রমণীদের প্রধান তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম ভাগ—দেবদাসী শব্দটা ব্যবহার না করে বলা হয়েছে—দেবতাদের সেবা করবে। পুরোহিততন্ত্রের অধীনে।

দ্বিতীয় ভাগ—'অবরুদ্ধা'। তারা আবার দু-জাতের। এক দল বিশেষ বিশেষ পরিবারভুক্ত রক্ষিতা। রাজা-শ্রেষ্ঠী ধনকুবেরেরা তাদের ভরণ-পোষণ করবেন। তারা মনিবের প্রাসাদেও থাকতে পারে, অথবা বাগানবাড়িতে। কিন্তু 'পরিবারগত সতীত্ব' তাদের মেনে চলতে হত। দ্বিতীয় দলের 'অবরুদ্ধা' হচ্ছে সর্বজনভোগ্য গণিকা বা বারাঙ্গনা। তার পুরোপুরি 'সরকারী চাকুরে'। তফাৎ এই যে তারা 'রিজাইন' দিতে পারত না, আর তাদের কন্যাসন্তান আবশ্যিকভাবে মায়ের চাকরিটি পেত। রূপ ও গুণের বিচারে তাদের তিনটি শ্রেণী। নিম্নতমদের বার্ষিক উপার্জন—প্রচলিত শব্দটা ছিল 'ভোগ'—হাজার কার্ষাপণ।

তৃতীয় ভাগ—'ভূযিশ্যা'। তারা সহজিয়া। তাদের আবাস নগর প্রাচীরের বাহিরে। তা বলে আইনের আওতার বাহিরে নয়। তারা তাদের মাসিক উপার্জনের ভিতর থেকে দুইদিনের রোজগার সরকারকে দিতে বাধ্য থাকত। পরিবর্তে রাষ্ট্র ব্যবস্থা করত তাদের নিরাপত্তার।

দেবদাসী ভিন্ন অন্যান্য শ্রেণীর দেহব্যবসায়িনীদের জন্য ছিলেন একজন অফিসার: গণিকাধ্যক্ষ। দৈনিক তাঁর কর্মচারী অর্থসংগ্রহ করত—ঠিক যেমন স্টেট বাসের কন্ডাক্টর তার দৈনিক উপার্জন দিনান্তে বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু নাগর যদি অর্থের অতিরিক্ত কোনও প্রণয়োপহার

দেয়—স্বর্ণালঙ্কার হলেও—তা গণিকার প্রাপ্য।

এইসব নিয়মকানুন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করলেও কৌটিল্য 'দেবদাসী' শ্রেণীর আইনকানুন লিপিবদ্ধ করেননি। বলেছেন, সে দায়িত্ব পুরোহিততন্ত্রের।

অর্থাৎ মৌর্যযুগ থেকেই দেবদাসীদের উপর ঐ পুরোহিতকুলের অধিকার ইতিহাস স্বীকৃত। কৌটিল্যের কাল এবং গুপ্তযুগের মাঝখানে দু-দুটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। প্রথমটি বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র', দ্বিতীয়টি ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'। দুটিতেই বারবনিতাদের রীতি-নীতির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দুটিতেই, বলা যায় 'দেবদাসী'—'কনস্পিক্যুয়াস', সম্পূর্ণ অনুল্লেখিত থাকায়।

আমাদের একই সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। দেবদাসী'দের ভালমন্দ নিয়ে কোনও আলোচনা পুরোহিততন্ত্র বরদাস্ত করত না। তারা নিজেরা যেসব আইনকানুন, বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল, তা অতি সযত্নে গোপন রাখা হত।

ভারতীয় ইতিহাসের সুবর্ণযুগে—গুপ্তযুগে—পদার্পণের আগে আরও একটি গ্রন্থের নামোল্লখ করতে হয়—কলকাতার রঙ্গমঞ্চে তা সাম্প্রতিককালে অভিনীত হওয়ায় অনেকেই কাহিনীটা জানেন ; শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক'। বসন্তসেনার সঙ্গে চারুদত্তের বিবাহে প্রমাণ হয় যে, সে আমলে গণিকাদের এতটা হীনদৃষ্টিতে দেখত না সমাজ।

অর্থাৎ পুরোহিততন্ত্রের নাগপাশ ছিন্ন করে যদি মধ্যযুগের কোন সুতনুকা দেবদিন্নের হাত ধরে মন্দিরের বাহিরে বেরিয়ে আসতে পারত, তাহলে তাদের সংসার করায় সম্ভবত কোন সামাজিক বাধা হত না। দুর্ভাগ্যবশত তেমন কোন ঘটনার নজির নেই।

পুরোহিততন্ত্র নিজেদের স্বার্থেই দেবদাসীদের লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে চাইত। যা কিছু আড়ালে-আবডালে তাতেই মানুষের মোহ, কৌতূহল। সাধারণ মানুষকে শুধু বলা হত ঈশ্বরের করুণালাভের উপায় হচ্ছে মন্দিরে কিছু দেবদাসী উৎসর্গ করা। ভবিষ্যপুরাণ বলছেন : "বেশ্যাকদম্বকং যস্তু দদ্যাৎ সূর্যায় ভক্তিতঃ। সগচ্ছেৎ পরমং স্থানং যত্র তিষ্ঠতি ভানুমান ॥"[11]—সূর্যালোকপ্রাপ্তির সবচেয়ে ভাল উপায় হল কোনও সূর্যমন্দিরে ভক্তিভরে কিছু বেশ্যা দান করা। 'বেশ্যা' শব্দটা সেকালে ঘৃণার্হ ছিল না। দেবদাসীদেরও বেশ্যা বলা হত। কালিদাসের মেঘদূতকাব্যে বর্ণিত উজ্জয়িনীর মহাকালমন্দিরে চামরহস্তা যে দেবদাসীদের দেখেছি কবিবর তাদের 'বেশ্যা' নামেই অভিহিত করেছেন।

সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল আত্মজাকে দেবদাসী পদে অভিষিক্ত করলে শুধু দাতার নয়, কন্যারও স্বর্গলাভের ব্যবস্থা পাকা হয়। কবি জয়দেবের ঘরণী পদ্মাবতী এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিংবদন্তী বলে, বালিকা বয়স থেকেই পদ্মাবতী রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী। তাঁর পিতামাতার মনে হল এমন সর্বগুণান্বিতার স্থান পুরীর জগন্নাথের মন্দির। তাঁরা পঞ্চদশী পদ্মাবতীকে নিয়ে এসেছিলেন পুরীধামে—দেবদাসী হিসাবে উৎসর্গ করতে। বড় পাণ্ডা মেয়েটিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। তার উৎকলীয় ভাষায় আশ্বাস দিল, কাল দিন ভাল আছে, আমি নিজেই ওকে অভিষেক করে দেব। ক্রমে পদ্মাবতী 'গোপিকা' হয়ে যাবে। কিশোরী মেয়েটি তার অর্থ বোঝেনি—'অভিষেক' করার অর্থ কী?

'গোপিকা' কাকে বলে ? সে রাত্রেই পদ্মাবতীর মাতা ও পিতা নাকি পৃথকভাবে স্বপ্নাদেশ

পান—স্বয়ং জগন্নাথ ওঁদের আদেশ করছেন—"তোরা এ কী করছিস? পুরীধামে এসেছিস কেন? রাঢ়খণ্ডে বীরভূম অঞ্চলে আছে কেন্দুবিল্ব গ্রাম। সেখানে আছে আমার এক উদাসীন ভক্ত কবি—জয়দেব। পদ্মাবতীকে তার হস্তে সমর্পণ করে আয়, তাহলেই আমি তাকে পাব।"

ওঁরা পরদিন নাকি গোপনে মন্দিরের অতিথিশালা থেকে পদ্মাবতীকে নিয়ে পালিয়ে যান। পদ্মাবতী কালক্রমে হলেন জয়দেবপত্নী। কিংবদন্তী মানুন না মানুন পদ্মাবতী নিঃসন্দেহে 'দেবদাসী।'

'দাসী?' তাহলে জয়দেবের পাণ্ডুলিপিতে কেমন করে লেখা হল সেই মারাত্মক পংক্তিটি? 'দেহিপদপল্লবমুদারং'? তা জানি না, কিন্তু কিংবদন্তী থেকে এটুকু পরিষ্কার হল যে, সমকালীন ভারতের মানুষ শুধু অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্নই ছিল না—শুভবুদ্ধিও দেখা দিত সময় সময়—হোক কি স্বপ্নাদেশে।

পুরোহিততন্ত্র ব্যবস্থাপনাটা গোপন রাখার চেষ্টা করা সত্ত্বেও আধুনিক গবেষকদের প্রচেষ্টায় আমরা জানতে পেরেছি—দেবদাসীদের মধ্যে নানান শ্রেণী বিভাগ ছিল। তাদের মোটামুটি ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। এদের জীবনযাত্রা, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি পৃথক। মন্দির-পরিভাষায় তাদের পরিচয়:

বিক্রীতা: অর্থের বিনিময়ে এদের ক্রয় করা হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা অত্যন্ত গরিব সম্প্রদায়ের সুন্দরী বালিকা। একাধিক কন্যার মধ্যবিত্ত পিতাও দু-একটিকে তুলে দিত পুরোহিতের হাতে, অর্থের বিনিময়ে। দেবদাসীর গর্ভজাতা কন্যাও এই দলভুক্তা। যৌবনপ্রাপ্তা হলে মন্দির পুরোহিত স্বয়ং অথবা তার অনুগ্রহভাজন কেউ নবাগতার কৌমার্য হরণ করে তাকে দেবদাসীপদে অভিষিক্ত করত।

ভৃত্যা: এরা মূলত ভৃত্যশ্রেণীর। শ্রেণীগতভাবে সকল দেবদাসীর নিচে। নৃত্যগীতের আসরে উপস্থিত থাকলেও এরা সচরাচর অংশগ্রহণ করত না। অবশ্য যৌবন থাকলে দেহদানে মন্দিরের অতিথিবর্গকে সেবা করাও ছিল তাদের কর্তব্যভুক্ত।

ভক্তা: স্বেচ্ছায় কোন রমণী—কুমারী, সধবা অথবা স্বামীত্যক্তা, মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে যখন 'দেবদাসী' হতে চায় তখন সে 'ভক্তা'। এক্ষেত্রে মূল প্রেরণা: ভক্তি। এঁরা অতি উচ্চ সম্মানের অধিকারিণী। মন্দির-পুরোহিতেরা কখনই এঁদের অঙ্গস্পর্শ করত না। চিতোর-মহিষী মীরাবাঈ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

দত্তা: অর্থলোভ নয়, কোনও ধর্মান্ধ পুণ্যলোভী মনস্কামনা চরিতার্থ করতে, 'মানত' রাখতে, স্বেচ্ছায় কন্যাকে মন্দিরে দান করলে সে হয় 'দত্তা'। গঙ্গাসাগরে কন্যা বিসর্জনের সঙ্গে এই প্রথাটির তুলনা চলে।

হৃতা: এদের সম্বন্ধে মন্দির-সাহিত্য স্বতই স্বল্পভাষ—হেতুটা সহজবোধ্য! মেয়েটিকে চুরি করে আনা হত। নিরুদ্দিষ্টার সন্ধান পেত না সে অঞ্চলের নগর-কোটাল। বহু দূর দেশে মন্দিরের অন্ধকূপে সে থাকত বন্দিনী।

অলঙ্কারা: নামেই তাদের পরিচয়। এক মন্দিরে একজন। মন্দিরের মুকুটমণি! যে-কোনও শ্রেণীর দেবদাসীই ঐ শীর্ষপদে উন্নীতা হতে পারে—রূপ-গুণ-নৃত্যগীতে পারদর্শিতার বিচারে। ঐহিক বিচারে শীর্ষস্থানীয়া হলেও—শ্রদ্ধা-সম্মানের বিচারে এরা ভক্তা-শ্রেণীর নিচে।

উত্তর ভারতের চেয়ে দাক্ষিণাত্যেই দেবদাসী-প্রথার বিস্তার ঘটেছিল—বিশেষ করে বর্তমান তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্র, ওড়িশা এবং মহারাষ্ট্রে। তবে উত্তরখণ্ডেও দেবদাসী-প্রথা প্রচলিত ছিল। কাশ্মীররাজ্যের মন্ত্রী দামোদর গুপ্ত অষ্টম শতাব্দীতে রচনা করেছিলেন 'কুট্টিনীমতম্ কাব্যম্'। তাঁর কাব্যপাঠে জানতে পারি, দেবদাসীদের বাঁধা মাহিনা ছিল এবং জীবিকাটি ছিল বংশানুক্রমিক। দামোদর ভট্ট পাঠে মনে হয় কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরেও সে আমলে দেবদাসী ছিল। ওড়িশার মুক্তেশ্বর মন্দিরে দশম শতকে দেখছি রাজকোষ থেকে চুয়াল্লিশজন দেবদাসী বেতন পেতেন।

বঙ্গদেশেও যে তারা ছিল না তা নয়। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্যে তাদের উল্লেখ আছে। সপ্তদশ শতকে য়ুরোপীয় পর্যটক ট্যাভার্নিয়ারের বর্ণনায় দেখছি, গোলকুণ্ডার মন্দিরে অসংখ্য দেবদাসীর বাস।

বর্তমান শতাব্দীতে, ইংরাজ শাসনকালে দেখছি 1912 খ্রীস্টাব্দে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে পর পর তিনটি 'বিল' উত্থাপন করা হল দেবদাসী-প্রথার উচ্ছেদকল্পে। এ বিষয়ে যিনি প্রথম মেমোরাণ্ডাম পাঠিয়ে ইংরাজ সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করেন তাঁর নাম—হরি সিং গৌর। সরকার বললেন, প্রথাটি রদ করতে হলে 'জনগণ' কী চায় তা জানা দরকার। 'জনগণ' বলতে সে আমলে বোঝাতো—রাজা-মহারাজা-নবাব এবং তাঁদের কল্যাণে যাঁরা করে খাচ্ছেন। ফলে প্রস্তাবটি ধামাচাপা পড়ল।

দশ বছর পরে হরি সিং গৌর বোম্বাই বিধানসভায় পুনরায় একটি প্রস্তাব আনেন। আরও পাঁচ বছর পরে রামদাস পানতুলুও উপস্থিত হলেন একই ভাবের প্রস্তাব নিয়ে। দুটি প্রস্তাবই গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু আইন পাশ হয়নি। দেবদাসী-প্রথা উচ্ছেদের ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন মাদ্রাজের ডঃ মিসেস মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি। মাদ্রাজ বিধানসভায় তিনি 'বিলটি' আনেন উনিশশো সাতাশে। তাঁর প্রচেষ্টাতেই আন্দোলনটি সর্বভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করে। আনি বেসান্ত, পণ্ডিত মদনমোহন এমনকি স্বয়ং মহাত্মাজী পর্যন্ত এই আন্দোলনের পক্ষে প্রবন্ধ রচনা করেন এবং প্রচার চালান। শুনতে অদ্ভুত লাগবে—দেবদাসী-প্রথা রদ করার পিছনে মিস মেয়োর পরোক্ষ 'অবদান' আছে। কারণ মিস মেয়োর ব্যঙ্গবিদ্রূপের অন্যতম লক্ষ্য ছিল : দেবদাসী-প্রথা।

ডঃ মিসেস রেড্ডি—বলতে গেলে প্রায় একাই—তিন দশক ধরে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে সংগ্রাম করে গেছেন।

অবশেষে ভারত স্বাধীন হল। তার দু বছরের ভিতরেই জনমতের চাপে প্রাদেশিক সরকারেরা দেবদাসী-প্রথা আইন করে রদ করতে বাধ্য হলেন। প্রথমে মহীশূর রাজ্যে, পরে মাদ্রাজ আর বোম্বাইয়ে। ডক্টর মিসেস মুথুলক্ষ্মী রেড্ডিকে সাড়ম্বরে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করা হল। সহস্রাব্দীর কুপ্রথার হল অবসান! কী আনন্দ!

নটেগাছটি যখন মুড়িয়ে গেল তখন গল্পটাও আইন-মোতাবেক শেষ হবার কথা। হল না। এ মর্মন্তুদ কাহিনীর শেষ কথা নয় : 'আমার কথাটি ফুরালো'। এ কিস্‌সার আখেরি হুঙ্কার : 'খাবার জিনিস খাবুনি?

গুড়গুড়িতে যাবুনি?'

নিমদাঁত যার বর্তমান, আইন দিয়ে কি তাকে রোখা যায়?

নবভারতের রূপকারেরা আইন পাস করেই তৃপ্ত, ভেবে দেখলেন না, ঐ আইনের প্রয়োগ হলে হতভাগিনী দেবদাসীদের কী হতে পারে। আইনের নির্দেশে মন্দির-কর্তৃপক্ষ একদিন তাদের হাত ধরে বার করে দিল মন্দির-চত্বর থেকে। ওরা 'এমপ্লয়ী' ছিল না যে, তিন মাসের বেতন দিতে হবে। ওদের ইউনিয়ন নেই যে, আন্দোলন গড়ে তুলবে। সমাজে তারা ফিরে আসতে পারে না। সংসার মুখ ফিরিয়ে রইল। তাহলে কি অনাহারে মারা গেল ওরা? ষাট-বালাই—বড়-বড় শহরের লালবাত্তিজ্বলা চাকলাগুলো তাহলে আছে কেন? রূপ যাদের আছে তারা হল 'কল-গার্ল', রূপে যাদের খামতি, তারা পাকাপাকি নাম লেখালো বাড়িউলি-মাসীর খাতায়। যারা ছিল 'অলঙ্কারা'—শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, তারা গেল সাগরপারে, আরব শেখদের হারেমে। আর দু হাজার বছর আগে কৌটিল্য যাদের বলেছিলেন 'ভূয়িশ্যা' তাঁরা আশ্রয় নিল পথপ্রান্তের ঝোপড়িতে। শ্রেণী বিন্যাস অব্যাহতই রইল। 'প্রথা' না থাক 'দেবদাসীরা রইল—ভিন্ন নামে, ভিন্ন পরিচয়ে।

'উইমেনস লিব'-এর ধ্বজাধারিণীরা আমাকে মার্জনা করবেন—'দেবদাসী-প্রথা' রদ হওয়ায় আমি খুশি হতে পারিনি। অনায়াসে ওদের পুনর্বাসন করা চলত—দেবদাসীরূপেই। 'দাসপ্রথার' মত 'দেবদাসী-প্রথা' আদ্যন্ত কালিমালিপ্ত ছিল না কিন্তু। যৌবন গেলে দেবদাসীরা হত 'জোগতী'। মন্দিরের পরিচারিকা।

আমৃত্যু পেনশন পেত মন্দির তহবিল থেকে—পরিবর্তে তারা মন্দির মার্জনা করত, মন্দির বাগিচায় ফুল ফোটাতো, মালা গাঁথতো, নব্যযুগের দেবদাসীদের অঙ্গমার্জনা করত। পথের ভিখারী হয়ে যেত না। ব্যবস্থাপনাটা কেন জিইয়ে রাখা গেল না বর্তমান দেবদাসীদের জমানায়? নতুন রিক্রুট বন্ধ করে ওদের কি সরকারি ব্যবস্থাপনায় মন্দিরেই শেষ নিশ্বাসতক আশ্রয় দেওয়া চলত না? অন্তত সরকার কর্তৃক অধিকৃত মন্দিরে? বিড়লা মন্দিরে? ট্রাস্ট-মন্দিরে? দেবদাসী-প্রথা রদ করেই আমরা আত্মসন্তুষ্ট; কিন্তু বেশ্যাপল্লী উৎখাতের হিম্মৎ কি আছে আমাদের? কোন যুগেই তা আমরা পারিনি। প্রাচীন ভারত তবু ওদের তির্যক মর্যাদা দিয়েছে। দুর্গা-প্রতিমা গড়ার আগে কুম্ভকারকে সংগ্রহ করতে হত ঐ বেশ্যাপল্লীর মৃত্তিকা—ঐ যারা সমাজের গরল আকণ্ঠ পান করে 'সমাজসেবা' করতে নীলকণ্ঠী হয়েছে।

আর আজ?

রাতের অন্ধকারে ইদানীং আমরা কী করি তার কথা না হয় উহ্যই থাক, কিন্তু দিনের আলোয়? প্রকাশ্য দিবালোকে? হ্যাঁ, সেখানেও তাদের ভূমিকা আছে। তাদের তলপ পড়ে! কোন রাজনৈতিক নেতার কুকীর্তি যখন সাংবাদিকের দল প্রকাশ করে দেন তখন বিধানসভায় ঐ দেহব্যবসায়িনীদের স্মরণ করেন নেতা—'উপমান' হিসাবে ব্যবহার করতে! কোন বিধায়ক যখন দেখেন প্রতিপক্ষ মহিলা, তখন স্মরণ করেন ঐ সমাজসেবীদের। নির্বাচিত সমাজপতিদের কণ্ঠে শোনা যায় আখেরি হুঙ্কার : 'বেশ্যা! বেশ্যা!' দেবদাসীরা ভারত-সংস্কৃতিতে দিয়েছে অনেক কিছু—কথাকলি, ভরতনাট্যম, মোহিনী-আট্টম, কুচিপুড়ি। যুগে যুগে ওরা দেবদিন্নদের উদ্বুদ্ধ করেছে মন্দিরগাত্র অলঙ্করণে—কোণারক, খাজুরাহো,

বেলুড়, হালেবিড থেকে বাঁকুড়ার মন্দিরে রয়ে গেল তার শাশ্বত প্রমাণ ! দেবদাসীরা চলে গেল ইতিহাস রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে, কিন্তু তাদের দান অবিনশ্বর ! তাদের আর্তি আজও ভেসে বেড়ায় ভারতের আকাশে-বাতাসে—'দেবদাসী' মীরাবাঈয়ের ভজনে : ম্যয়নে চাকর রাখো জী।

সীতাবেঙার শিলালেখে দুহাজার বছর ধরে যে নিরুত্তর প্রশ্নটা মহাকালের দরবারে প্রতীক্ষা করে আছে সেটাও টিকে রইল স্মৃতি হয়ে : "ও কেমন করে নিঃশেষে বিলিয়ে দেয় নিজেকে এমন গভীর—সুগভীর প্রেমে ?"

নিকট দূরের শ্রদ্ধার্ঘ্য :

প্রথমে স্থির করেছিলাম সম্পাদক মশাইকে জবাবে সাফ জানিয়ে দেব : আমার পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না। সত্যি কথাই। এ আমার তরফে 'শৌখিন মজদুরী'। আশাপূর্ণাদির শ্রদ্ধার্ঘ্য-সংখ্যায় কিছু লেখা আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা।

দিদি তাঁর অতি দীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ কালই কাটিয়েছেন, এই শহরে, আমিও না-হোক তিন-চার দশক—কিন্তু নিতান্ত ঘটনাচক্রে তাঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে আসার, তাঁর স্বহস্তের আশীর্বাদ লাভের সুযোগ আমার হয়নি কোনদিন।

মূল অপরাধ আমার—শতকরা শতভাগ। আমার গেঁতো স্বভাবের দোষে। নিজের লেখা আর তার প্রয়োজনে পড়ার সূত্রেই দিন কেটে যায়। ডানে-বাঁয়ে তাকাবার ফুরসৎ পাই না।

দোষ কি একা আমার ? বিধাতার নয় ? এ যাবৎ-বিশ-পঁচিশ হাজার দিন তো তিনি আমাকে করুণা করে দিয়েছেন, কিন্তু উদারতা দেখিয়ে কোন একটি দিনে একটি ঘণ্টা কি 'ফাউ' দিয়েছেন ? সেই বাঁধা বরাদ্দ চব্বিশ ঘণ্টা ! তাই যারা দেখা করতে আসে—আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, তাঁদের বাড়ি সৌজন্য সাক্ষাতে রিটার্ন ভিজিটে যাওয়ার সময় পাই না। গিন্নি তাল সামলান, একাই দেখা করে আসেন, যাতে তাঁর কর্তাটিকে কেউ অসামাজিক, 'বুনো' না বলে। কোন সাহিত্যিক আড্ডায় যাতায়াত নেই, সমকালীন কোনও সাহিত্যিকের সঙ্গে তেমন দিলতোড় ঘনিষ্ঠতা হয়নি। সাগরময়বাবুর সঙ্গে একই পাড়ায়, প্রায় পাশাপাশি বাড়িতে দু-তিন বছর ভাড়া ছিলাম। পথেঘাটে দেখা হলে দু-তরফাই স্মিতহাস্য তথা সৌজন্য বিনিময় হয়েছে ; কিন্তু আর পাঁচজন সমবয়সীর মতো তাঁকে 'সাগরদা' করে তাঁর কাছের মানুষ হয়ে যেতে পারিনি।

আশাপূর্ণাদি তাঁর বাড়িতে আমাকে যেতে লিখেছিলেন। প্রায় অপরিচিত এই ছোট ভাইটির একবার ফর্মাল নিমন্ত্রণও হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ছে উনি জ্ঞানপীঠ পাওয়ার পরে। 'রবিবাসর' -আসরে কি ? ঠিক মনে নেই। তবে পরে অনেকের কাছেই শুনেছিলাম চর্বচূষ্যলেহ্যপেয়র সে-নাকি এক নিদারুণ আয়োজন। দিদি বোধহয় স্বহস্তে পরমান্নটা বানিয়ে ছিলেন। নিতান্ত দুর্ভাগ্য এ বামুনের। শরীর অসুস্থ থাকায় প্রসাদ পাইনি।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পুঁজি নিতান্ত সামান্য। খুলেই বলি :

এক : তাঁকে চিঠি লিখেছি জীবনে একবার। সত্তরের দশকে।

দুই : তাঁর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি জীবনে একবার। 28.9.77 তারিখে লেখা।

তিন : তাঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে এসেছি জীবনে একবার। 10.8.75 তারিখে।

তবে হ্যাঁ, তাঁর গুণগ্রাহী পাঠক হিসাবে তো দু-চার ছত্তর লিখতে পারি !

পারি কি ? কোন অধিকারে ? এত এত সাহিত্যাচার্য, সাহিত্য-অধ্যাপক ও সমালোচক থাকতে আমি নাক গলাই কোন সুবাদে ? তাছাড়া আরও একটা কথা : আমি তো পাঠক হিসাবে নৈর্ব্যক্তিক নিরপেক্ষতায় ওঁর সাহিত্য-কর্মের মূল্যায়ন করতে পারব না। যেমন আপনি পারেন, আপনারা পারেন। আমি যে আপনাদের মতো ওঁকে শ্রদ্ধা করে, ভালবেসে, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে থামতে পারিনি—কী লজ্জা ! আমি যে মনে মনে ওঁকে ঈর্ষাও করি !

দুটি কারণে। এক নম্বর—ভগবান ওঁকে রঞ্জনরশ্মিওয়ালা একজোড়া চোখ দিয়েছেন। যার কণামাত্র দেননি আমাকে। দিদির সমুখে একটা মানুষ এসে খাড়া হলেই তিনি তাঁর পাঁজরার ভিতর হৃৎপিণ্ডটা স্পষ্ট দেখতে পান—লোকটা ভাল না মন্দ, অথবা ভাল-মন্দ মেশানো। তার অন্তরে অমৃত না বিষ ; তার হৃদয়টা বিষকুম্ভ-পয়োমুখ, নাকি পয়োকুম্ভ-বিষমুখ। না, সব জাতের মানুষ নয়। প্রফুল্ল রায়ের মতো অরুণাচলের অরণ্যে গিয়ে তিনি কোন অরণ্যচারীর হৃদয় 'মী-দিয়ে ফুঁড়ে ফেলতে' পারেন না ; শঙ্করের মতো 'চৌরঙ্গী'র ক্যাবারে-ডান্স হল-এ নর্তকীর হৃদয়ের গোপন কামনা-বাসনার সন্ধান তিনি পান না, অথবা সমরেশের মতো মাছমারাদের পিছু-পিছু ভেড়ি-আড়তে ভেড়েন না। বিদেশে খেলতে যেতেও তাঁর আপত্তি ! আপনার-আমার মতো মধ্যবিত্ত-পরিবারের পরিচিত ইডেন-গার্ডেন হয়, তা হলেই দেখবেন তাঁর কলমের ফুলঝুরি। পেনসন-নির্ভর বুড়োকর্তা, বেতো গিন্নি-মা, রোজগেরে বড়দা, সদ্যসীমন্তিনী বৌমণি, বেকার ছোড়দা, কলেজীছাত্রী দিদিমণি—ব্যস ! আর দেখতে হবে না। কলমের ব্যাট হাতে দিদি মাঠে নামলেই সেঞ্চুরি ! গাভাসকার টেস্টে দশ হাজার কত শ কত রান করছে যেন ? মধ্যবিত্ত সমাজের ইডেন-গার্ডেন্স-এ আশাদিও অতগুলি চরিত্রই এঁকেছেন। প্রতিটি চরিত্র-স্ট্রোক ভিন্ন প্রকৃতির, ভিন্ন মেজাজের। হুক-পুল-গ্লান্স, কাভার-ড্রাইভ, লেট কাট, ওভারদ্যবৌলার। চার-ছয়—চার-ছয়—বইখানা শেষ হলে দেখা যায় অনবদ্য একটি সেঞ্চুরি।

মানুষজনকে তো আমরাও দেখি, কিন্তু কে যে 'ভিজে বেড়াল' আর কে 'ছাই-চাপা আগুন' বুঝতে বুঝতেই সুযোগ হারিয়ে যায়। যে বয়সে ছানি পড়ার কথা তখনো অমন একজোড়া রঞ্জনরশ্মিওয়ালা চোখ দেওয়াটা ভগবানের একচোখোমি নয় ?

ঈর্ষার দ্বিতীয় হেতু : ফাউন্টেন পেনের কালিটা ! কেন যে ওঁর গল্প এমন মিষ্টি লাগে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনি। কোথায় তার উৎস ? কী রচনা কৌশলের গোপন শৈলী ? সে রহস্য ভেদ হল ওঁর ঐ 28.9.77 তারিখের চিঠিখানি পেয়ে। যে চিঠিতে শুধু প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়েই দিদি ক্ষান্ত হননি—অপরিচিত ছোট ভাইটিকে একটা নমস্কার জানিয়ে বিড়ম্বিতও করেছিলেন। কিন্তু ঐ চিঠির সূত্র ধরেই রহস্য-যবনিকাটা উঠে গেল। যে ড্রয়ারে চিঠিখানি রেখেছিলুম তাতে থুকথুকে পিঁপড়ে !

বোঝা গেল : দিদি ব্লু-ব্ল্যাক কালির সঙ্গে মধু মিশিয়ে কলমে ভরেন !

সে চেষ্টা করে দেখেছি ! পণ্ডশ্রম ! রচনার মিষ্টত্ব বাড়েনি—বেড়েছে বিছানায় পিঁপড়ের অত্যাচার। আমার আবার বদভ্যাস, বিছানায় শুয়ে শুয়ে লেখা ! সুতরাং না পাঠক, না সাহিত্যসেবক ছোটভাই, কোনভাবেই তাঁর সমালোচনা করার অধিকারী নই। ইতিপূর্বে যে তিনটি ব্যক্তিগত যোগাযোগের সূত্রের উল্লেখ করেছি সেটাই বিস্তারিত দাখিল করা যাক বরং :

এক : 'পঞ্চাশোর্ধ্ব' নামে একটি রম্যরচনা লিখে জনাদশেক পঞ্চাশোর্ধ্ব বৃদ্ধের স্কেচ এঁকেছিলুম একবার। নিজে পঞ্চাশ পাড়ি দিয়ে। পরে খেয়াল হল, সেটা ছিল 'আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ'। আমার আঁকা দশজনই বৃদ্ধ। বৃদ্ধা নেই। কী কেলেঙ্কারী। নিদারুণ লজ্জা পেলুম। প্রায়শ্চিত্ত করতে তারপরেই লিখে ফেলি এক মহীয়সী মহিলার জীবনী অবলম্বনে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস : রানী শঙ্করী। বাঁশবেড়িয়ার রানী। অষ্টাদশ শতাব্দীর। তাঁর নামে কলকাতায় একটি গলি রাস্তাও আছে। বইয়ের নাম দিলুম—'হংসেশ্বরী', রানী শঙ্করীর প্রতিষ্ঠা করা মন্দির।

উপন্যাস লেখা তো শেষ হল, উৎসর্গ করি কাকে ? রানী শঙ্করী অষ্টাদশ শতাব্দীতে নারী-মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন। সামাজিক কূপমণ্ডূকতাকে অস্বীকার করে উঠে এসেছিলেন সহমরণের চিতা থেকে। সমাজত্যক্তা চিতাভ্রষ্টা নির্মাণ করিয়েছিলেন বাঁশবেড়িয়ায় ঐ হংসেশ্বরী মন্দির। মনে হল বইটা দিদিকে উৎসর্গ করলেই আমার অন্তরাত্মা তৃপ্ত হবে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় নেই। নাই বা থাকল ? দিদির তো এমন কত লক্ষ লক্ষ ছোট ভাই আছে সারা দেশে ছড়ানো। বিনা অনুমতিতেই বইখানা উৎসর্গ করলুম তাঁর নামে। তবে সে সময়ে তিনি অসুস্থা ; তাই বই আর চিঠি পাঠিয়ে দিলুম রেজিস্ট্রি ডাকে। অনুমতি ছাড়াই বইটি তাঁকে উৎসর্গ করেছি বলে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে।

দুই : দিদি জবাব দিয়েছিলেন 28.9.77 তারিখে। রোগশয্যা থেকে। প্রাপ্তিমাত্র। তখনো বইটি পড়েননি। পরে পড়েছিলেন কিনা জানা হয়ে ওঠেনি। দিদি লিখেছিলেন :

"প্রীতিভাজনেষু, আপনার 'হংসেশ্বরী' আমার নামে উৎসর্গ করেছেন এই সংবাদে অপ্রত্যাশিত খুশির সঙ্গে দুঃখিত হচ্ছি আপনি নিজে এসে দেবেন ভেবেও আমার অসুস্থতার খবরে আসাটা স্থগিত রাখলেন বলে। তার মানে একটি বিশেষ লাভের সঙ্গে একটি মস্ত লোকসান। তবে ভেবে দেখছি, দুঃখিত হবার দরকার নেই। আমি তো আর চিরকাল অসুস্থ থাকব না, ঝেড়ে উঠবই চটপট, তখন নিশ্চয় খবর নেবেন এবং স্থগিত রাখা কাজটা শেষ করে ফেলবেন।...

আপনার 'অপরাধের' হিসেবটা আমার জানা নেই, কাজেই তার স্খালন হল কিনা বলা শক্ত। পড়ে ফেললে হয়তো বুঝতে পারব। আশা করি সর্বাঙ্গীণ কুশল। আর একবার বলি, আপনার 'হংসেশ্বরী'র সঙ্গে আমার নামটি যুক্ত রইল দেখে দারুণ খুশি হয়েছি। প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। নমস্কারান্তে আপনাদের— আশাপূর্ণা দেবী।"

তিন : তাঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে এসেছি মাত্র একবার : 10.8.75 তারিখে। বলাইদার বাড়ি। লেকটাউনে। বনফুলের বাড়িতে কী একটা সাহিত্যসভা হয়েছিল যেন। আশাপূর্ণাদি সেই সভায় তাঁর স্বরচিত একটি ছোট গল্প পড়ে শোনান। সভায় উপস্থিত যাবতীয় নরনারী মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনেছিল। একটাই ব্যতিক্রম। এই হতভাগ্য। গল্পটা শুনিনি। কারণ নেপোলিয়ান বা নেতাজীর প্রতিভা আমার নেই। একসঙ্গে দুটো কাজ করতে পারি না। আমি সে সময় দ্রুত হাতে একটি স্কেচ আঁকছিলুম। বাস্তবে সেদিন সভায় আমি কারও কোন রচনাপাঠ শুনিনি। একাধিক স্কেচ এঁকেছিলুম আমার খাতায়। সভান্তে অনেকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে নিই ছবির তলায়। তার একটি আশাপূর্ণাদির। এসব কথা অ্যাদ্দিন প্রকাশ্যে বলিনি। কারণ ছিল। একজন আমাকে শাসিয়েছিল এই বলে, 'এর ফল ভাল হবে না!' আমার লেখা গ্রন্থের সমালোচনা আনন্দবাজার পত্রিকায় সচরাচর প্রকাশিত হয় না। নানান হেতুতে। সেবার মার্জার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল। শিল্প-বিষয়ক একটি সচিত্র গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হল রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে। কোন্ কোন্ বিষয়ে তাঁর আপত্তি সে কথার লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে সমালোচক উপসংহার টেনেছিলেন এইভাবে ; 'নারায়ণ সান্যালের আর একটি দুর্বলতা চিত্রকর হিসাবে নিজেকে জাহির করা। সুন্দর মিথুনমূর্তি তাঁর হাতে পড়ে এমনই আড়ষ্ট ভঙ্গি ধরেছে যে, তাতে গ্রন্থের মূল্য কমেছে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর হিসাবে সাফল্য তারাশংকর,

বনফুল থেকে নারায়ণ সান্যাল পর্যন্ত নানা সামর্থ্যের লেখকরা শিল্পকলায় অনুপ্রাণিত করেছে, কিন্তু ফল তেমন ভাল হয়নি।'

তারপর থেকে নিজের আঁকা ছবির কথা বলতে ডরাই।

সম্প্রতি আমার নাতনি রিন্টি, মানে শ্রীমতী অন্তরা, আমার জুজু-ভয়টা ভেঙে দিয়েছে। ও বেচারি জন্ম থেকে আমেরিকায় মানুষ। তবে বাবা-মায়ের উৎসাহে ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে ও পড়তে পারে। ও আমাকে বললে, 'গ্র্যান্ড-পা, তুমি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারছ না! রিভ্যুয়ার ইন-এ-ওয়ে তোমাকে তো কম্‌প্লিমেন্টস্‌ই দিয়েছে! হি হ্যাজ কমপেয়ার্ড য়ু.....আই মীন, সে তোমাকে বনফুল, তারাশংকর ঈভন টেগোরের সঙ্গে কম্‌পেয়ার করেছে! একেই তো বেঙ্গলি রেটরিক-এ 'badgostuti' বলে! তাই না?'

'ব্যাজস্তুতি' যে ওকে বলে না, তা রিন্টিকে কী করে বোঝাই? তবে কথাটা তো খাঁটি। আশাদি আমাকে লিখেছিলেন 'হংসেশ্বরীর সঙ্গে আমার নামটা যুক্ত রইল দেখে দারুণ খুশি হয়েছি।' তাহলে বনফুল, তারাশংকর, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার নামটি যুক্ত রইল দেখে আমিই বা দারুণ খুশি হব না কেন? ফল ভাল হোক আর মন্দ হোক—বলাইদার বাড়িতে আঁকা সেই স্কেচগুলি—আশাপূর্ণাদির স্বাক্ষরিত স্কেচ সমেত—দিয়েই বঙ্গ-সাহিত্যের ঐ দিকপালদের সঙ্গে দিদিকেও আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করি।

বক্রেশ্বরের একানে-বুড়ো

একানে-বুড়োর নাতি বটুকেশ্বর বলেছিল: 'মায়ের ভুরুর মদ্যিখানটুক হেথায় পড়িছিল আজ্ঞে।'

আমি বলেছিলাম : 'তোমার ঐ আজগুবি গল্পগুলো বিশ্বাস না করলেও এ কথাটা মনে-প্রাণে স্বীকার করি আমি।' কথাটা বটুকেশ্বর প্রণিধান করতে পারেনি। আহত হয়েছিল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল আমার দিকে। আড্ডাটা বসেছিল বক্রেশ্বর মন্দিরের উত্তর-পূর্বের নির্জন আমবাগানে। বীরভূমের বক্রেশ্বর বাহান্ন-পীঠের এক পীঠ। জাতে নৈকষ্যকুলীন। কলিতীর্থ কালিঘাট, কামরূপ কামাখ্যার একেবারে স্বগোত্র। কিন্তু তার অবস্থা দেখলে কান্না পায়। একটা হোটেল নেই, একটা দোকান নেই--সপ্তাহে দুদিন বুঝি হাট বসে ; বুধবার আর শনিবার। বেড়াতে যদি যেতে চান, কিম্বা পুণ্যসঞ্চয়ের বাসনা যদি জেগে থাকে, তাহলে চাল-চিঁড়েই শুধু নয়, মাথাগোঁজার জন্য আস্ত একটা তাঁবু বেঁধে নিয়ে যেতে পারলে ভাল হয়। ধর্মশালা অবশ্য একটি আছে। নামমাত্র। পাশাপাশি খানচারেক ঘর--আট ফুট বাই আট ফুট। ধর্মে প্রগাঢ় মতি না থাকলে ধর্মশালায় আশ্রয় নেওয়া অসম্ভব। আমার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। আমি বেড়াতেও যাইনি, তীর্থ করতেও নয়--ফলে আমার জন্য একটি বিকল্প ব্যবস্থা করা গিয়েছিল। কিন্তু সে সুযোগ তো সকলের হয় না। তাই বলছিলাম, স্থান মাহাত্ম্য যতই থাক--বীরভূমের বক্রেশ্বরে যাওয়া- আসা এবং থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্তটা খুব মনোরম নয়। যাঁরা বরাবর গাড়িতে যাবেন তাঁদের অতটা অসুবিধা নেই। সিউড়ি শহর থেকে মাইল পনের গাড়ি চালিয়ে বক্রেশ্বরে পৌঁছাতে পারেন। তীর্থ-দর্শন আর কুণ্ডস্নান সেরে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসতে পারেন ফের নাগরিক জীবনে। পাকারাস্তা এতদিন ছিল না। হালে হয়েছে। তাছাড়া এতদিন বক্রেশ্বর নদীর ওপারে এসে বাস থামতো। পায়ে হেঁটে যেতে হত বাকি পথটুকু। এক মাইলেরও কম যদিও। বালি চিক-চিক পাথুরে নদী পার হতে হত পায়ের পাতা ভিজিয়ে। নেহাত বর্ষাকাল না হলে অবশ্য হাঁটুর উপর কাপড় তুলতে হত না। এখন সে হাঙ্গামাও নাই। আম-কাঁঠালের আবছায়ায় কংক্রিটের ঝকমকে নূতন সাঁকোটা গ্রাম্যচাষীর দাওয়ায় ব্যাটারি-সেট রেডিও-র মতো শোভা পাচ্ছে। অনায়াসে আজকাল মন্দিরের কাছ-বরাবর চলে যায় মটোরগাড়ি। কিন্তু মটোরে যাবার সৌভাগ্য আর কজনের হয় ? আপনার আমার ভরসা তো সেই আদি-অকৃত্রিম রেলের গাড়ি। নামতে হবে দুবরাজপুর স্টেশনে। বাস পাবেন। পাবেন ট্যাক্সিও, খোঁজখবর নিলে। দুবরাজপুর থেকে বক্রেশ্বর মাইল-সাতেক।

সতীর বাহান্ন-পীঠের এক পীঠ। আত্মভোলা বিরহী শিবের স্কন্ধে সতীর শব। সুদর্শন চক্রের চক্রান্তে তা ছড়িয়ে পড়ল ভূ-ভারতের বাহান্ন তীর্থে। গড়ে উঠল বাহান্ন মহাপীঠ। মায়ের স্থান সেগুলি। মায়ের মন্দিরই সেখানে প্রধান আকর্ষণ। অবশ্য সব শক্তিপীঠেই থাকে একটা করে ভৈরবের মন্দির। সেটা শক্তি-মন্দিরের পরিপূরক। মূলমন্দিরের একান্তে তার

উপেক্ষিত অবস্থান। শাড়ি-গহনার দোকানে গৃহকর্ত্রীর সক্রিয় অবস্থিতির পটভূমিকায় ক্যাশ-কাউন্টার-ঘেঁষা গৃহকর্তার উপস্থিতির মতো। অর্থাৎ ভৈরব-মন্দিরকে একেবারে বাতিল করা যায় না বলেই বাহান্নপীঠের প্রত্যেকটিতে আছেন ভৈরব।

বক্রেশ্বর এ বিষয়েও একটি ব্যতিক্রম। এখানে বক্রেশ্বর অথবা বক্রনাথের মন্দিরই প্রধান—মহিষমর্দিনীর মন্দির যেন তার পরিপূরক। 'মা-মা' ডাক শুনলুম না যাত্রীদের মুখে ;—সবাই হাঁক পাড়ছে —'জয় বাবা বক্রেশ্বর!' মহাষ্টমী, দীপান্বিতা নয়, বার্ষিক উৎসবের আয়োজনও সেই শিব চতুর্দশীতে।

1 বক্রেশ্বর মন্দির	7. অগ্নি কুণ্ড—71° সে	13 মহিলাদের ঘাট
2 হরিশ্বরী কালীবাড়ি	8 জীবৎস কুণ্ড (শীতল)	14 পুরুষদের ঘাট
3 চন্দ্রসায়র দিঘি	9. সৌভাগ্য কুণ্ড—42° সে	15 মন্দিরের প্রবেশপথ
4. পুকুর	10. সূর্য কুণ্ড—65° সে	16 ইঁদারা
5 ভৈরব কুণ্ড—65° সে	11 শ্মশান ও সমাধিস্থান	17. লক গেট
6. ক্ষীর কুণ্ড—66° সে	12. জটাবাবার আশ্রম	18 মহিষমর্দিনী মন্দির

তাই বটুকেশ্বরের কথাটা মনে লেগেছিল। ঠিকই বলেছে বটুক। আর কিছু নয়, মায়ের কপালটাই ভেঙে পড়েছে এখানে—'ভুরুর মধ্যিখানটুক!'

তীর্থদর্শন অথবা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে নয়, গেঁটে-বাত, লাম্বাগো অথবা পৈটিক ব্যাধির কোনও প্রেরণায় যেতে হয়নি বক্রেশ্বরে। গিয়েছিলাম নিছক সরকারী কাজে। কিছু মাপজোক নিতে। যাত্রীদের অসুবিধা কিছু পরিমাণে লাঘব করা যায় কিনা তাই দেখতে। জরীপের

দল কিছুদিন আগে এসে মাপজোক নিয়ে গেছে। মোটামুটি একটা ম্যাপও খাড়া করেছে তারা। অর্থাৎ—'মা যাহা ছিলেন' এবং মা যাহা হইয়াছেন'। সেই ব্লু-প্রিন্টখানাই আমার কাছে কলাম্বাসের কম্পাস, তেনজিং-এর অক্সিজেন সিলিন্ডার। ওর ভিতর দিয়েই দেখতে হবে 'মা যাহা হইবেন।'

দুবরাজপুরে যখন এসে পৌঁছলাম তখন সকাল ছটা। ভাল করেই আলো ফুটেছে পুব-আকাশে। ছোট্ট স্টেশন। ঘুমের আমেজ তার কাটেনি তখনও। ঘুম-ভাঙা চোখে জেগে-ওঠা দুবরাজপুর স্টেশনকে দেখে মনে পড়ে গেল কাল রাত্রের হাওড়া স্টেশনকে। ওরা দুটি সহোদর, নাড়ির যোগ আছে দুজনের—কিন্তু লক্ষপতি শহুরে দাদার ছোটভাই বলে পরিচয় দিতেও যেন এ গ্রামবাসী ভাইটি লজ্জা পাবে। ভাগ্য ভাল। দুবরাজপুর ব্লকের বি ডি ও আমার টেলিগ্রাফটা সময়েই পেয়েছিলেন। জীপটা দাঁড়িয়ে আছে স্টেশন চত্বরের বাইরে।

ব্লক-ডেভালপমেন্টের হেড-কোয়ার্টার্স দুবরাজপুরে। ছোট্ট শহর। বিজলী এসেছে। এককালে পিতল-কাঁসার বাসনের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখনও কিছুটা আছে। ধানকল আছে। বহু প্রাচীন শিবলিঙ্গও আছে। আর আছে বিশালায়তন বেলে পাথর। এক একটা পাথর উচ্চতায় ও পরিধিতে পঞ্চাশ ফুটেরও বেশি। পাহাড় নেই কিন্তু। ধানক্ষেতের দেশে এমন এমন বিরাটাকার পাথর কোথা থেকে এল ভাবছেন তো ? কারণ আছে। সে গল্পও আমাকে শুনিয়েছিল একানে বুড়োর নাতি বটুকেশ্বর ভট্টাচার্য।

এ পাথর এখানে এনেছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র। সীতা উদ্ধার করতে গিয়ে নিতান্তই যখন সাগরের উপর সেতু বন্ধনের প্রয়োজন হয়ে পড়ল তখন রামচন্দ্র অনুভব করলেন হিমালয় থেকে কিছু পাথর নিয়ে আসতে হবে। হাতের কাছে পূর্বঘাট, পশ্চিমঘাট অথবা বিন্ধ্যপর্বত থাকা সত্ত্বেও কেন যে তিনি হিমালয়ে ছুটলেন তা অবশ্য বুঝিয়ে বলেনি বটুক। বোধ করি সে যুগে ক্যারিং-কস্টটা কম ছিল। সে শুধু বলেছিল : শ্রীরামচন্দর তো চলিছেন পুষ্পকরথে। রথের উপরি হেই বড় বড় পাথরের চাঁই। কুথায় গৌরীশৃঙ্গ আর সেই কুথাকে কুমারিকা, বুঝলেন, খুব জোরে ছুটাই দিলেন রথ। ইদিকে হইছে কি বাবা বক্রনাথের মন্দিরটা লজড়ে আসতি পক্ষিরাজ তো ইয়া এক পেন্নাম ঠুকে দিলেক। ব্যাস ! রথটো গেলেক লড়ে। আর হুড়হুড়ায়ে বড়া বড়া পাথর সব গড়ায়ে পড়লেক হেথাকে।

আমি বলেছিলুম : কিন্তু বাবা বটুক, তা কেমন করে হবে ? পক্ষিরাজ পেন্নাম করল বক্রেশ্বরে, আর পাথরগুলো হুড়হুড়ায়ে গড়ায়ে পড়ল দুবরাজপুরে ? বক্রেশ্বর থেকে দুবরাজপুর যে পাক্কা পাঁচ-সাত মাইল ?

বটুকেশ্বর অবাক হয়ে বলে : ইটা কি বলিছেন আজ্ঞে ? চলতি গাড়ি থিকে পাথর পড়লে তা আগায়ে যাবেক নাই ?

বটেই তো, বটেই তো ! বক্রেশ্বর দুবরাজপুরের উত্তর-পূর্বে। গৌরী শৃঙ্গ থেকে কুমারিকা যাবার সময় রথের গতিমুখ ছিল দক্ষিণ-পশ্চিমে ! রথের গতিবেগজনিত কারণে পাথরগুলো তো দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কিছুটা এগিয়েই পড়বে !

একগাল হেসে বটুক বলেছিল : আপনি ইঞ্জিনিয়ার বটেন তো ! তাই ঝটপট বুঝে নিলেন !

আমি বলি : কিন্তু রথটা কত উঁচু দিয়ে যাচ্ছিল বলতে পার বটুক ?

কৌতূহলী কিশোরটি বলেছিল : না। কেনে ?

—তুমি যদি বলতে পারতে পুষ্পকরথ কত উঁচু দিয়ে যাচ্ছিল, তাহলে আমি অঙ্ক কষে বলে দিতে পারতাম পুষ্পকরথের গতিবেগ কত ছিল।

বটুক শ্রদ্ধানম্র দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বসেছিল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল : সি টো আমি জানি না, আজ্ঞা। একানে-বুড়োরে শুধাব'-খন।

একানে বুড়ো অর্থে তার পূজ্যপাদ পিতামহ। বক্রেশ্বরদেবের দেবোত্তরের এক-আনা অংশের মালিক। মন্দিরের অবসরপ্রাপ্ত সেবায়েত। কি যেন ভট্টাচার্য।

কিন্তু বটুকেশ্বরের কথা যথাস্থানে আসছে, একানে বুড়োর কথাও। আপাতত গল্পের সূত্র বজায় রাখতে হলে আমাকে স্টেশন থেকে জীপে চড়ে দুবরাজপুর ব্লক হেডকোয়ার্টার্স যেতে হয়। বি ডি ও সাহেব তৈরীই ছিলেন। আলাপ-পরিচয় হল। এ ব্লকে উনি বছরতিনেক আছেন। এক এক কাপ চা খেয়ে রওনা দেওয়া গেল। আমাকে বক্রেশ্বরে নামিয়ে দিয়ে বি ডি ও সাহেব যাবেন পাণ্ডবেশ্বরের দিকে।

দুধারে ধানের ক্ষেত। মাঝখানে কুমারী মেয়ের সিঁথির মতো চলে গেছে পাকা সড়কটা। ভাদ্রের প্রথম। এখনও বীজধানের ক্ষেত-থেকে-আনা আমনের চারা রুইছে বীরভূমের চাষী। 'ভাদ্রের দশ বারো, তার মধ্যে যত পার।' গোড়ালি পর্যন্ত কাদায় ডোবা, বাঁ হাতে সবুজ ধানের চারা, খোঁপায় ফুল—সার দিয়ে সাঁওতালী মেয়ের দল কাদার মধ্যে পুঁতে চলেছে সোনালী স্বপ্নের সবুজ গুচ্ছি। আগেকার দিন হলে, হাতের কাজ বন্ধ রেখে অবাক বিস্ময়ে চোখ তুলে চেয়ে দেখত বিংশ শতাব্দীর এই যান্ত্রিক বিস্ময়কে। এখন আর ওরা অবাক হয় না। ছুটন্ত জীপের বেগের আবেগ আর দোলা দেয় না ওদের মনকে।

দুবরাজপুর থেকে মাইল দুই পশ্চিমে ফুলবেরা গ্রাম। শুনেছি এখানে আছে একটি সুবৃহৎ দিঘি। দাঁত্তন দিঘি। বীরভূমের সামন্তরাজ খগাদিত্য নাকি এই দিঘিটি খনন করান। বীরভূমের গৌরব ইতিহাস আজ ছায়ার চেয়েও ছায়া। দূর থেকে তালগাছের সারিই দেখলাম শুধু। দিঘি দেখা হল না। আর দেখা হল না দাঁত্তন দিঘির ধারে দন্তেশ্বরীর মন্দির। সতীর দাঁত নাকি পাড়েছিল এখানে। অন্তত ফুলবেরার গ্রামবাসীরা তাই বিশ্বাস করে।

বি ডি ও সাহেবকে বলি : জোফলাই গ্রামটা কতদূর ?

—*জোফলাই ? দুবরাজপুর থেকে মাইল পাঁচেক দক্ষিণে।* কেন, সেখানকার কাউকে *চেনেন নাকি ?*

বলি : না চিনি না।

—আপনি কি বক্রেশ্বরে এর আগেও এসেছিলেন ?

—এবারও বলতে হল : না, এই প্রথম।

—তাহলে জোফলাই গ্রাম চিনলেন কেমন করে ?

বললাম : তা চিনি। জোফলাই চিনি—খাগড়াও চিনি। ফুলবেরার পাশের গ্রাম খাগড়া। সেখানে রাজা খগাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত খগেশ্বর শিব আছেন। জোফলাইতে আছে পদকর্তা জগদানন্দের ভিটে। বৈষ্ণব দাসের পদকল্পতরুতে তাঁর কয়েকটি পদ আছে।

সাত মাইল পথ দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল। বক্রেশ্বরে পি ডাবলু ডি-র একটি চমৎকার ডাক-বাঙলো আছে। ভাগ্যক্রমে সেখানে একটি ঘর পেলাম। পাশের ঘরে আছেন একজন সরকারী জিওলজিস্ট। বক্রেশ্বর কুণ্ডের জল নিয়ে কী যেন রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন তিনি।

ও হো, বক্রেশ্বর কুণ্ডের কথাই তো বলা হয়নি এখনও।

বক্রেশ্বরের সব চেয়ে বড় আকর্ষণ এখানকার কুণ্ডগুলি। উষ্ণ প্রস্রবণ। উত্তর ভারতে এমন উষ্ণ-প্রস্রবণ অনেক আছে, আছে রাজগীরেও—কিন্তু হাতের কাছে বাঙলা দেশেই উল্লেখযোগ্য উষ্ণ-প্রস্রবণ আছে একমাত্র বক্রেশ্বরেই। ছয়টি উষ্ণ-প্রস্রবণ থেকে গরম জল এসে জমে একটা বড় পুকুরে। কেউ বলে 'পাপহরা-গঙ্গা', কেউ বলে 'বৈতরিণী'। তা নাম যাই হোক, ওখানে গিয়ে ডুব দিতে পারলে সব পাপ ধুয়ে যায়, এ বিশ্বাস রাখে যাত্রিদল। আসে তারা দলে দলে— পাপহরা-গঙ্গায় সব পাপ, সব মালিন্য ধুয়ে ফেলে নিষ্পাপ নিষ্কলুষ হয়ে আবার ফিরে যায় সংসারে। শিবরাত্রির মেলায় অন্তত বিশ হাজার যাত্রীর সমাগম হয় এখানে।

কুণ্ডগুলি এত উত্তপ্ত যে তাতে স্নান করা অসম্ভব। বস্তুত হাত ডোবানোই যায় না। কুণ্ডের জল পাপহরা-গঙ্গায় এসে পড়ে শীতল জলের সংস্পর্শে স্নানের উপযোগী গরমজলে পরিণত হয়। পাপহরার জল কিন্তু আবদ্ধ জল নয়। অনবরত উপচে পড়ে চলেছে তার জল। মাঝে মাঝে লক গেট খুলে দিয়ে সমস্ত জলটা নিকাশ করা হয়—তলাটা ঝালানো হয়। শুনলাম পানোন্মত্ত একজন সন্ন্যাসী নাকি একবার একটি উষ্ণ কুণ্ডে পড়ে গিয়েছিল। অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করা যায়নি।

আমাকে বক্রেশ্বরের ডাক-বাঙলোয় নামিয়ে দিয়ে বি ডি ও সাহেব চলে গেলেন পাণ্ডবেশ্বরের দিকে। পাণ্ডবেশ্বর বেশী দূরে নয়। অণ্ডালের দিকে। অজয় নদীর তীরে সেখানে আছে পাণ্ডবেশ্বর শিবলিঙ্গ। বনবাসের সময় পঞ্চপাণ্ডব ঐ গ্রামে নাকি কিছুদিন বাস করেন। তাঁদেরই প্রতিষ্ঠা করা শিবলিঙ্গ পাণ্ডবেশ্বর। এখানে সামন্তভূমের রাজা ভীমচন্দ্রের একটি দুর্গ ছিল। ভীমগড়ে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ নাকি এখনও দেখায় গ্রামবাসীরা। মালপত্র ডাক-বাঙলোয় নামিয়ে রেখে পায়ে পায়ে চললাম মন্দিরের দিকে। পথ আধ মাইলেরও কম। মন্দিরের পাশেই কুণ্ডগুলি। প্ল্যানটা হাতে নিয়ে সেদিকে যাবার উপক্রম করতেই চার-পাঁচজন পাণ্ডা ঘিরে ধরল আমাকে। তীর্থস্থান মাত্রেই যেমন হয়ে থাকে। নিমেষে প্রাণটা কণ্ঠাগত করবার আশ্চর্য দক্ষতা ওদের। যত বলি পূজা দিতে আসিনি, পাণ্ডার প্রয়োজন নেই, ততই ওরা আমাকে বোঝাতে থাকে বাবা বক্রেশ্বরের মাহাত্ম্য। ওদের ভাবখানা বেশ তো, মাপ-জোক নিতে চান, নিন না—তা বলে সেই সঙ্গে বাবার নামে একটা পূজা চড়িয়ে দিলে ক্ষতি কী? অর্থাৎ কলা বেচতে চান বেচুন, ঐ সঙ্গে রথের উদ্দেশ্যে একটা প্রণাম ঠুকে দেওয়ায় আপত্তি কোথায়?

বিরক্ত হয়ে বললাম : কেন বৃথা সময় নষ্ট করছেন আপনারা, আমি পূজা দেব না।

ওদের মধ্যে কপালে-ফোঁটা মধ্যবয়স্ক একজন বলে : বেশ তো, পূজা না দিবেন, নাই দিবেন, নামটো বল্‌তে আপত্তি কি? গোত্রটা জানাতে বাধা কুথায়?

বললাম : নাম? আমার নাম ক্রিস্টোফার জোসেফ। আর গোত্র প্রটেস্টান্ট।

বেশ বোঝা গেল ওরা বিশ্বাস করল না। কিন্তু আর কিছু বললও না। কপালেফোঁটা লোকটি বিচিত্র হাসল। কিছুটা ব্যঙ্গ কিছুটা অবজ্ঞা। ভাগ্যক্রমে এই সময় এসে পড়ল একদল পশ্চিমা তীর্থযাত্রী। ওরা এগিয়ে গেল সেদিক পানে। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘাসের উপর ব্লু-প্রিন্টটা বিছিয়ে বসতে যাব, পিছন থেকে যেন দৈববাণী হল : আপনি খেষ্টান আজ্ঞে?

বছর চৌদ্দ। জুল জুল চোখ। পরনে হাফ-প্যান্ট। আদুল গা, খালি পা। বাহুতে বৃহদায়তন একটা তামার মাদুলি। কদমছাঁট মাথায় একটি টিকি। গলায় আজানুলম্বিত সামবেদী পৈতা। হাতে একটা নিমের দাঁতন।

হেসে বললুম : আমার নাম তো শুনলে, তোমার নামটি কী?

—বটু। মানে শ্রীবটুকেশ্বর ভট্টাচার্য।

—এ গ্রামেই থাক? কোথায়?

—ওই হুথায়। একানে-বুড়োর নাতি আমি আজ্ঞে।

বটুকেশ্বরের বোধ হয় দৃঢ়বিশ্বাস ছিল এর পর আমার তরফে আর প্রশ্ন হতে পারে না। একানে-বুড়োর নাতি—এই পরিচয়ই ও প্রসঙ্গে শেষ কথা। তা সত্ত্বেও যখন আমাকে প্রশ্ন করতে হল, একানে-বুড়ো কে, তখন সে বুঝিয়ে বললে—একানে এখানকার একজন নামকরা পাণ্ডা। প্রাক্তন সেবায়েত। এক-আধ পয়সা নয়, দেবোত্তরের পুরো এক আনা অংশের দাবিদার সে।

যে ভঙ্গিতে সদ্য-পরিচিত ভদ্রলোককে আমরা সিগারেট অফার করি ঠিক তেমনি সপ্রতিভভাবে বটুক হাফ-প্যান্টের পকেট থেকে একটি নিমের দাঁতন বার করে বললে : দাঁতন লিবেন আজ্ঞে?

অল্পক্ষণের মধ্যেই আলাপ হয়ে গেল ওর সঙ্গে। আলাপ নয় বন্ধুত্ব। অনর্গল কথা বলা ওর এক রোগ। গত বৎসর ওর উপনয়ন হয়েছে। সোনাবাঁধানো তামার আটিংটা দেখাল। বাড়ির গল্পও করল অনেক। ওরা দুই ভাই এক বোন। ও মেজ। বোনটি ওর চেয়ে বড়। বিয়ে হয়ে গেছে। ভগ্নিপতি সাঁইথিয়া স্টেশনের পয়েন্টসম্যান। ভাল চাকরি করে। উপনয়নে দিদি ওকে একটি টর্চবাতি দিয়েছে—আর দিয়েছে ধুতি-গেঞ্জি। ওদের গোয়ালঘরের মাচায় এবার নাকি এতবড় কুমড়ো ধরেছিল যার তুলনায়, বক্রেশ্বরের হাট তো ছাড় সিউড়িবাজারের সব চেয়ে বড় কুমড়োটাকে মনে হবে গাব। আর সব চেয়ে আশ্চর্যের খবর ওদের বুধিরও বাচ্চা হয়েছে বুধবারে। ও তার নাম রেখেছে—বুদ্বুদ। আমাকে হঠাৎ প্রশ্ন করলে : নামটো ভাল হয় নাই?

আমি বললুম : অতি উত্তম হয়েছে। বউ থাকতে বারবার যে বর সেজে বিয়ে করতে যায় তাকে যদি 'বর্বর' বলি তাহ'লে বুধবারে বুধির বাচ্ছা হলে তাকে 'বুদ্বুদ' বলতে হবে বইকি।

বটুক খুব খুশী হল; বললে : শিবু বলে বুদবুদ নামটা ভাল নয়। বোকা!

শুনলাম শিবু ওর পঞ্চমবর্ষীয় ছোট ভাই।

আশ্চর্য, বটুক মেনে নিয়েছিল আমি খৃষ্টান। তার মনে কোনও সন্দেহ জাগেনি। বাবার স্থানে মন্দিরে দাঁড়িয়ে কেউ মিছে কথা বলতে পারে?

এমন একটি সঙ্গী পেয়ে আমারও খুব সুবিধা হল। সমস্ত এলাকাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল আমাকে। একানে-বুড়োর কাছে শোনা ও শেখা পৌরাণিক কাহিনীগুলি সে অনর্গল বলে গেল আমাকে তোতা পাখির মতো। সব চেয়ে মজা, ঐ গল্পগুলি বলবার সময় তার ভাষাটা হয় আশ্চর্য রকমের মার্জিত সংস্কৃতঘেঁষা। একানে-বুড়ো নিশ্চিত মুখস্ত করিয়েছে তাকে। অধস্তন পুরুষকে দিয়ে যাবার মতো এই একটিমাত্র সম্পদই ছিল বৃদ্ধ পূজারীর। তীর্থযাত্রীদের সে অর্ধশতাব্দীকাল ধরে শুনিয়েছে এই সব অলৌকিক গল্প। মুখে-মুখে চলে এসেছে এ সব কাহিনী স্মরণাতীত অতীতকাল থেকে। একানে-বুড়ো সেই জপমালার একটি রুদ্রাক্ষমাত্র। পরবর্তী যুগের হাতে সে দিয়ে যাবে তার পৈত্রিক দায়। এই কাহিনীগুলিই ছিল তার কুমোরের চাক, তন্তুবায়ের তাঁত, কিম্বা গৃহস্থ-বধূর লক্ষ্মীর ঝাঁপি। অতি নিপুণভাবে তাই সে এগুলি মুখস্ত করিয়েছে নাতিকে দিয়ে। বীরভূমের বিচিত্র ক্রিয়াপদগুলিকে একটু মার্জিত করে নিলে বক্রেশ্বরে শিবের মাহাত্ম্য-কাহিনী—বটুকেশ্বর যা আমাকে শুনিয়েছিল—সেটা দাঁড়ায় এই রকম :

পুরাকালে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব হিরণ্যকশিপু দৈত্যকে বিনাশ করায় ব্রহ্মবধজনিত পাপে ভগবান নৃসিংহদেবের নখে দারুণ জ্বালা অনুভূত হয়। দেবসমাজে এ কথা প্রচারিত হলে সকলে বিচলিত হলেন। কিন্তু কেউই সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন না। দেবতার যখন বজ্রের প্রয়োজন হয় তখন মানুষ খুলে দেয় তার বুকের পাঁজর ; দেবতার যখন যন্ত্রণা শুরু হয় তখনও মানুষই পেতে দেয় আপন মস্তক। নৃসিংহদেবের যন্ত্রণার কথা ধ্যানে জানতে পেরে তপস্যানিরত এক মহামুনির তপস্যাভঙ্গ হল। ঋষিবর স্বেচ্ছায় এই নিদারুণ জ্বালা স্বীয় মস্তকে ধারণ করলেন। ত্রিভুবন ধন্য ধন্য করে উঠল, স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল, দিগঙ্গনার দল মঙ্গলশঙ্খধ্বনি করলেন। এদিকে যন্ত্রণায় মহামুনির দেহ কুঞ্চিত বিকৃত হয়ে গেল—তিনি অষ্টাবক্র হয়ে গেলেন। ভক্তের এ দশা দেখে নৃসিংহদেব স্বয়ং অষ্টাবক্র মুনিকে পরামর্শ দিলেন শিবের আরাধনা করতে। নির্দেশ মত অষ্টাবক্র এলেন এই মহাতীর্থে। গুহামধ্যস্থ শিবলিঙ্গকে স্পর্শ করা মাত্র সর্বতীর্থের বারি এসে অভিষিক্ত করল তাঁকে। জ্বালামুক্ত হলেন অষ্টাবক্র। সেই থেকে এই শিবের নাম হল অষ্টাবক্রেশ্বর বা বক্রেশ্বর। ভৈরবীর নাম মহিষমর্দিনী।

কাহিনী শেষ করে বটুকেশ্বর বললে : আপনি খেষ্টান যে, লইলে দেখায় আনতম বাবা বক্রনাথরে।

আমি বললুম : তা শুদ্ধিটুদ্ধি নিলে দেখা যায় না ?

গম্ভীর হয়ে বটু বললে : সি কথাটা একানে-বুড়ারে শুধায়ে লিব।

সূর্যকুণ্ড সম্বন্ধেও তার ঝুলিতে আর একটি কাহিনী আছে : একদা নারদ ঋষি বিন্ধ্যপর্বতের কাছে সুমেরু পর্বতের উচ্চতার গুণগান করেন। বিন্ধ্য তাতে অপমানিত বোধ করে সগর্বে স্ফীত হয়ে এত উচ্চে মস্তক উত্তোলন করলেন যে, সূর্য আর পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে পারেন না। বিপন্ন সূর্য এই কুণ্ডে স্নান করে কঠিন তপস্যায় বসলেন। শেষে শিব সন্তুষ্ট হয়ে সূর্যের অনুরোধে স্বয়ং এসে দাঁড়ালেন বিন্ধ্যপর্বতের কাছে। মহাযোগীশ্বর শিবকে দেখে বিন্ধ্য শ্রদ্ধানম্র প্রণতি জানালেন। ফলে পৃথিবী প্রদক্ষিণ পথে সূর্যের আর কোন বাধা রইল না।

উপসংহারে বটুক বললে : বাকিটা বুঝলেন আজ্ঞে? সুয্যো শীতল কুণ্ডে ডুব দিলেক আর কুণ্ডটো আগুনপারা হই গেল।

আমি মনে মনে বললুম : হবেক নাই? সুয্যোটি যে আগুনপারা।

বটুকেশ্বর আমাকে নিয়ে গেল পাপহরা গঙ্গায়। অবগাহন স্নান করা গেল। রাজগীরে দেখেছি স্নানাগারের সামনে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া আছে অ-হিন্দুদের প্রবেশ নিষেধ। এখানে অতটা কড়াকড়ি নেই। জলের গভীরতা দেড়-দু হাতের বেশি হবে না। উত্তাপ 42° সেন্টিগ্রেড। রাজগীরের জলে কোনও রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়নি—এখানে জলে সালফারের গন্ধ বেশ আছে। সাতটি কুণ্ডের জল এসে জমছে এখানে, এই পাপহরা-গঙ্গায়। বটুক মুখস্থ বলে গেল—কোন্ কুণ্ডের উত্তাপ কত। শব্দরূপ মুখস্থ বলা ভঙ্গিতে বলে গেল : ব্রহ্মকুণ্ড—66°, ক্ষীরকুণ্ড—66°, অগ্নিকুণ্ড—67°, সূর্যকুণ্ড—66°, ভৈরবকুণ্ড—65°, শ্বেতগঙ্গা আর জীবৎসকুণ্ড শীতল—32°। সৌভাগ্যকুণ্ড আর পাপহারিণী-গঙ্গা ঈষদুষ্ণ অর্থাৎ 42°। ডিগ্রি বলতে কি বোঝায় তাও উপসংহারে জানিয়ে দিলে। 'একশ ডিগ্রি হলে জল ফুটবেক আর শূন্য ডিগ্রিতে—ব্যাস, বরফ।' সব চেয়ে সে আমাকে অবাক করে দিল মন্দিরের ভিতরে পাশাপাশি দুটো কুণ্ড দেখিয়ে। একটিতে গরমজল, অপরটিতে শীতল। ব্রহ্মকুণ্ড আর শ্বেতগঙ্গা। অথচ তাদের দূরত্ব মাত্র কয়েক হাত।

মন্দিরের ত্রিসীমানায় কোনও শৌচাগার নজরে পড়ল না। কুণ্ডের জলে নাকি সাবান ও ক্ষার কাচা নিষিদ্ধ। এ জাতীয় বিজ্ঞাপন লটকানো রয়েছে এখানে-ওখানে। আমরা যখন গেলাম তখন জনা-তিনেক গ্রাম্য-মহিলা সাবান কাচায় ব্যস্ত ছিলেন; আমাকে দেখে এক গলা ঘোমটা টানলেন। সেটা লজ্জায় না ভয়ে ঠাহর হল না। মেয়েদের ঘাটে কাপড় ছাড়ার ব্যবস্থাটাও শহুরে মেয়েদের ঠিক বরদাস্ত হবে না। তাছাড়া মেয়েদের ঘাটের উল্টোদিকেই সম্প্রতি গড়ে উঠেছে একটা নূতন তান্ত্রিক আশ্রম। অঘোরপন্থী এক তান্ত্রিক সেখানে ঘাঁটি গেড়েছেন। তাঁর স্নানের ঘাটটা মেয়েদের ঘাটের ঠিক অপর পারে। পাপহরা-গঙ্গা ছোট পুকুর—দৈর্ঘ্যে ফার্লং-খানেক হলেও চওড়ায় কোথাও একশ ফুটের বেশী নয়। ফলে মেয়েদের স্নান করায় অসুবিধা আছে। কাপালিকের আশ্রমটিও দেখলাম। বিরাট একটি গোশালা আছে। অশ্বত্থগাছের তলাটা বাঁধানো। ছেলেরা যেমনভাবে তাসের ঘর বানায় তেমনি সযত্নে গোটা পঁচিশেক নরমুণ্ড দিয়ে সাধুবাবা একটি পিরামিড রচনা করে রেখেছেন। পাপহরা-গঙ্গার দু-পারে দুটি শ্মশান। একধারে মড়া পুড়ছে, উৎকট তার দুর্গন্ধ। বটু বললে—একটি শ্মশান উচ্চবর্ণের, অপরটি জল-অচল জাতের। ইন্দ্রনাথের থিয়োরি : 'মড়ার আবার জাত আছে নাকি রে?' —এরা জানে না মনে হল।

স্নানান্তে দ্বিপ্রহরবেলায় ফিরে এলাম ডাক-বাঙলোয়। পরিশ্রম হয়েছিল খুবই। অরেঞ্জ স্কোয়াশের বোতল খুলে দু-গ্লাস সরবৎ বানিয়ে একটা গ্লাস বটুকের দিকে যখন বাড়িয়ে ধরলাম তখন বেচারি ম্লান হয়ে গেল। প্রথমটা বুঝতে পারিনি। পরে খেয়াল হল। আমার ছোঁওয়া জল তো ও খাবে না। টাকাটা অবশ্য ও হাতে পেতে নিল। সেটা কুলধর্ম। মড়ার জাত থাকলেও টাকার জাত নেই।

সন্ধ্যাবেলা নজরে পড়ল বড় রাস্তার ধারে একটি টিনের চালায় চায়ের আয়োজন। জনা

আট-দশ চা-প্রার্থী বেঞ্চি দখল করে বসে আছেন। এগিয়ে গেলাম সেদিকে। উচ্চকণ্ঠে কী যেন আলোচনা হচ্ছিল। বিজাতীয় পোশাকধারী আমাকে এগিয়ে আসতে দেখে মাঝপথে তালভঙ্গ হল রসালাপের। উৎসুক কৌতূহলী আটজোড়া চোখ। চেষ্টা করলাম আলাপ জমাতে। ওঁরা প্রায় সকলেই বাবা বক্রনাথের সেবায়েত। আলাপ জমে উঠল। সেবায়েতদের বংশবৃদ্ধি হয়েছে, সংখ্যায় বেড়েছে তারা—অথচ যাত্রিসংখ্যা বাড়েনি। যারা আসে, তারাও যোড়শ-উপচারে পূজা দেয় না। নমো নমো করে সারতে চায়। ফলে অধিকাংশেরই সাংসারিক অবস্থা শোচনীয়। সরকার বক্রেশ্বরে কী কী করতে চান ওরা জানতে চাইল। মন দিয়ে শুনল আমার কথা। খুব যে উৎসাহিত হল, তা মনে হয় না। শেষে আমি বললাম, কিন্তু আপনাদেরও ঐ কাপড় কাচাটা বন্ধ করতে হবে। আমরা যদি নূতন করে শ্মশানঘাট বানিয়ে দিই, তা হলে এ শ্মশানের জমি আপনাদের ছেড়ে দিতে হবে। আপনাদেরই মঙ্গল তাতে।

পিছনের সারিতে দু হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসেছিল একজন অশীতিপর লোলচর্ম বৃদ্ধ। চোখে ছানি পড়েছে বোঝা যায়। মুখে খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি বেরিয়েছে কচি কদমফুলের মতো। বললে : আমাদের মঙ্গলটা কুথায় ?

—বাঃ! সরকার যদি এখানে যাত্রিশালা করে দেন, স্নানাগার করে দেন, তা হলে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা বেড়ে যাবে না ? আর যাত্রিসংখ্যা বেড়ে যাওয়া মানেই আপনাদের রোজগার বৃদ্ধি।

সামনের সারিতে দু-চারজন আমাকে সমর্থন করল। কিন্তু কী জানি কেন বৃদ্ধ ক্ষেপে উঠল একেবারে : চুপ যা কেনে হরু। আমি সাহেবের সঙ্গে কথা বলি, তুই আগ বাড়ায়ে আসিস কেনে ?

মধ্যবয়সী হরু পাণ্ডা চুপ করে যায়। বৃদ্ধ বাঁ হাতখানা ভ্রূর উপর তুলে আন্দাজে আমার দিকে ফিরে বললে : আজ্ঞে তা লয়। আপনারা যে বন্দোবস্ত করতিছেন তাথে তীর্থযাত্রী বাড়বেক নাই—বাড়বেক টুরিস। তারা পূজা চড়ায় না, নাম শুধালে পূজা দিবার ভয়ে, পয়সা খরচের ভয়ে বাবার থানে মিছা কথা বলে। বলে, তারা মোছলমান, বলে খেস্টান।

কারো মুখে রা নেই। বুড়ো তখনও ঠকঠক করে কাঁপছে। উত্তেজনায় আবেগে। অস্বোয়াস্তিকর পরিবেশ। হরুই অতি মোলায়েম কণ্ঠে বললে : চুপ যাও কেনে একানে-জেঠা।

বৃদ্ধ ধমক দিয়ে ওঠে, কেনে ? একানে-বুড়ো কাউরে ডরায় না। মিছা কথা বুলছি নাকি যে, সাহেব দেখে ডরাব ? তিনকাল গে এককালে ঠেকিছে আমার—বলে, যমেরে ডরাই না, তা সাহেব !

চায়ের দামটা দিয়ে উঠে পড়লাম। রাত পৌনে দশটায় ফেরার গাড়ি। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই বাঙলোর দিকে। বটুক কাছেপিঠেই ছিল। এগিয়ে এসে বললে : একানে-বুড়োর মাথাটা খারাপ হইছে। বুড়া হইছে তো। উ ভাবিছে, আপনি মিছা কথা কইছেন উ-বেলায়।

আমি কোনও জবাব দিলাম না। মনটা সত্যই খারাপ হয়ে আছে। বটুক বোধ-করি ভাবলে আমার রাগ পড়েনি। এক নাগাড়ে বকবক করতে করতে এল ডাক-বাঙলো পর্যন্ত। আমাকে কী জানি কেন ওর ভাল লেগে গেছে। যতক্ষণ আছি সঙ্গ ছাড়ছে না। ডাক-বাঙলোর

বারান্দায় গা-এলিয়ে দিলাম ইজি-চেয়ারে। মাটিতে থেবড়ে বসে আন্‌সান্‌ বকতে থাকে বটুক। রাত বাড়ছে। আর দেরি করা চলে না। জামাকাপড় ছেড়ে তৈরি হয়ে নেব, হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, খপ করে উঠে দাঁড়াল বটুক। হাফপ্যান্টের পকেট থেকে নোটটা বার করে বললে : লেন, ইটো ধরেন !

চমকে গেলাম : কেন্‌, কী হয়েছে ?

—বাবার থানে মিছা কথা বুলেছিলেন আপনি। আপনি বামুন। আপনার গলায় পৈতা আছে !

গলাটা ভারী হয়ে এসেছে বটুকের। তার কিশোর দৃষ্টিতে অভিমান, ঘৃণা, না ক্রোধ কী ছিল জানি না—আমি তাড়াতাড়ি এসে ওর হাত দুটো ধরে বলি : বটুক, শোন আমার কথা।

—না। শুনবক নাই। ছাড়ি দিন আমারে।

জোর করে বসিয়ে দিলাম ওকে আমার পাশে : না শুনতেই হবে তোমাকে। শোন, কেন মিছা কথা বলেছিলাম। রাজগীরের নাম শুনেছ ? নালন্দার কাছে রাজগীর ? সেখানেও এরকম গরম জলের কুণ্ড আছে। সেখানে অ-হিন্দুদের স্নান করতে দেওয়া হয় না। আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে বক্রেশ্বরের উন্নতি করতে। আমি জানতে চেয়েছিলাম—বিদেশী সাহেবদের জন্য ভালো নাইবার ব্যবস্থা করলে পাণ্ডারা আপত্তি করবে কি না। তাই নিজেকে খৃষ্টান বলে পরিচয় দিয়েছিলাম। আর তা ছাড়া এ বছর আমার মা মারা গেছেন। আমার কালাশৌচ চলছে। তীর্থস্থানে সঙ্কল্প দিয়ে পূজা করার অধিকার আমার নেই। তুমি এক কাজ কর, এই টাকা কটা তোমার দাদুকে দিয়ে বল, কাল যেন তাঁর নিজের নামে সঙ্কল্প করে বাবা বক্রেশ্বরের পূজা দেন। আমার মিছে কথা বলার পাপ তাতেই ক্ষয়ে যাবে।

কোথাও কিছু নেই, খপ করে বটুক আমার পায়ের ধুলো নিলে।

রাত ন'টায় এল জীপ। মালপত্র তুলে জীপে উঠতে যাব, চৌকিদারটা বললে : জারা সে ঠার যাইয়ে।

বটুকের হাত ধরে লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন অশীতিপর বৃদ্ধ একানে ভট্টাচার্য।

—কী আশ্চর্য ! আপনি আবার এত রাত করে ?

বৃদ্ধ প্রাক্তন-পূজারী আমার হাত দুটি ধরে বললেন : পঁয়ষট্টি বছর ধরি পূজারীর কাজ করছি বাবুমশায়—কখনও কোন যাত্রীরে কটু কথা বলি নাই। পাণ্ডার পয়সা কেউ দিছে, কেউ দেয় নাই। আমি রা কাটি নাই। আজ আমার মতিভ্রম হই গেল। আপনি যাত্রী। আপনি অতিথি—আমি আপনারে কটু কথা বুললাম। আপনার কাছে ক্ষমা না চায়ি নিলে উ-পারে গে কৈফিয়ৎ কী দেব ?

আমি ব্যস্ত হয়ে বলি : না-না, সেকি !

—আমাদের কাল গিছে বাবুমশায়। কতই তো দেখলাম। দু-দুটা যুদ্ধ দেখলাম, মহামারী দেখলাম, দুর্ভিক্ষ দেখলাম—বক্রেশ্বরের মন্দিরের উত্তর-পুবে গোটা গাঁ উঠতে দেখলাম। কুমোরদের গাঁ। গোটা গাঁ উজাড় হই গেল। উপীন, যগন্দ, রাখহরি—কই গেল সব কে জানে ! কুমোর পাড়ার ভাঙা খোলামকুচি শুধু পড়ি আছে আজও ! এখন নূতন যুগ আসিছে।

দ্যাশ স্বাধীন হইছে। বানান, যাত্রিশালা বানান, বিজলি বাতি আনেন, রাস্তাঘাট বাজার বানান। আমার পাগলাবাবার নূতন খেলটো দেখি যাই যাবার আগে।

আমাকে বিদায় জানিয়ে বক্রেশ্বরের অতীত ও ভবিষ্যৎ চলে গেল মন্দিরের দিকে হাত ধরাধরি করে। পাগলাবাবা বক্রেশ্বরের মন্দিরের দিকে মিলিয়ে গেল ওদের দেহ। শুধু অন্ধকারের মধ্যে দুলতে থাকে বটুকের হাতে লণ্ঠনের মৃদু আলো।

বীয়ারকুল থেকে দীঘা

আজকের তমলুকের সঙ্গে প্রাচীন তাম্রলিপ্তের যেটুকু নাড়ির যোগ আজকের দীঘার সঙ্গে অষ্টাদশ-শতাব্দীর বীয়ারকুলের রক্তের সম্পর্কটা ছিল তার চেয়েও নিকট। রামনগর খাল, দীঘা মোহনা, বীরকুল পরগণার পরিচয় থেকে মনে হয় যে, আজকের দীঘা আর সেদিনের বীয়ারকুলের ভৌগোলিক অবস্থান অভিন্ন। বোধ করি কথাটা খুব স্পষ্ট হল না। তার কারণ বীয়ারকুলের কথা আমরা জানি না। বারকুল মৃত। কেমন করে সেই মৃত বারকুলের বুকে জন্ম নিল আধুনিক দীঘা, তারই সন্ধান নিচ্ছিলুম জাতীয় গ্রন্থাগারে বসে। ঘাঁটাঘাঁটি করছিলুম প্রাচীন নথীপত্র।

ক্যারীসাহেবের Hon'ble John Companyতে পাচ্ছি : 'হিজলী (Hidgelee) থেকে অনতিদূরে এই সমুদ্রসৈকতটির নাম বারকুল (Burcool)। 1780 থেকে 1785 সালের মধ্যে এই স্থানটি 'কলকাতার ব্রাইটন' নামের খেতাব পেয়েছিল। সে সময়ে সেখানে অনেকগুলি বাঙলোবাড়ি ছিল—অবসর যাপনের উদ্দেশ্যে অনেকেই সেখানে যেতেন। তারপর কেন জানি না এই সমুদ্রসৈকত ক্রমশ সম্পূর্ণ জনশূন্য হয়ে পড়ে। 1823 সাল-তক্ সেখানে একটি মাত্র বাঙলো খাড়া ছিল। এ বাঙলোটি ওয়ারেন হেস্টিংস তৈরি করেন।

মহাকালের ইতিবৃত্তে এ কিছু নূতন কথা নয়। তিনি গড়তে গড়তে ভাঙছেন, এবং ভাঙতে ভাঙতে গড়ছেন। তবু কেন যেন সন্দেহ হয়। এ কিছু পাঁচ-সাতশ-হাজার বছরের কথা নয়। ওয়ারেন হেস্টিংস তো কালকের ছেলে! তাঁর আমলের সারি সারি বাঙলোবাড়ি বেমালুম না-পাত্তা? কিন্তু স্থানটা সমুদ্রসৈকত। নিরন্তর ঝোড়ো হাওয়ায় এখানে নূতন নূতন বালিয়াড়ি রাতারাতি মাথা তোলে, যেখানে ছিল পাহাড় সেখানে দেখা দেয় খানা-খন্দ। তাছাড়া সমুদ্রও এগিয়ে আসছে গুটিগুটি। সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তার। হয়তো বীয়ারকুল সৈকতের যে উঁচু টিলায় ওয়ারেন হেস্টিংস বাঙলো বানিয়েছিলেন এখন সেটি সমুদ্রগর্ভে।

তা আজকের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, আমার তো সন্দেহ হয় 1823-তক্ সে বাঙলোটি খাড়া ছিল কিনা। কারণ দেখছি চার্লস চ্যাপম্যান 1796 সালেই একটি 'বেল-লেৎর'-এ লিখছেন : গত গ্রীষ্মের কটা দিন আমরা বীয়ারকুলে কাটিয়ে এলুম। এ সেই বীয়ারকুল যেখানে তুমি আর মিসেস হেস্টিংস একবার অভিযানে গিয়েছিলে। স্থানীয় লোকেরা তোমাদের জন্য তৈরি করা 'বাঙলোর ছাদটি এখনও দেখায়। কিন্তু ঐটুকুই মাত্র অবশিষ্ট আছে।'

দীঘা থেকে মাইল-পাঁচেক উত্তরে ছোট্ট গ্রাম—নাম বালিসাই। এখানকার ভুঁইয়া জমিদার সেকালে বেশ বর্ধিষ্ণু ছিলেন। কিম্বদন্তী—ওয়ারেন হেস্টিংস সদলবলে একবার বীয়ারকুল যাওয়ার পথে বালিসাইয়ের কাছাকাছি কাদায় আটক পড়েন। ভুঁইয়া জমিদার তাঁর হাতি

পাঠিয়ে লাটবাহাদুরকে বিপদমুক্ত করেছিলেন। প্রতিদানে লাট-সাহেব জমিদারকে উপহার দিয়েছিলেন একটি ট্রিগার কামান এবং একটি বিখ্যাত চিপেন্ডাল খানা-টেব্‌ল। এ দুটি এখনও আছে।

ওয়ারেন হেস্টিংস-এর রচনাও হাতড়েছি। কোন পথে তাঁরা আসতেন? পথের কী বিবরণ? হাতড়াতে হাতড়াতে পেয়ে গেলুম মিসেস হেস্টিংসকে লেখা তাঁর চিঠি: 'বীয়ারকুল একটি স্বাস্থ্যাবাস—কলকাতার ব্রাইটন বলা যায় তাকে।'

দীঘাসৈকতের ভূমি-নকশা, ষাটের দশকে

1 ডাক বাঙলো, সেচ বিভাগ
2 স্নেইথ-সাহেবের কুঠি
3. টিলার উপর চতুষ্কোণ পাথর
4 ডাক-বাঙলো, পূর্ত বিভাগ
5 সৈকতাবাস (অসমাপ্ত)
6 যাত্রী কুটির
7. মেরিন কর্‌মোমান রিসার্চ ইন্সট্যুট
8 টুরিস্ট লজ (অসমাপ্ত)
9. অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের অফিস (অসমাপ্ত)
10.. নাড়াজোল প্রাসাদ
11. বাজার ও বে-কাফে
12. যাত্রীশালা
13. কাফেটেরিয়া
14. যাত্রী কুটির
15. অঘোর কামিনী স্বাস্থ্যকেন্দ্র
16. ডাক-বাঙলো, বনবিভাগ
17 চীপ ক্যানটিন, সাধারণ যাত্রী নিবাস
18. বনবিভাগের আপিস

খবরের কাগজে আর কাউন্সিলের নথীপত্রে ক্রমাগত নজরে পড়ে—অমুক অমুক স্বাস্থ্যের সন্ধানে বীয়ারকুলে গেছেন। এ অঞ্চলে নানাজাতীয় শিকার আর মাছ ধরার সুযোগ আছে শুনেছি। 1780 সালের মে সংখ্যায় বেঙ্গল গেজেট একটি পরিকল্পনার কথাও প্রচার করছে—বীয়ারকুলকে একেবারে আধুনিক-ঢঙে ঢেলে সাজাবার। "এ সৈকতের কতকগুলি প্রাকৃতিক সুবিধা এমনিতেই আছে। বেলাভূমি প্রশস্ত, গাড়ি চালানো যায়। পৃথিবীতে গাড়ি

চালানোর উপযোগী যত সমুদ্র-সৈকত আছে বীয়ারকুল তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এ ছাড়া উপদ্রবকারী জন্তুজানোয়ার একেবারেই নেই বলা চলে—একমাত্র ব্যতিক্রম বোধ করি কাঁকড়া...." কাঁকড়া! হ্যাঁ, তা আছে বটে। কাঁকড়ার কথায় মনে পড়ে গেল সেবারকার দীঘা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা।

গত বছরের কথা। দীঘাতে সমবেত হয়েছেন গণ্যমান্য অতিথিবৃন্দ। মন্ত্রীই আছেন সাত-আটজন। এমনকি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। কাঁধে-ক্যামেরা সাংবাদিকের দল ক্রমাগত ঘোরাফেরা করছেন। উদ্দেশ্য মহৎ এবং সনাতন। ওয়ারেন হেস্টিংসের ভাষায়--'দীঘাকে একেবারে আধুনিক-ঢঙে ঢেলে সাজাবার আয়োজন।' অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অরুণ চাটুজ্জে মশায়ের চেহারাটা বরযাত্রীর অপ্রত্যাশিত সংখ্যাধিক্যে বিব্রত গ্রাম্য কন্যাকর্তার মত। চোখ লাল, চুল উস্‌কো-খুসকো—যেন 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' নাটকে নাম-ভূমিকার মেক-আপ। দীঘা যদিচ দিল্লির মিষ্টান্ন-বিশেষের উপমান নয়, তবু যাঁরা দীঘাকে চোখে দেখেছেন এবং যাঁরা দেখেননি তাঁরা সবাই জানেন, দীঘায় সব চেয়ে দুর্লভ বস্তু হচ্ছে মাথার উপর একখানা ছাদ। ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা। ছোট্ট দীঘা-শহরের অবস্থা সেদিন অফিস-টাইম এক্সপ্রেস-বাসের মত। ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী! আমার বড়কর্তা যেতে পারলেন না। কাগজপত্র বগলে যেতে হল আমাকেই। বোতাম-আঁটা জামার নিচে শান্তিতে শয়ান প্রাণটুকু মুঠোয় নিয়ে দীঘায় এসে পৌঁছালুম। কিন্তু রাখে কেষ্ট মারে কে? আলাপ হয়ে গেল শার্দুল সিং তেওয়ারীজীর সঙ্গে। দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলের মানুষ—বাঙলা সরকারের সেবা করছেন দীর্ঘদিন। অমায়িক সরল শান্ত ভদ্রলোক। নামেই শার্দুল--অবয়ব অতি মোলায়েম, ব্যবহার ততোধিক প্রাণ-জল! কথাবার্তায় জানা গেল তিনি আমার দাদার সহপাঠী। বলেন—বেশক্! আপনি অমুকের ভাই আছেন, তো হমারও ভাই লাগছেন। আপনি হমার ঘরে শুবেন। দো চারপাই ভি আছে। একঠো হমার, একঠো আপনার।

অবাক হয়ে বলি : সে কী! আপনার ঘরে দ্বিতীয় সীট এখনও খালি? এত ভিড়েও? শার্দুলজী বলেন : হমার নাম শার্দুল আছে না! শেরের সাথে এক ঘরে শুবার হিম্মৎ চাই!

বলেই হাহা করা হাসি!

আমি ভাবছিলুম--এমন অমায়িক পরোপকারী ভালমানুষের নাম কে দিয়েছিল শার্দুল! যাই হোক তাঁর আতিথ্যই মেনে নিলুম। করিৎকর্মা লোক। নিজেই হাঁকা-হাঁকি করে লোক ডেকে আমার বাক্স-বিছানা নিয়ে গেলেন ঘরে। বললেন—খানা ভি হমার সাথে—

আমি ইতস্তত করছি দেখে আবার বলেন—বেশক্! আপনি ঘবড়াইবেন না। হমরা টেম্পরারি মেসিং খুলিয়েছি। আপনি ভি মেম্বার আছেন।

ঠাণ্ডা-মাথা কাজের লোক তেওয়ারীজী। ঘরের সর্বত্র ফাইলের স্তূপ। সাময়িক টেলিফোন বসেছে ঘরে। ক্রমাগত কল আসছে। আসছে পিয়ন, আসছে আদেশ, আর আসছে ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা। গায়ে সামার-কুল গেঞ্জি। পরিধানে নীল লুঙ্গি, হাতে ধূমায়িত সিগারেট—তেওয়ারীজী নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। আগামীকাল মিটিং—দীঘা-উন্নয়ন পর্ষদের। মিটিং-এর আগেই কাগজপত্র তৈরি হওয়া চাই। দুজন টাইপিস্ট বসেছে সমুদ্র-গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিতে।

আমার হাতে কাজ নেই। নেহাত বেকার। কাল মিটিং-এর সময় একপায়ে খাড়া থাকতে হবে। ডাক-পড়া মাত্র দাখিল করতে হবে নক্‌শা অথবা খরচের খতিয়ান। সৈকতাবাসই

মুখ্য আলোচ্য বিষয়। আমারই নক্‌শা—তার ফিগার আমার ঠোঁটস্থ। চুপচাপ বসে না থেকে তেওয়ারীজীকে এক-আধটা সাহায্য করছি। যোগের টোটাল দিয়ে দিচ্ছি। টাইপ কাগজের বানান দেখে দিচ্ছি। পৌঁচেছি অপরাহ্নে। সন্ধ্যায় সমুদ্রের ধারে একটু বেড়াতে যাবার ইচ্ছে ছিল—কিন্তু তেওয়ারীজীকে কাগজের সমুদ্রে নিমজ্জমান দেখে সে ইচ্ছা দমন করলুম। রাত্রে ভূরিভোজনের আয়োজনটি ছিল পরিপাটি। আহারান্তে একটু গল্পগুজব করা গেল। তারপর রাত দশটা নাগাদ শুয়ে পড়ি দুজনে বাতি নিবিয়ে।

শুয়ে শুয়ে ভাবছি ঐ একই কথা। ভদ্রলোকের নামটা বড় বেমানান। গল্প-উপন্যাসে নামকরণের সময় আমরা খেয়াল রাখি নামটা যেন চরিত্রের সঙ্গে ঠিক খাপ খায়। কাল্পনিক চরিত্রের নামকরণটা যেন বাস্তবানুগ হয়। সে প্রচেষ্টায় বিড়ম্বিতও হয়েছি। দেখা গেছে ঐ কল্পিতনামের বাস্তব মানুষ সত্যিই আছে সেই পরিবেশে। ভগবানও একজন কাহিনীকার—তাঁর কি এটুকু সেন্স নেই? জন্মমুহূর্তে যার বাপ-মা পুত্রের নামকরণ করলেন শার্দুল—তার চরিত্রটা ডেভেলপ করবার সময় কিছু বাঘা-বাঘা বিশেষণ প্রয়োগ করতে হবে না? আর কিছু না হোক নামের খাতিরে একজোড়া আশু-মুখুজ্জে মশায়ের মত গোঁফ দিলেও তো পারতেন? এই সব ভাবতে ভাবতে কখন নিদ্রায় দুটি চোখের পাতা জড়িয়ে এসেছে—হঠাৎ একটা বিকট শব্দে ধড়মড়িয়ে উঠে বসি খাটের উপর। এ কী! এ কিসের শব্দ? বাঘ! দীঘায় বাঘ আছে না'কি? কিন্তু আজ এই ভিড়ে সে-ব্যাটাই বা পথভুলে এ পাড়ায় আসবে কেন? শব্দটা ক্রমশই বাড়ছে। হাত বাড়িয়ে আলোটা জ্বালি। মুহূর্তে আলোকিত হয়ে গেল সমস্যাটা। শুধু শব্দের উৎপত্তিস্থলই নয় সেই সঙ্গে উপলব্ধি করলুম ভদ্রলোকের নামের যৌক্তিকতা। মনে মনে প্রণাম করলুম বিশ্বনিয়ন্তাকে। তিনি কাজ করে যান গোপনে গোপনে। শব্দটা আসছে গভীর নিদ্রামগ্ন শার্দুল সিংজীর নাসিকা-গহ্বর থেকে!

ডাকলুম তাঁকে। উঠে বসলেন। বললুম—আপনি বোধ হয় বেকায়দায় শুয়েছেন।

ঘুম-জড়ানো দুটি রক্তচক্ষু মেলে তেওয়ারীজী বলেন,—জী হাঁ, তাই ঘুম আসছে না। তামাম রাত বিলকুল জাগতে হোবে—বহুৎ গরমি!

বলেই তিনি পদ্মনাভ হলেন এবং তৎক্ষণাৎ তামাম রাত কীভাবে জাগবেন তার সগর্জন প্রমাণ দিতে শুরু করলেন—'গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী!'

ক্লান্তিতে দু-চোখ জড়িয়ে আসছে আমার। ধকল তো কম যায়নি সারাদিন। কিন্তু ঘুমাবার উপায় নেই। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম—কাঁটা দুটো আমারই মত যুক্তকরে নমস্কার করছে বিশ্বনিয়ন্তাকে—নামের যাথার্থ্য রক্ষা করতে কী সূক্ষ্ম হাতের কাজ! রাত বাড়ছে। চারিদিক নিষুতি। শুধু জেগে বসে আছি আমি। রাত একটা নাগাদ বেরিয়ে পড়ি ঘর ছেড়ে। বগলে বালিশ আর চাদর। আশপাশে যতগুলি বাড়ি তার বারান্দা ঘুমন্ত মানুষে উপচীয়মান। অগত্যা হাঁটতে হাঁটতে চলে এলুম রোডস্-বাঙলোর সামনে। রাস্তার উপর সারি সারি ঝিমন্ত গাড়ি। ভাবলুম ওরই কোন একটার গর্ভে বাকি রাতটুকুর জন্য আশ্রয় নিই। বেশ একটা বড় সিডানবডি গাড়ির হাতলে হাত দিয়েছি কি দিইনি—হাঁ হাঁ করে, ছুটে এল আরক্ষাপুঙ্গব। চোর দায়ে ধরা পড়লুম শেষে। তখন লক্ষ্য হল গাড়ির বনেটে ছোট্ট একটা তেরঙা পতাকা। কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলি—"ঐ ঘরে আমার সীট, কিন্তু ঘরের কাছে গিয়ে জেনে এস কেন

রাত কাটাতে এসেছি এখানে।"

সেপাইটি অমায়িক। জানলার কাছে গিয়ে কী যেন শুনে ফিরে এল। বললে—বুঝেছি, স্যার। আমাকেও এ বিপদে পড়তে হয়েছে। আমাদের বড় দারোগাবাবুর যেমন নাক ডাকে তেমনই ভূতের ভয়। একা ঘরে শুতে পারেন না। কত রাত যে মেঝেয় শুয়ে জেগে কাটিয়েছি।

মনে মনে ধন্যবাদ দিলুম ভূতভীত বড় দারোগাবাবুকে। তাঁরই দয়ায় আজ সেপাইজীর এই দরদী মনোভাব। সেপাইজী বললেন—কিন্তু এ গাড়িতে নয়,স্যার, আপনি বরং ঐ স্টেশন ওয়াগনে গিয়ে শুয়ে থাকুন। অত নাক ডাকায় ঘুমাতে পারবেন না।

স্টেশন-ওয়াগন তো ভাল, ময়লা-ফেলা গাড়ি পেলেও তখন আমি রাজি। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, ঘুম আজ বরাতে নেই। প্রচণ্ড মশার আক্রমণে আবার উঠে পড়তে হল। রাত দেড়টা নাগাদ। ভাবলুম—সমুদ্রের ধারে তো নিরন্তর ঝোড়ো হাওয়া বইছে—সেখানে অন্তত মশার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। বালিশ-চাদর বগলে—গুটিগুটি গিয়ে হাজির হলুম সমুদ্র-সৈকতে।

সুদীর্ঘ দীঘা সৈকত সম্পূর্ণ নির্জন। রাত তখন দুটো। আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই। কৃষ্ণপক্ষের রাত। এক-আকাশ তারা। বে-কাফের কাছাকাছি একটিমাত্র জোরালো বাতি। কিন্তু দিগন্ত-জোড়া অন্ধকারের সঙ্গে পাল্লা দিতে সে রাজি নয়। একপায়ে খাড়া বিজলি-বাতির আলোয় একমুঠো সমুদ্র আলোকিত হয়েছে মাত্র—বাদবাকি আঁধারের রাজত্ব। ঢেউয়ের মাথায়-মাথায় শুধু আবছা সাদা ফেনা। দুটি খঞ্জন সেই গভীর রাত্রেও বালির উপর পুচ্ছ নাচিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে।

বালির উপর চাদর বিছিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ি। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন কালো রঙের একটা যবনিকা উঠে গেল আমার দৃষ্টির সামনে থেকে। মনে হল দিগন্ত অনুসারী একটা কালো ক্যানভাসে কে যেন একটা অদ্ভুত ইঙ্গিতধর্মী ছবি এঁকেছে। সে ছবির সবটা বোঝা যায় না, কিন্তু অনেক কিছু যে বোঝা যায় না তা বোঝা যায়! রাত্রের অন্ধকারে আকাশ আর সমুদ্র হারিয়েছে তাদের পৃথক সত্তা। মনে হল এই নির্জন রাত্রির দুর্লভ মুহূর্তটির জন্য যেন আমি দীর্ঘ তীর্থপথ অতিক্রম করে এসেছি। ঘুম-না-আসা বিনিদ্র রাত্রি তো এই আমার প্রথম নয়। আসন্ন পরীক্ষার দুর্ভাবনায়, রোগাক্রান্ত আত্মীয়ের শয্যাপার্শ্বে—কিছু না-হোক গভীর রাত্রি পর্যন্ত কলম-চালানোর মানসিক উত্তেজনায় কত রাত এমন করে জেগে কেটেছে। সমুদ্রকেও আজ কিছু প্রথম প্রেমের দৃষ্টিতে নূতন দেখছি না। বিভিন্ন সৈকতে, বিভিন্ন ঋতুতে তার সঙ্গে মোলাকাত ঘটেছে। তবু বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যন্ত চেনামানুষকেও যেমন মাঝে মাঝে মনে হয় অচেনা, অজানা—বাহুবন্ধনে-আবদ্ধ আটপৌরে গৃহলক্ষ্মীকেও যেমন হঠাৎ মনে হয় অধরা, রহস্যময়ী—তেমনি যেন চিরচেনা সমুদ্রকে দেখে আজ মনে হল—কৈ, এর এ রূপ তো আগে নজরে পড়েনি। স্পষ্ট অনুভব করলুম ওর তরঙ্গ ভঙ্গিমার সঙ্গে আমার অন্তরের একটা নিবিড় যোগ আছে। আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনছন্দের সঙ্গে ঐ বীচিভঙ্গের একটা ঐকতান আছে। ও-যেন আমি-ছাড়া নয়। ঠিক কী যে মনে হল বুঝিয়ে বলা শক্ত—কিন্তু অন্তর দিয়ে বিরাটের এক ব্যঞ্জনাকে যেন অনুভব করলুম। সে ব্যঞ্জনা শুধু সমুদ্রের মধ্যেই

সীমিত নয়—মাথার উপর ঐ সিগ্‌নাস নক্ষত্রমণ্ডলের হংসবলাকার পাখার স্পন্দনেও যেন সেই একই সুর, একই ছন্দ—ডেনেব-নক্ষত্রের অদূরেই জ্বলছে অভিজিৎ, স্বর্গীয় বীণার ঝঙ্কারেও সেই একই রেসনেন্স্! এমন একটা অবাক-রাত্রি আসেনি আমার জীবনে।

আবেশে কখন মুদে এসেছে দুটি চোখ—হঠাৎ পায়ের কাছে সুড়সুড়ি লাগায় চমকে উঠে বসি। এ আবার কী! স্বপ্ন দেখছি নাকি! অসংখ্য কাঁকড়া এসে ঘিরে ধরেছে আমাকে। কুঁচফলের মত টুকটুকে কৌতূহলী লাল চোখ মেলে আমাকে দেখছে। শত শত নয়, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ কাঁকড়া। তড়াক করে উঠে বসলুম। ভাল করে চোখ মেলে তাকাতেই দেখি—আরে একি? কোথায় কাঁকড়া? নির্জন সমুদ্রতীরে একমাত্র আমিই প্রাণের প্রতীক। কাঁকড়ার চিহ্নমাত্র নেই—এমনকি আকাশেও নেই কর্কট রাশি।
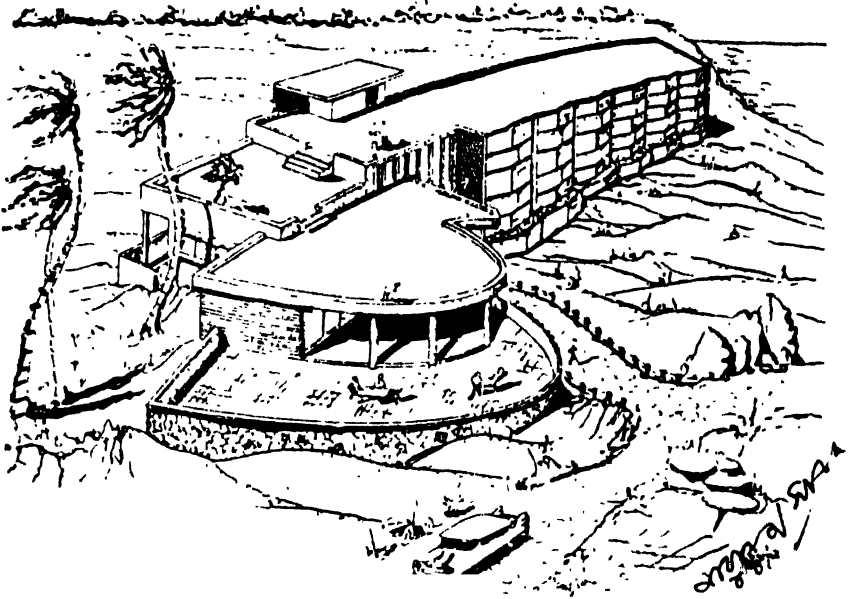
দীঘা টুরিস্ট লজ

স্বপ্নই দেখছিলুম তাহলে! কিন্তু এত স্পষ্ট? একটু পরেই বুঝতে পারি—না, ভুল দেখিনি। স্বপ্ন না, মায়া মতিভ্রম তো নয়ই—ন্যায্য কাঁকড়াই। অল্প কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকলেই লক্ষ লক্ষ কাঁকড়া বালির গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। ক্রমাগত ছোটাছুটি করছে, বালি খুঁড়ছে, রক্তচক্ষু কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে দেখছে এই অবাঞ্ছিত বহিরাগতকে। আবার একটু নড়ে-চড়ে উঠলেই নিমেষে উধাও হয়ে যাচ্ছে তারা—বালির গর্তে।

বুঝলুম—আজ রাতে ঘুম নেই বরাতে। জেগেই কাটাতে হবে বাকি রাতটুকু। অবশ্য অল্পই বাকি আছে সে অধ্যায়ের। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি রূপ বদল হয়েছে তারার বাসরে। পশ্চিমাকাশে শ্রবণা সমুদ্র ছুঁইছুঁই করছে। ব্রহ্মহৃদয় উঠে এসেছে পূর্ব দিগন্ত ছেড়ে। মাথার

উপর অ্যান্ড্রোমেডা। আকাশ এত স্বচ্ছ যে, মনে হয় হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারি ঐ অ্যান্ড্রোমেডার নীহারিকাটিকে!

ক্রমে আলো ফুটে উঠল পূর্বদিগন্তে। একটি আশ্চর্য রাত্রির দুর্লভ অভিজ্ঞতা মনের মঞ্জুষায় গেঁথে রেখে প্রণাম করলুম নূতন দিনের প্রভাত সূর্যকে!

এ খণ্ড-কাহিনীর এখানেই শেষ। সকালবেলা ঘরে ফিরে দেখি শার্দুলজী তখনও শয্যাত্যাগ করেননি। আমার পদশব্দে চোখ না খুলেই বলেন—মর্নিং ওয়াক হল?

কেমন করে তাঁর নজর এড়িয়ে বগলে-চাপা বালিশ নিজের বিছানায় পাচার করেছিলুম সে কথা এখানে অবান্তর।

কী কথা থেকে কী কথায় এসে পড়েছি। কথা হচ্ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর হারিয়ে যাওয়া বীয়ারকুলকে নিয়ে। কলকাতার কুঠিয়ালের বড় বড় সাহেব-বিবি সেখানে আসতেন, ঘোড়ায়, নৌকায়, পালকিতে। প্রবাসী ইংরাজের চোখে এ সমুদ্র-সৈকত ব্রাইটনের স্মৃতি জাগিয়ে তুলত। বালিয়াড়ির উপর গড়ে উঠেছিল সারি সারি বাঙলোবাড়ি। সদলবলে যখন ওঁরা আসতেন তখন সমুদ্রতীর কলরব-মুখরিত হয়ে উঠত। মাছ-ধরা, শিকার, নাচ, আর মদের ফোয়ারা ছুটত। কী আশ্চর্য, রাজানুগ্রহ লাভ করা সত্ত্বেও সে বীরকুলের আজ চিহ্নমাত্র নেই। কেন নেই? উনবিংশ শতকেই কেন এখানে গড়ে ওঠেনি নতুন শহর? আধুনিক স্বাস্থ্যাবাস? আর পাঁচটা জনপদ যেভাবে গড়ে ওঠে?

'—হয়তো প্রাকৃতিক দুর্যোগে মুছে গেছে সমুদ্র-সৈকতের সে জনপদ', বললেন শ্রী চট্টোপাধ্যায়। অরুণবাবু। দীঘার বর্তমান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। কথা হচ্ছিল দীঘাতেই। গল্প বলছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতার।

দীঘাতে উনি প্রথম আসেন আটচল্লিশ সালে। সরকারী অফিসার হিসাবে অবশ্য নয়। একবেলা মাত্র ছিলেন। ওঁর যতদূর মনে পড়ে দুখানি মাত্র পাকাবাড়ি দেখেছিলেন সে সময়। একটি সেচবিভাগের ডাকবাঙলো, অপরটি স্নেইথ-সাহেবের কুঠি। বললেন—স্নেইথ সাহেবকে সেবার দূর থেকে দেখেছিলাম মাত্র। আলাপ হয়নি। দেখেছিলাম নির্জন বালিয়াড়ির উপর হ্যাট মাথায় একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন একজন সাহেব—সঙ্গে একজোড়া অ্যালসেশিয়ান।

প্রশ্ন করলুম—স্নেইথ-সাহেবটি কে?

বললেন—লিভিংস্টোন অফ দীঘা।

সব খুঁটিয়ে শুনলুম। বিংশ শতাব্দীতে নূতন করে দীঘাকে আবিষ্কার করার কৃতিত্ব যে কয়জনের প্রাপ্য, স্নেইথ-সাহেব তাদের ভিতর আজও আছেন আমাদের মধ্যে। খাঁটি ইংরেজ। বর্তমান বয়স বিরাশী। বিখ্যাত হ্যামিলটন কোম্পানির কাউন্টার সেলসম্যানরূপে কালাপানি পার হয়ে ভারতবর্ষে যখন তিনি প্রথম আসেন, তখন এ শতাব্দী সবে চোখ মেলে তাকিয়েছে। কুশাগ্রধী কর্মঠ মানুষ। বছর দশ-বারোর মধ্যেই হয়ে পড়েন কোম্পানির অপরিহার্য অঙ্গ। শুধু ভারতবর্ষই নয়, পৃথিবীর এই পূর্বপ্রান্তে বিংশশতাব্দীর প্রথম পাদে হেন ধনকুবের কেউ ছিল না, যার সঙ্গে হ্যামিলটন কোম্পানির এই বড়-সাহেবটির সম্পর্ক হা-ডু-ডুর চেয়ে নিকটবর্তী না হয়েছিল। কত রাজা-মহারাজা-নবাব-শেঠ-শাহ্ এর সঙ্গে হীরে-জহরতের হাত-ফিরি করেছেন। ব্যারাকপুরে গঙ্গার ধারে তৈরি করিয়েছিলেন বিরাট বাগানবাড়ি। সপ্তাহান্তে

সেখানে প্রমোদভ্রমণের আয়োজন হত। পালতোলা প্রমোদতরী ভাসত গঙ্গার বুকে।

উনিশ শ' বাইশ-তেইশ সাল হবে। ব্যারাকপুরের বাগানবাড়িতে নৈশ ভোজের আসরে কে যেন কথাটা তুললেন—চল, একটু আউটিং করে আসা যাক। আউটিং? তা বেশ। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়? ম্যাকেঞ্জি কোম্পানির বড়সাহেব বললেন-ভাল কথা। আমাদের ওভারল্যান্ড 91 নূতন মডেল গাড়িগুলো সবে এসেছে। এঞ্জিনিয়ার বলছে এর চেয়ে কষ্টসহিষ্ণু মজবুত গাড়ি নাকি আজ পর্যন্ত কেউ বানাতে পারেনি। খুব একটা দুর্গম রাস্তার নাম করুন দেখি। একবার বাজিয়ে নিই গাড়িটা।

নৈশভোজে উপস্থিত ছিলেন মিস্টার জেনকিন্স। বলেন—ওয়ান্ট এ ন্যাস্টি রোড? দেন ড্রাইভ হেডলং টু বীয়ারকুল।

—বীয়ারকুল! সেটা আবার কোথায়?

জেনকিন্স বলেন, সেদিন পুরানো নথীপত্র ঘাঁটছিলাম। হিকির গেজেটে দেখলাম কলকাতার কাছেই আছে বীয়ারকুল—দ্য ব্রাইটন অফ ক্যালকাটা!

সবাই কৌতূহলী হয়ে ঘনিয়ে আসে। জেনকিন্স বলেন: দাঁড়াও আমার ডায়েরিতে নোট করা আছে। দেখাই তোমাদের।

আনা হল গাড়ি থেকে সাহেবের নোটবই। জেনকিন্স পড়ে শোনালেন:

Hicky's Gazette, May 1780 : We are informed that the following Persons of figure and consequences arrived at Beercool for the benefit of their health and fish : Henry Grant Esq., and lady, and brother-in-law. Major Camac, Capt. Robinson of the Vellow, Dr. Allen (lately returned from Europe), Simeon Dronge Esq., with his lady and son and heir, Miss Burne, an extremely elegant and agreeable young lady.

স্নেইথ কৌতুক করে বলেন, কিন্তু খবরটা সংগ্রহ করতে বড্ড দেরি করে ফেললে যে জেনকিন্স। সুন্দরী মিস বার্নের সমুদ্রস্নান বোধ করি এতদিনে শেষ হয়ে গেছে।

গ্রীনফিল্ড হেসে বলেন—তা ঠিক। স্নান সারা না হয়ে থাকলেও লাভ নেই। ইতিমধ্যে তাঁর বয়স আরও দেড়শ বছর বেড়ে গেছে। এখন আর সেই এগ্রিয়েবল্ মিস বার্নে তোমার কোন প্রপোজালে এগ্রি করলেও লাভ নেই—

ঘরসুদ্ধ সবাই হোহো করে হেসে ওঠেন। উত্তর-চল্লিশ স্নেইথ সাহেব সেদিন ছিলেন অকৃতদার যুবক। তা সে যাই হোক, আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে কোন এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল পনেরই অক্টোবর দুখানি ওভারল্যান্ড 91 গাড়িতে রওনা হয়ে পড়লেন ছয়জন উৎসাহী ইংরেজ। দলপতি এইচ গ্রীনফিল্ড, জে জেনকিন্স, জে এফ স্নেইথ, মিস্টার রিচ বীচক্রফট এবং তদানীন্তন বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিক ইংলিশম্যানের একজন সাংবাদিক। পথ যে এত দুর্গম তা ওঁরাও আন্দাজ করতে পারেননি। কিন্তু কঠিন উৎসাহ অভিযাত্রীদলে—কঠিনতর জান ওভারল্যান্ড গাড়ির। জগন্নাথের রথের রশিতে সাদাকালোর ভেদ নেই। একহাঁটু কাদায় নেমে মটোরগাড়ি ঠেলছে লালমুখো সাহেব আর নেংটি-সার গাঁয়ের লোক। ইংলিশম্যানে এ অভিযানের একটি বিবরণী বার হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ওঁরা এসে পৌঁছালেন দীঘায়। সেখানে তখন তাঁরা একটিমাত্র পাকাবাড়ি দেখতে পেয়েছিলেন—সেচবিভাগের

ডাকবাঙলো। বর্তমান কালের স্নো-সেমিত দ্বিতলবাড়িটির সঙ্গে সেদিনকার সেই ছোট্ট দু কামরা বাঙলোর প্রভেদ দুস্তর। স্লেইথ-সাহেবের জীর্ণ অ্যালবামে পীতাভ আলোকচিত্র দেখে তবু বুঝতে পেরেছিলাম এই সেই। সমুদ্র উপকূলে বাঁধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দীর্ঘদিন পূর্বে এই বাঙলোটি তৈরি করিয়েছিলেন পূর্তবিভাগ—সিপাহী বিদ্রোহেরও আগে, বোধ করি 1848 খৃষ্টাব্দে।

স্লেইথ তখন চল্লিশের কোঠায়। অকৃতদার কর্মঠ যুবাপুরুষ। দীর্ঘ ক্লান্তিকর পথ অতিক্রম করে এসে সেদিন দীঘাকে তিনি কী চোখে দেখেছিলেন জানি না, কিন্তু প্রথমদর্শনেই তিনি সুন্দরী দীঘার প্রেমে পড়ে গেলেন। পল্লবগ্রাহী দর্শনেন্দ্রিয়ের মোহগ্রস্ত প্রেম নয়—নিবিড় ভালবাসা। অবিচ্ছেদ্য গ্রন্থি পড়ল তাঁর মনে। বীয়ারকুল নয়—দীঘা, সুইট দীঘা।

পরের বছর ঐ দুর্গম পথ অতিক্রম করে তিনি আবার এলেন দীঘায়। বালিয়াড়ির উপর বানালেন একটি ছোট্ট কুঁড়ে ঘর। অবসর পেলেই তিনি ফিরে ফিরে আসতেন সেখানে। কিন্তু নাঃ, কয়েক বছরের মধ্যেই খেয়াল চাপল দীঘাতে একটি পাকাবাড়ি বানাতে হবে। যে কথা সেই কাজ। প্রায় বাইশ বিঘা জমি নামমাত্র মূল্যে কিনে একটি দ্বিতল প্রাসাদ বানালেন। একদিনেই কিন্তু সবটা হয়নি ; কিন্তু উনিশ শ' পঁয়ত্রিশ সালের পর থেকে প্রতি বছরই তিনি বছরের কয়েকটা মাস এখানে কাটিয়ে যান। ক্লান্তিকর পথের তোয়াক্কা রাখেন না। একটি ছোট প্লেন আছে। সমুদ্র-সৈকতে অনায়াসে ওঠে এবং নামে।

চল্লিশ বছর আগে ওঁরা 'বীয়ারকুল, দি ব্রাইটন অফ ক্যালকাটার' চিহ্নমাত্র কেন খুঁজে পাননি ভাবছেন তো? সেদিনকার ইংলিশম্যান খুলে পড়লেই বুঝতে পারবেন। স্লেইথ সাহেবের অ্যালবামে পীতাভ বিবরণটি আমি দেখেছি। তদানীন্তন দীঘার যে বর্ণনা তাতে লেখা আছে তার তুলনায় সমুদ্র আরও এগিয়ে এসেছে মনে হয়। মনে হয় সেদিনের বীয়ারকুল আজ সমুদ্রগর্ভে। বনবিভাগ তাই সমুদ্রতীরে ঝাউগাছের সারি রোপণ করেছেন। শুনলুম, গত দশ বছরে সমুদ্র আর জমি গ্রাস করতে পারেনি। রাজা ক্যানিউট যা পারেননি বনবিভাগ নাকি তাই পেরেছেন।

এই প্রসঙ্গে দীঘায়-শোনা একটা গল্প মনে পড়ছে। বছর দুই আগের কথা। কলকাতার একজন নামকরা উকিল কয়েক দিনের জন্য সপরিবারে দীঘায় বেড়াতে এসেছেন। সকলেরই ভাল লেগে গেল জায়গাটা। অবসরপ্রাপ্ত জীবনে এখানে একটি ছোট্ট বাঙলোবাড়ি বানিয়ে বাস করলে মন্দ হয় না। উকিল-গিন্নী বলেন—দ্যাখো না গো, একটু খোঁজ করে, জমি পাওয়া যায় কিনা।

বেশি পরিশ্রম করতে হল না। উকিলবাবু হাঁ করবার আগেই হাঁহাঁ করে ছুটে এল একজন—গলায় কণ্ঠি, গালে আঁচিল, খাটো ধুতি, হাতে ছাতি, মুখে অমায়িক হাসি। বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললে—আমার নাম সাতকড়ি জানা আজ্ঞে (এখানে বলে রাখা ভাল নামটি কল্পিত। ঘটনাচক্রে দীঘাতে কোন বাস্তব সাতকড়ি জানার অস্তিত্ব প্রমাণিত হলে মনে করতে হবে এ চরিত্রটির নাম ভজগোবিন্দ বটব্যাল)। ঠাকুরের নাম পাঁচকড়ি জানা। হুজুর ঠিক যেমনটি চাইছেন ঠিক তেমনটি জমির সুলুক-সন্ধান জানা আছে আমার। তবে এই, হাট-বাজারের লাগ-বরাবর হবেনি।

উকিল-গিন্নী বলেন—সেতো আরও ভাল, একটু নিরিবিলিই খুঁজছি আমরা। হাট-বাজার ট্রাম-বাসের ভিড় এড়াতেই তো আসা এখানে—

উকিল-তনয়া বলেন—বাজার দূরে হ'ক ক্ষতি নেই, সমুদ্র থেকে কত দূর ?

—সে আপনি ভাববেননি মাঠান, এক্কেরে সমুদ্দুরের লাগ-বরাবর।

উকিলবাবু ধমক দিয়ে থামিয়ে দেন ওদের।—তোমরা থাম দেখি। ব্যাপারটা আমাকে বুঝে নিতে দাও। জমিটা কোথায়, কতটা জমি, মালিক কে ? শর্ত কী ? দাম কত চাইছে ? দলিলপত্র সব দেখাতে পারবে তো ?

হাত দুটি কচলে একগাল হেসে সাতকড়ি বলে—উকিলবাবুরে জমি বেচতি এইচি, দলিল দেখাবনি ?

লালশালু মোড়া কাগজের বাণ্ডিল খুলে সে ছড়িয়ে বসে। সব আছে। মূল দলিল, খাজনার দাখিলা, সেটেলমেন্টের নকশা, পর্চা, খতিয়ান—কী নেই ? অভিজ্ঞ উকিলবাবু কাগজপত্র উল্টেপাল্টে দেখেন—না কোন গোল নেই। গত বছরও এই নামে খাজনা জমা পড়েছে। সন্ধ্যায় জমিও দেখিয়ে আনল সাতকড়ি। জনমানবহীন প্রান্তরে উঁচু টিলার উপর চমৎকার প্লট।

বলাবাহুল্য উকিলবাবু মোটা টাকায় জমি বায়না করে গেলেন।

গল্পের উপসংহারটি করুণ। জমির দখল নিতে এসে দেখেন, যে জমি তিনি দেখে গেছেন সে জমি দলিলবর্ণিত ভূখণ্ড নয়। দাগ নম্বর ধরে সন্ধান নিতে গিয়ে শোনেন গোটা মৌজাটাই সমুদ্রগর্ভে। অথচ বছর বছর বার্ষিক ন'সিকের খাজনা জমা পড়ছে সাতকড়ি জানার তরফে। সাতকড়ি জানা কে এবং সে কোথায় থাকে তা অবশ্য কেউ বলতে পারলে না।

বর্তমান দীঘা বছর-আষ্টেকের শিশু। ওয়ারেন হেস্টিংসের পর দুশ বছর পরে আবার একজন দীঘাকে আধুনিক-ঢঙে সাজাবার স্বপ্ন দেখলেন—তিনি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। গড়ে উঠল ছোট্ট জনপদ। তৈরি হল খড়্গপুর থেকে পীচমোড়া সড়ক, সাত-মাইল ব্রীজ, পিছাবনি সাঁকো। দীঘাতে গড়ে উঠল নানান ধরনের বাড়ি, বাজার, ব্যারিস্টারস্ কলোনি।

শহরের যেখানটা হতে পারত কলকাতার এসপ্ল্যানেড অথবা দার্জিলিঙের ম্যাল—যেখানে তৈরি হতে পারত গোপালপুর অথবা পুরী বি.এন.আর. হোটেলের ঢঙে পূর্বভারতের শ্রেষ্ঠ সৈকতাবাস—সেখানে সর্বপ্রথমেই বানানো হল একটি বাজার। ছোট ছোট খুপরি, চাল-ডাল, সাবান-সোডা মায় রঙিন ফিতে এমনকি চারমিনার সিগারেটও পাবেন সেখানে। দীঘার হগ মার্কেট ! উল্টো দিকে পূর্তবিভাগের ডাকবাঙলো। সুন্দর দেখতে। ছাদটি অভিনব। এ বাড়িটি কোনদিন দ্বিতল হবে না। এ ছাড়া আরও দুটি ডাকবাঙলো আছে দীঘায়। একটি বনবিভাগের—অপরটি সেচবিভাগের। শেষোক্ত বাড়িটিই দীঘার সবচেয়ে প্রাচীন। কিন্তু এ সব ডাকবাঙলো তো সাধারণের নাগালের বাইরে। তাদের জন্য আছে ছোট ছোট কটেজ। এক কামরা ও দু কামরার। ছোট হলেও ব্যবস্থা ভাল। প্রতি ঘরে গদিওলা দুটি করে খাট, আয়না, ফ্যান, টেবিল, চেয়ার, ইজিচেয়ার। জলের ব্যবস্থা মায় রান্না করার উপযুক্ত বাসনপত্র। সামান্য ভাড়া দিলে ধবধবে কাচা বিছানাও পাবেন। শীতকালে কম্বল। একটু খোঁজ নিলে রান্না-করা, বাসন-ধোওয়ার লোক পাবেন—দৈনিক চুক্তিতে। ঘরে বসেই বাজার

কথা যায়—মাছ, ডিম, ডাব, কয়লা, মায় মুরগী। আর ঝামেলা যদি এড়াতে চান কাফেটারিয়ায় সোজা অর্ডার দিয়ে দিন। ব্যবস্থা সবই আছে, কিন্তু আপনার বরাতে তা আছে কিনা জানতে হলে কোনও গ্রহাচার্যের কাছে প্রথমে আপনাকে কোষ্ঠীটা একবার বিচার করাতে হবে। তুঙ্গে বৃহস্পতি ছাড়া আপনি ঘরের অ্যালটমেন্ট পাবেন না। ঘর যত, দাবিদার তার চেয়ে বেশি। বছরে ন মাস। যথেষ্ট সময় হাতে রেখে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সাহেবের কাছে দরখাস্ত পাঠাতে হবে।

তবে হ্যাঁ, অবস্থার দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। সমুদ্রতীরে, স্নেইথ-সাহেবের বাড়ির দক্ষিণে তৈরি হচ্ছে বিশালায়তন সৈকতাবাস। দ্বিতল বাড়ি। ভবিষ্যতে ত্রিতলও হবে। আপাতত চব্বিশটি এককাসন এবং ছয়টি দ্বৈতশয্যার কামরা থাকবে তাতে। থাকবে রেস্তোরাঁ, পাঠাগার ইত্যাদি। বনবিভাগের ডাকবাঙলোর দক্ষিণে সম্প্রতি যে দুটি বাড়ি তৈরি হল তাতেও অনেক লোক থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। এগুলি নিম্নবিত্তের। যাত্রীশালা বা ধর্মশালার ধরন। সস্তা। সে তুলনায় 'সৈকতাবাস' মধ্যবিত্তের উপযোগী। সম্প্রতি সরকার উচ্চবিত্তের তথা বিদেশী পর্যটকদের উপযোগী একটি টুরিস্ট লজ তৈরি করার ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করেছেন। এ বাড়িটি খুবই উন্নতমানের হবে বলে মনে হয়। আপাতত বারোটি দ্বৈতশয্যার ঘর থাকবে তাতে। এ ছাড়া ছাত্র ও শিল্পাঞ্চলের মেহনতি মানুষদের জন্য পৃথক আবাস তৈরি হবার কথাও প্রায় পাকা। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে সরকারী উদ্যোগেএকটি নূতন কলোনী গড়ে তোলার পরিকল্পনাও আছে। এতদিনে সেখানে সারি সারি বাড়ি তৈরি হয়ে যাবার কথা। কেন হয়নি, সে কথা থাক। আজ আমার ভূমিকা সঞ্জয়ের, বিকর্ণের নয়।

শত-তরঙ্গভঙ্গে সাগর বাংলার বন্দনা রচনা করে। অথচ দুর্ভাগ্য বাঙালীর, সমুদ্রদর্শন করতে এতদিন তাকে যেতে হত প্রতিবেশী রাজ্যে। এ দীর্ঘদিনের অভাব মোচন করেছে দীঘা। দেখবার জিনিস ওখানে আর কিছু নেই। শুধু সমুদ্র, সমুদ্র, আর সমুদ্র। নেই জগন্নাথের মন্দির, কোনারক, উদয়গিরি। যাঁরা ওস্তাদ সাঁতারু নন, তাঁরা পুরীর তুলনায় দীঘাতে স্নান করে বেশী আরাম পাবেন। দীঘাতে আর একটি জিনিসের অভাব বড় দাগা দেয়। ঝিনুক। পুরীতে দেখেছি ছেলেবুড়োর দল নিরন্তর ঝিনুক কুড়াচ্ছে। সে দৃশ্য দীঘায় দেখতে পাবেন না।

ফিরে আসার আগে অশীতিপর দীঘাজনকের সঙ্গে দেখা করে এলুম। আমি সাহিত্যসেবী শুনে সাদরে আপ্যায়ন করলেন। অনেকদিনের পুরানো গল্প শোনালেন, দুর্লভ ফটোর অ্যালবাম দেখালেন। বক্রেশ্বর তীর্থে সেবার একজন টিপিক্যাল ভারতীয় বৃদ্ধের ভিতর দেখেছিলুম গত শতাব্দীর ধর্মবিশ্বাসকে—দীঘাতে এবার একজন টিপিক্যাল ইংরেজ বৃদ্ধের ভিতর দেখলুম গত শতাব্দীর কর্মবিশ্বাসকে। চোখ গেছে, কান গেছে—তবু নিরলস-নিষ্ঠায় কাজ করে চলেছেন অকৃতদার বৃদ্ধ-যুবা। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন সব। যাঁরা ছিল ওঁর শেষজীবনের সহচর— বেয়ারা, আর্দালী, স্টুয়ার্ড—তাদের জন্য বাড়ি তৈরি করে দিয়ে যাচ্ছেন। দুঃখ করে বললেন —ঐ যে বাড়িটা উঠছে আমার বাড়ির দক্ষিণে, ওর নাম 'সৈকতাবাস'। ওটা তৈরি হয়ে গেলে আর বাড়ি বসে সমুদ্রকে দেখতে পাব না।

দৃঢ়তার সঙ্গে বললুম—না। আপনার বাড়ির দ্বিতলের বারান্দা থেকে সমুদ্র দেখা যাবে

তা সত্ত্বেও।

—য়ু থিংক্ সো? আমার আন্দাজ জানতে চাইলেন উনি।

কোন্ লজ্জায় বলব—এ আমার আন্দাজ নয়, নিজে হাতে পরখ করা সত্য।

কত গাছ পুঁতেছেন, কত অভিনব পরিকল্পনা আছে তাঁর—সব জানালেন। বিদায় নিয়ে চলে আসার সময় বললুম—ঐ উঁচু টিলার উপর বাঁধানো চতুষ্কোণ চাতালটা কিসের?

বৃদ্ধ একটু বিব্রত হয়ে পড়েন। চোখ থেকে পুরু কাঁচের চশমাটা খুলে রুমাল দিয়ে মুছতে থাকেন। সঙ্গে ছিলেন অরুণবাবু—তিনিও কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছেন মনে হল। কী হল? অশোভন কোন প্রশ্ন করে বসেছি নাকি? ওটা কি ওঁর কোন প্রিয়জনের সমাধি? কিন্তু কার? অকৃতদার বৃদ্ধ স্নেইথের মনের তন্ত্রীতে হঠাৎ এমন আঘাত লাগল কিসে?

অরুণবাবু তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলেন —স্নেইথ সাহেব দীঘায় এসে ঐ টিলার উপরেই প্রথম খড়ে-ছাওয়া কুটিরখানি নির্মাণ করেন, তাই—

কথাটা অসমাপ্ত রেখে তিনি আমার হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে বেরিয়ে এলেন গেট দিয়ে। ভাল করে বিদায় নেবার সুযোগও পেলুম না।

বাইরে এসে বলি—ব্যাপার কী? ওটা কি কারও কবর?

বিচিত্র হেসে অরুণবাবু বলেন—বর্তমানের নয়, ভবিষ্যতের।

তার মানে?

তার মানে আজ ঐ চতুষ্কোণ পাথরখানার নিচে কেউ শুয়ে নেই—কিন্তু একজনের নির্দেশ—ঐ পাথরখানি খুঁড়ে ফেলে তাঁকে ঐ সমুদ্র-সৈকতেই অন্তিমশয্যায় শুইয়ে দিতে হবে।

পিছন ফিরে দেখি সমুদ্রের পটভূমিকায় এক বৃদ্ধের সিল্যুয়েৎ। সমুদ্র-প্রেমিক। এক-দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রের দিকে, না টিলার উপর ঐ চতুষ্কোণ পাথরখানার দিকে? পকেট থেকে রুমাল বার করে, মনে হল, চশমার কাঁচটা আবার মুছলেন। চশমা? না আর কিছু?

এখনও চোখ বুজলে দেখতে পাই দৃশ্যটা। সান্ধ্য-আকাশের পটভূমিকায় সমুদ্রের পশ্চাৎপটে দাঁড়ানো লাঠি-ভর এক বৃদ্ধের সিল্যুয়েৎ।

দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সী'।

জীবনের উৎপত্তি
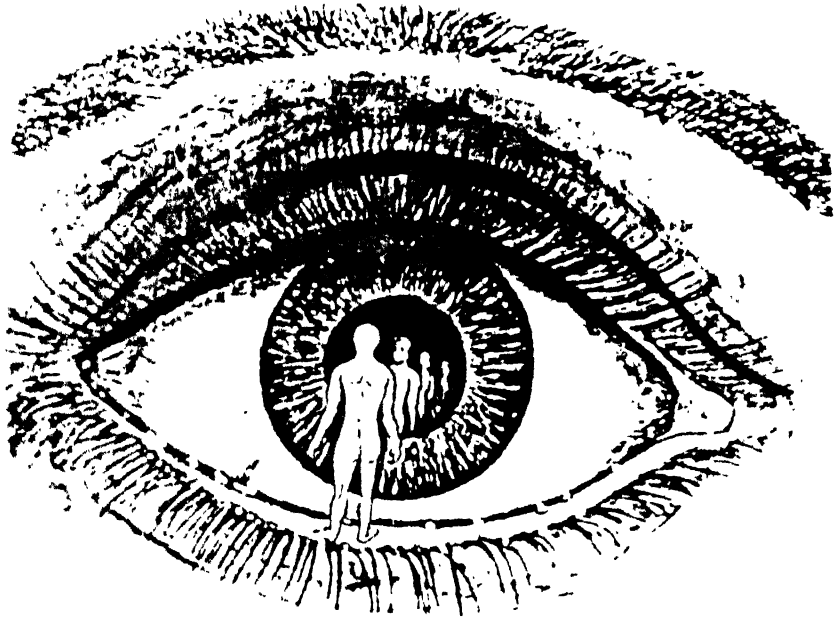
বিজ্ঞান আজও জানে না কীভাবে পৃথিবীতে জীবনের সূত্রপাত ঘটল। এটুকু অবশ্য জানা গেছে যে, সৌরজগতের ত্রিসীমানার মধ্যে একমাত্র পৃথিবীতেই আছে চৈতন্যময় জীব—আর কোথাও নেই। অন্তত 'জীব' বলতে 'প্রাণ' বলতে যা আমরা সচরাচর বুঝি। অতি সাম্প্রতিককালে কোনও কোনও বিজ্ঞানী অবশ্য বলেছেন, কার্বন-অণু-বিশিষ্ট জীব—ভাইরাস-জাতীয়—বৃহস্পতি গ্রহের অন্তত দুটি উপগ্রহে খুঁজে পাওয়া গেলে অবাক হবার কিছু নেই ; গ্যানিমিড ও ইউরোপা। সে যাই হোক, চৈতন্যময় প্রাণ বলতে আমরা যা বুঝি তা সৌরজগতে একমাত্র পৃথিবীতেই আছে। বয়স নয়—দূরত্বের হিসাবে সূর্যের এই তৃতীয় সন্তানটির এমন কতকগুলি দুর্লভ 'গুণ' আছে যা 'মা' হওয়ার উপযুক্ত—আর কোন গ্রহ-উপগ্রহে সেই গুণগুলি নেই। সূর্য থেকে বুধ বা শুক্রের দূরত্ব এত কম যে, সেখানে জীবনের সম্ভাবনা ঝলসে যাবে ; আবার মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি সূর্য থেকে এত বেশি দূরে যে, উত্তাপের অভাবেই সেখানে জীব সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু চাঁদ ? সূর্য থেকে চাঁদের দূরত্ব তো পৃথিবীর মতোই। কিন্তু না। চাঁদেরও সন্তানবতী হবার অন্যান্য গুণ নেই। তার

ভর এত কম যে, সে আবহাওয়াকে ধরে রাখতে পারে না, পারেনি। তার ঘূর্ণনছন্দ এত শ্লথ যে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তে তার বড় বেশি সময় লাগে। যার ফলে সেখানে মধ্যদিনের প্রচণ্ড উত্তাপ আর মধ্যরাত্রের দুঃসহ শীত—দুটিই জীবনের প্রতিকূল পরিবেশ। 'পৃথিবী-মা'য় সব কয়টি গুণই আছে। তার আকার, আয়তন, ভর, চৌম্বকশক্তি, ঘূর্ণনছন্দ, সূর্য-প্রদক্ষিণ পথের সঙ্গে ঐ সাড়ে-তেইশ ডিগ্রি বেঁকে দরবারী-নাচের-ঢঙে পাক খাওয়ার ভঙ্গিমা সব কিছুই জীববিকাশের পক্ষে অনুকূল। কেমন করে এমনটা হল ? মাতা ধরিত্রীকে মা-হওয়ার এই একঝুড়ি গুণ কে দিয়েছেন ? বিজ্ঞান তার জবাব জানে না। সে শুধু বলে—ঐ একাধিক দুর্লভ গুণের সমন্বয়ের ফলে গোটা সৌরজগতে শুধু পৃথিবীতেই আছে : প্রাণ ! আর তাই শুধু এই পৃথিবীর কবিই বলতে পারেন : 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ ; চুনি উঠল রাঙা হয়ে।'

তা বলে যেন ধরে নেবেন না যে, বাকি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সব কিছুই—'না-পান্না, না-চুনি, না-আলো, না-গোলাপ, না-আমি, না-তুমি।' সহজ ভাষায়, তার মানে এ কথা ধরে নেওয়া যাবে না যে, সৌরজগতের বাহিরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও সচেতন প্রাণী নেই ! বরং বিজ্ঞান বলছে, খুব সম্ভবত আছে—না, নিশ্চিত আছে ! নিশ্চিত আছে ? বিনা-প্রমাণে এত বড় কথাটা কোন আক্কেলে বলল বিজ্ঞান ? শুনেছি, বিজ্ঞান নাকি বিনা-প্রমাণে কোন কিছুই মানে না ! না, তা ঠিক নয়, বিনা-প্রমাণে বিজ্ঞান 'স্বতঃসিদ্ধ'কে মানে। সম্ভাব্যতার বিচারকেও যথেষ্ট সমীহ করে চলে। ঐ সম্ভাব্যতা বা 'প্রব্যাবিলিটি'র হিসাবে বিশ্বের সব নাম-করা নভোবিজ্ঞানীরা একযোগে বলেছেন—সৌরজগতের বাহিরে 'জীব' বা 'প্রাণ' থাকার সম্ভাবনা ষোলো আনা।

হয়তো একটু অপ্রাসঙ্গিক হচ্ছে, তবু কথাটা যখন উঠে পড়ল তখন কৌতূহলটা মিটিয়েই নেওয়া যাক :

আমরা জানি, গ্রহ-উপগ্রহের ছানা-পোনা সহ এই যে সূর্য, সে একটি নক্ষত্র। আমাদের 'গ্যালাকটিক সিস্টেমে' বা নক্ষত্র-জগতে। এমন কোটি কোটি গ্যালাক্সি আছে মহাকাশে। শুধুমাত্র আমাদের গ্যালাক্সি বা নক্ষত্র-জগতে নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার কোটি। তাদের অনেকেরই নিজস্ব গ্রহ-উপগ্রহ আছে। বিভিন্ন দূরত্বে, বিভিন্ন ভর-বিশিষ্ট ইত্যাদি। কথার-কথা হিসাবে যদি ধরে নেওয়া যায় যে, পৃথিবীর মা-হওয়ার ঐ সবকয়টি দুর্লভ গুণ অন্য কোনও নক্ষত্রের বা সূর্যের গ্রহে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা : 'কোটিকে গুটিক', তাহলে সহজ অঙ্কের হিসাবে শুধুমাত্র আমাদের এই পরিচিত নক্ষত্র-জগতে জীবন-সম্ভাবনাময় গ্রহের সংখ্যাটা হচ্ছে দশহাজার ! অন্যান্য কোটি কোটি নক্ষত্র-জগতের প্রসঙ্গ না হয় মুলতুবিই থাক।

একটা কথা। ঐ যে সংখ্যাটা এখনি বলেছি, 'দশ হাজার কোটি'—ওটা যে কত বড় তা আমরা ধারণাই করতে পারি না। ওটা লিখতে হলে 'এক' এর পরে এগারোটা শূন্য বসাতে হবে, এটুকু জানি। কিন্তু সংখ্যাটা যে কী প্রকাণ্ড তার ধারণা হয় না। একটা তির্যক-পন্থায় সেই বিশালত্ব সম্বন্ধে ধারণা করার চেষ্টা করি — মনে করুন, গৌতম বুদ্ধ তাঁর কোনও প্রত্যক্ষ শিষ্যকে বললেন যে, শুধুমাত্র আমাদের নক্ষত্র-জগতের সব কয়টি নক্ষত্রকে 'এক-

দুই-তিন' করে গোনা শেষ করলে শিষ্যের নির্বাণলাভ হবে, এবং সেই শিষ্য যদি প্রতি-সেকেন্ডে একটি করে নক্ষত্র গুণতে থাকেন, তাহলে এই আপনি যখন আমার বইটি পড়ছেন তখন তাঁর নির্বাণলাভ ঘটত। সোজা কথায়—আড়াই হাজার বছরের ভিতর যতগুলি সেকেন্ড আছে তা প্রায় ঐ দশ হাজার কোটি।

এ থেকেই—সম্ভাব্যতার বিচারে বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত : সৌরজগতে না থাকলেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন অনেক উপগ্রহ নিশ্চয় আছে যেখানে জীবের আবির্ভাব ঘটেছে। এমনও হতে পারে যে, তারা আমাদের এই পার্থিব বিংশশতাব্দীর সভ্যতাকে অনেক অনেককাল আগে অতিক্রম করে গেছে। হয়তো তারা অনেক বেশি উন্নত। হয়তো সে জীবের আকৃতি, জীবনছন্দ—হাসি-অশ্রু, জীবন-মৃত্যু ভিন্ন জাতের—আমাদের ধারণার বাইরে।

থাক ওসব বড় বড় অবান্তর কথা। আমরা বরং সূর্যকন্যা এই ছোট্ট পৃথিবীর দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি। বিজ্ঞানীদের মতে সূর্য থেকে পৃথিবীর ছিটকে বেরিয়ে আসার সময়টা 400 থেকে 500 কোটি বছর অতীতের কথা। ইদানীং বিজ্ঞানীরা অবশ্য সময়টা আরও কিছু বেশি করে ধরার পক্ষপাতী।

সে যা হোক, প্রাথমিক অবস্থায় সদ্যোজাত পৃথিবীটা ছিল অত্যন্ত উত্তপ্ত একটা গ্যাসের পিণ্ড— প্রায় 4,000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপের।

ক্রমাগত তাপ বিকিরণ করতে করতে গ্যাসগুলি তরল অবস্থায় এল। উত্তাপ যখন 1,500 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে নেমে এল তখন দেখা গেল কিছু কিছু কঠিন আস্তরণ। ঐ উপরের আস্তরণটি গলিত গ্যাসীয় কেন্দ্রস্থলের উপর কমলালেবুর খোসার মতো পৃথিবীকে ঘিরে থাকল। উত্তাপ কমতে কমতে যখন 700 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে নেমেছে তখন হিসাবমতো পৃথিবীর উপরের ঐ খোসাটা প্রায় আট কি.মি. গভীরতার। তারপর থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থ উত্তাপহ্রাসের হারটা স্বতই কমে গেল। যাবেই। কারণ উপরের ঐ খোসাটাই উত্তাপহ্রাসের বাধা হয়ে দাঁড়াল। তখন সেই সূর্যপ্রদক্ষিণরত ঘূর্ণ্যমাণ পৃথিবীর উপর ভাসতে থাকে একটা গ্যাসীয় মেঘ—তার কিছুটা আবার তরল রাসায়নিক পদার্থ।

ষাট-হাজার বর্ষব্যাপী বৃষ্টি

উত্তাপ আরও কিছুটা কমে যাবার পর শুরু হল বৃষ্টি। উঃ। সে কী বৃষ্টি। আন্দাজ ষাট হাজার বছর ধরে পৃথিবীর সর্বত্র বৃষ্টি পড়তে থাকে। নিরবচ্ছিন্ন ধারায় নয় অবশ্য—বৃষ্টির জল পৃথিবীতে পড়েই উত্তপ্ত পরিমণ্ডলে আবার হয়ে যায় মেঘ, আবার পড়ে বৃষ্টি। যে কারণে খশখশে জল ছিটালে ঘরটা গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা হয়, সেই কারণেই পৃথিবীর উপরিভাগের উত্তাপহ্রাস ত্বরান্বিত হতে থাকে। আকাশে যত জলকণা ছিল তার অনেকটাই নেমে এল পৃথিবীর বুকে। এবড়ো-খেবড়ো পৃথিবীর যেখানে যত খানা-খন্দ ছিল সব জলে টৈটুম্বুর! জন্ম নিল সমুদ্র আর মহাসমুদ্র। প্রথমে মিঠেজলের, ক্রমে বৃষ্টি ধোওয়া জলে নোনাজলের। নিরবচ্ছিন্ন ধারাপাতে মাতা ধরিত্রী শীতল হলেন। উত্তাপ নামতে নামতে প্রায় বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছালো। উত্তাপ এতদিনে জীবের অনুকূল হয়েছে বটে কিন্তু তখনো ছিল নানান জাতের বাধা।

তার ভিতর দুটি ছিল বড় জাতের অন্তরায়। প্রথম কথা, পৃথিবীবেষ্টিত আকাশে তখন মুক্ত অক্সিজেন ছিল না। দ্বিতীয়ত, সূর্য-বিচ্ছুরিত আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি, মহাকাশ থেকে ভেসে আসা মহাজাগতিক রশ্মি প্রভৃতি থেকে জীব আত্মরক্ষা করতে পারত না। ঐসব মারাত্মক রশ্মি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বর্তমানে উর্ধ্ব আকাশের ভাঁ অ্যালেন বেল্ট-এ যে ওজন (ozone) আবরণের ছাতা আছে তখন তা ছিল না।

কোথা থেকে থাকবে? তখনো মুক্ত অক্সিজেনই (O_2) আবহাওয়ার পয়দা হয়নি, 'ওজন' (O_3) হবে কোথা থেকে? মাসিই জন্মায়নি, তার মাসতুতো ভাই।

তাহলে সে-যুগে ঐ পৃথিবী-বেষ্টনকারী আকাশে কী ছিল? মুক্ত-অক্সিজেন যে ছিল না এ বিষয়ে সব বিজ্ঞানীই একমত। কিন্তু 'কী ছিল' এ প্রশ্নে দুই দল পণ্ডিতের দুই মত। অধিকাংশের মতে আদিম আবহাওয়ায় যথেষ্ট পরিমাণে ছিল অ্যামোনিয়া (NH_3) এবং মিথেন (CH_4) গ্যাস, যেমন বর্তমানে আছে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুনের বাতাবরণে। দ্বিতীয় দল পণ্ডিতের মতে, আদিম আবহাওয়ায় মূলত ছিল — কার্বন মনোক্সাইড (CO), কার্বন ডায়োক্সাইড (CO_2), নাইট্রোজেন (N_2) এবং হাইড্রোজেন অণু (H_2)। ঐ দুটি মতের সমন্বয় করে লড়াই-কাজিয়া থামাতে যে ধরে নেব—আদিম অবস্থায় আবহাওয়াতে ঐ ছয়টি গ্যাসই ছিল তার উপায় নেই। বিজ্ঞান বলছে—হয় এটা, নয় ওটা। সমঝোতার অবকাশ নেই। তাই আমরা বরং দেখি, দুটি বিকল্প সম্ভাবনার মধ্যে কোনটি 'জীব-উৎপাদনে' সক্ষম। অর্থাৎ 'জীব'-এর আবশ্যিক রাসায়নিক অণুগুলি কোন বিকল্প সম্ভাবনা উৎপাদন করতে সক্ষম। তাহলে আগে জানতে হয় — 'জীব'-এর পক্ষে আবশ্যিক রাসায়নিক উপাদান কী কী?

'জীব'-এর রাসায়নিক উপাদান

আগেভাগেই বলে রাখি, বিষয়টা জটিল। হয়তো পরে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে, কিন্তু এই প্রাথমিক পর্যায়ে শুধুমাত্র মোদ্দা কথাগুলিই লিপিবদ্ধ করা যাক :

'পিরিয়ডিক টেবল'-এ যে প্রায় শতখানেক মৌলিক রাসায়নিক পদার্থের নাম আছে—যা দিয়ে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের সব কিছু গঠিত—তার ভিতর মাত্র চারটি উপাদান জীবমাত্রেরই আবশ্যিক। শুধু আবশ্যিক নয়, তারাই জীবদেহের বৃকোদরভাগ।

সেই চারটি মৌলিক পদার্থ হচ্ছে কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O), এবং নাইট্রোজেন (N)। এ ছাড়া আরও কয়েকটি মৌলিক উপাদান জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয়, যদিও তাদের অনুপাত কম, যেমন ফস্‌ফরাস, সালফার বা পটাশিয়াম। কিন্তু ঐ চারটি মৌলিক পদার্থই সকল জীবদেহের বৃকোদরভাগ—জীবাণু থেকে জিরাফ, মক্ষিকা থেকে মানুষ। কিন্তু তা কেন হল? একটা সম্ভাবনা হয়তো এই—প্রকৃতিতে ঐ চারটি মৌলিক পদার্থ প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু 'সিলিকন'ও (বালুকণা) তো তাই আছে? জীবদেহে কিন্তু তার কোনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই, প্রকৃতিতে থাকলেও।
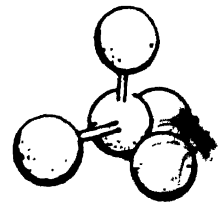
কার্বন অণু

এই চারজনের মধ্যে সবার আগে নাম করা গেছে কার্বন-এর। এই অগ্রাধিকারের বিশেষ হেতু আছে। কার্বন অণু tetravalent, সাদা বাঙলায় চতুর্ভুজ। অর্থাৎ চারটি বাহু দিয়ে সে অন্যান্য পরমাণুকে আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা রাখে। ফলে অন্যান্য তিনটি মৌলিক পদার্থকে নিয়ে বেশ একটা জটিল চেহারা নিতে পারে। এই অণু-পরমাণুর জটিল ভঙ্গিটাই প্রাণীদেহের একটা বৈশিষ্ট্য। জৈব-রসায়নের একটা বৈলক্ষণ্য।

প্রশ্ন হতে পারে—ঐ চারটি মৌলিক পদার্থ, C, H, O, এবং N-কে বাদ দিয়ে কি জীবকোষ পয়দা হতে পারে? আমরা সংক্ষেপে জবাবে বলব, সম্ভবত না—অন্তত এমন ক্ষেত্রে নয়, যেখানে মুক্ত অক্সিজেন আছে যথেষ্ট পরিমাণে। যেমন এই পৃথিবী। বরং একথাও বলব যে, অন্য কোনও গ্রহে-উপগ্রহে (যেমন বৃহস্পতির দুটি উপগ্রহের কথা আগেই বলেছি) সেটা সম্ভব হলেও হতে পারে। সে যা হোক, এই পৃথিবীতে ঐ চারটি মৌলিক পদার্থ বিভিন্ন কায়দায় জড়াজড়ি করে কীভাবে জীবকোষকে গঠন করে?

আমরা জানি, মৌলিক পদার্থগুলি বিশেষ অনুপাতে, বিশেষ ঢঙে মিলিত হয়ে নানান পদার্থের রূপ নেয়। যেমন, দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু মিলে-মিশে হয়—জল। রসায়ন পণ্ডিত তাই জলকে লেখেন H_2O-রূপে। বস্তুতপক্ষে জীবকোষে জল একটি আবশ্যিক উপাদান। ওজন-হিসাবে জৈবিক অণুতে 70-90 শতাংশ শুধু জল। জীবন বলতে আমরা, পার্থিব অবস্থায় যা বুঝি—তা 'জল' ছাড়া টিকতে পারে না। বোধকরি তাই 'জল'-এর এক নাম 'জীবন'!

জটিলতা এড়িয়ে খুব সহজভাবে বলা যায়—প্রত্যেকটি জীবিত প্রাণীর দেহে তিনজাতের যৌগিক পদার্থ আছে—ঐ চারটি মৌল শরিকের দ্বারা গঠিত। সেই তিনটি যৌগিক পদার্থকে বলি কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট আর প্রোটিন। দুনিয়ার যাবতীয় জীবের মধ্যে এই এক মৌলিক সাদৃশ্য। কার্বোহাইড্রেট (যেমন শর্করা, স্টার্চ, সেলুলোস—যা উদ্ভিদের মৌলিক উপাদান) গড়ে ওঠে তিন শরিকের 'যোগ-সাজসে'—C, H, এবং O ; শেষ দুটির অনুপাত ঠিক জলে যেমন আছে—অর্থাৎ দু-ভাগ হাইড্রোজেন একভাগ অক্সিজেন। 'ফ্যাট' (সাদা বাঙলায় যাকে চর্বি বা মেদ বলে) গঠিত হয় ঐ তিনটি মৌলিক পদার্থেই, কিন্তু ফ্যাট-অণুতে অক্সিজেনের ভাগ কিছু কম। আর তার সঙ্গে নাইট্রোজেন, ফসফরাসও যুক্ত থাকে। প্রোটিন (মাংসের বা পেশীর মৌল উপাদান) এ তিনটির ভিতর সবচেয়ে জটিল। তাতে আবশ্যিক ভাবে থাকে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং সালফার। আরও কিছু হয়তো থাকে—যেমন ফসফরাস।

ঐ তিনটি যৌগিক পদার্থের কাজটা কী? 'জীবন' নাটকে কী তাদের ভূমিকা? বলি শুনুন :

'কার্বোহাইড্রেট' আর 'ফ্যাট' হচ্ছে জ্বালানি। জেগেই থাকি বা ঘুমিয়েই থাকি দেহের কিছুটা ক্ষয় হবেই। জেগে থাকলে, দৌড়-ঝাঁপ করলে, ক্ষয়টা বেশি হয়, এই যা। ওরা দুটিতে সেই ক্ষয়টা পূরণ করে। ওরা জান্তব বিপাক-এর (animal metabolism) জোগান দেয়।

তৃতীয় শরিক— 'প্রোটিন' এবং প্রোটিন-পরিবারভুক্তরা (protein derivatives) দু-জাতের কাজ করে। এক নম্বর, তারাই প্রাণীজগতের মৌল উপাদান। দু-নম্বর, তাদের অনেকে

'এনজাইম' হিসাবে কাজ করে, যাদের বাদ দিয়ে জীবন টিকতে পারে না।

এবার একটা নতুন শব্দ এসে গেল—এনজাইম। সেটাকে একটু চিনে নেওয়া যাক —সহজ ভাষায়। 'এনজাইম' হচ্ছে 'জৈবিক ক্যাটালিস্ট'। আপনি এবার আমাকে ধমক দেবেন : এই তোমার সহজ ভাষা ? 'ক্যাটালিস্ট'ও তো একটা নতুন শব্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ। স্বীকার করছি। শুনুন— 'ক্যাটালিস্ট' কাকে বলে। সাদা বাঙলায় : ঘটক। পরিভাষা : অনুঘটক।

ঘটকের কাজটা কী ? পাত্রপক্ষ-কন্যাপক্ষকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিবাহের ব্যবস্থাটা পাকা করে ফেলা। কিন্তু বিয়ে-থা মিটে গেলে দেখা যায়, ঘটক যেখানে ছিল সেখানেই আছে। অপরিবর্তিত। কনে গেল বরের ঘরে, হল মা ; বর বছর বছর জামাইষষ্ঠী খেতে এবাড়ি আসে, হল বাবা। কিন্তু ঘটক ? সে ছাতা মাথায় তখন অন্য-অন্য বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে— উপযুক্ত পাত্রপাত্রীর সন্ধানে। তার কোনও পরিবর্তন হয়নি। একেই রসায়নবিদেরা বলেন— 'ক্যাটালিস্ট'। ঘটকের সঙ্গে কেমিস্ট্রির ঐ ক্যাটালিস্ট-এর একটিই প্রভেদ : রসায়নে 'ঘটক বিদায়ের' ব্যবস্থা নেই। তার কোনরকম লাভ-ক্ষতি হয় না।

'এনজাইম' হচ্ছে তেমনই ঘটক-চরিত্রের। রাসায়নিক বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। আমরা জানি, আহার পরিপাক করার সময় দেহযন্ত্র স্টার্চকে শর্করায় পরিণত করে, প্রোটিনকে ভেঙে অ্যামিনো-অ্যাসিডে রূপান্তরিত করে। এই কাজটা এনজাইমের। আবার উল্টো কাজটাও করে —অর্থাৎ শর্করাকে রূপান্তরিত করে স্টার্চে, অ্যামিনো-অ্যাসিডকে প্রোটিনে। যেন শান্টিং এঞ্জিন—মালগাড়িগুলোকে সামনের দিকেও টানতে পারে, পিছন দিকেও ঠেলতে পারে। শুধু তাই নয়, প্রোটিনের ঐ 'এনজাইম'-বৃত্তি আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার করে। একজাতের এনজাইমই (প্রোটিন) অন্যজাতির এনজাইম (প্রোটিন) পয়দা করে।

স্বতই প্রশ্ন হবে ঐ শান্টিং এঞ্জিনটাকে কে চালায় ? কে তাকে ঠিক সময়ে সামনের দিকে ঠেলতে বা পিছনপানে টানতে হুকুম দেয় ? কীভাবেই বা প্রোটিন প্রোটিনের জন্ম দেয় ?

বিজ্ঞানের ঐ এক মুশকিল। 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন' বলে এক-কথায় বখেরা চুকিয়ে দিতে পারে না। তাকে আরও গভীরে প্রবেশ করে প্রমাণসাপেক্ষ জবাব খুঁজতে হয়। কীসের গভীরে ? জীবকোষের।

জটিলতা এড়িয়ে একটি সাধারণ জীবকোষের ছবি এখানে এঁকে দেখানো গেল। ছবিতে অনেক অচেনা নাম, অনেকগুলি আবার ইংরজিতে লেখা। তা নিয়ে ঘাবড়াবার কিছু নেই। ছবিটি পূর্ণাঙ্গ না হলে জীববিজ্ঞানীরা নারাজ হতেন। আমাদের কাছে যেটুকু প্রাসঙ্গিক তা অবশ্য বাঙলা হরফেই লেখা।

দেখছি, কোষপর্দা-ঘেরা প্রাণীকোষের মাঝখানে আছে একটি নিউক্লিয়াস। পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সঙ্গে যাতে গুলিয়ে না ফেলা হয়, তাই নাম দিয়েছি 'সেল-নিউক্লিয়াস'। সেটা যেন মন্দির-কমপ্লেক্সের গর্ভগৃহ। নিশ্ছিদ্র নয়, মাঝে মাঝে ফাঁক-ফোকর আছে। ভিতরে লম্বাটে ধাঁচের — কেঁচোর মতো দেখতে কী যেন কতকগুলো — নাম লেখা আছে ক্রোমোজোম। আমরা যখন প্রজনন-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব, তখন তার কথা বিস্তারিত জানা যাবে। আপাতত বলি — গত শতাব্দীর মাঝামাঝি ঐ 'ক্রোমোজোম' বস্তুটার কথা বিজ্ঞান জেনেছে। ক্রমে জেনেছে যে, কোষটি দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার সময় সেল-নিউক্লিয়াসস্থিত

ক্রোমোজোমগুলিও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। ক্রোমোজোমরা জোড়ায় জোড়ায় থাকে। তাদের মধ্যে মাত্র একজোড়া লিঙ্গ-নিয়ামক ক্রোমোজোম। ধরুন মানুষের কথা। তার তেইশ-জোড়া ক্রোমোজোম —স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের, প্রতিটি জীবকোষে। তার মধ্যে মাত্র একজোড়া 'সেক্স-ক্রোমোজোম' বা 'লিঙ্গ-নিয়ামক' ক্রোমোজোম। বাবার ক্ষেত্রে একটি X এবং একটি Y, বাদবাকি বাইশ-জোড়াই লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ক্রোমোজোম। মায়ের ক্ষেত্রেও বাইশ-জোড়াই লিঙ্গ-নিরপেক্ষ, শুধুমাত্র লিঙ্গ-নিয়ামক ক্রোমোজোমের দুটিই X. এতক্ষণ প্রতিটি

সাধারণ জীবকোষ
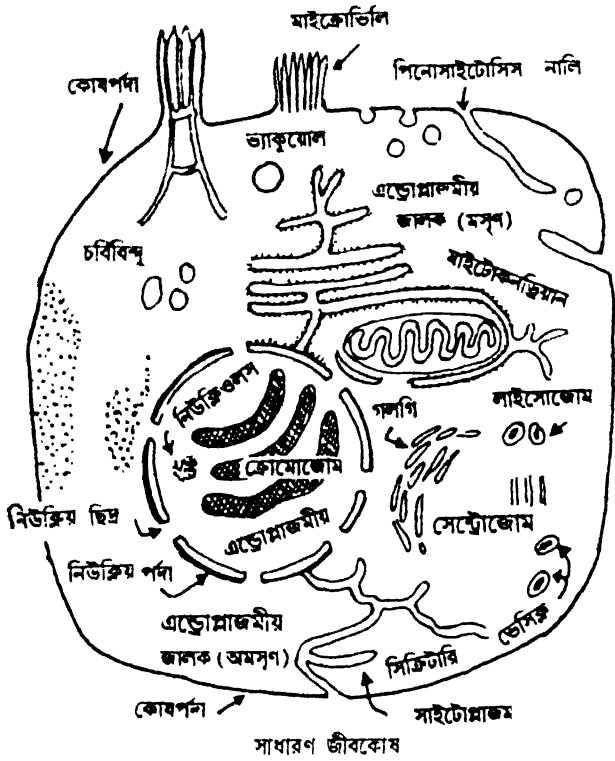
মানুষের প্রতিটি জীবকোষের কথা বলা হচ্ছিল। এবার শুক্রকোষ ও ডিম্বকোষের প্রসঙ্গে আসি। বাবার শুক্রকোষে তেইশ-জোড়ার বদলে থাকে তেইশটি ক্রোমোজোম। সেই তেইশটির ভিতরেও বাইশটি হচ্ছে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। বাকিটি দুই জাতের। অর্ধেক X-জাতের, অর্ধেক Y জাতের। অনুরূপভাবে মায়ের ডিম্বকোষেও তেইশ-জোড়ার বদলে থাকে তেইশটি ক্রোমোজোম। তার ভিতরেও বাইশটি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। বাকি মাত্র একটি লিঙ্গ-নির্ধারক — সেটি শুধুমাত্র X জাতের।

শুক্রকোষের সঙ্গে ডিম্বকোষের মিলন মুহূর্তে যদি মায়ের X ক্রোমোজোমের সঙ্গে বাপের X ক্রোমোজোম যুক্ত হয়, তাহলে সন্তান-কোষে থাকছে দুটোই X-ক্রোমোজোম ; অর্থাৎ সন্তান হচ্ছে কন্যা।

অপরপক্ষে যদি মায়ের X-ক্রোমোজোমের সঙ্গে বাপের Y ক্রোমোজোম যুক্ত হয় তাহলে অপত্য কোষে থাকছে X এবং Y; ফলে সন্তান হয়ে যাচ্ছে পুরুষ ; জন্ম নিচ্ছে পুত্র-সন্তান।

নিচের ছবি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সম্ভাব্যতার বিচারে পুত্র-কন্যার সংখ্যা সমান-সমান হবার কথা।

এখানে বলে রাখি, জীববিজ্ঞানে পুরুষ ও নারীর লিঙ্গ বোঝাতে দুটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, যা আমরা বারে-বারে ব্যবহার করব। বৃত্তের নিচে যোগচিহ্ন হচ্ছে নারী, আর বৃত্তের মাথায় একপ্রান্তে একটি তীরচিহ্ন হচ্ছে পুরুষ।

সন্তানের লিঙ্গ নির্ণয়
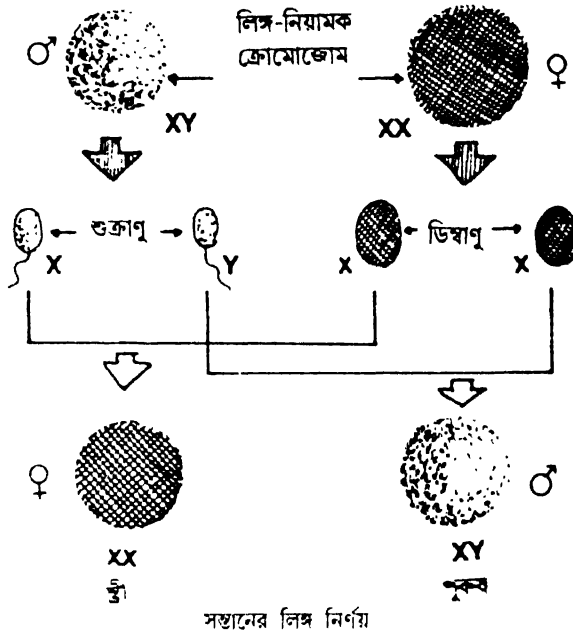
জীববিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা হয়তো এখানে মুখ টিপে হেসে বলবে : ভা-রী নোতুন কথা শোনালেন যাহোক।

তাদের প্রতিপ্রশ্ন করব : চিহ্ন দুটি কিসের প্রতীক সে-কথা কি জান? শোন, বলি : প্রতীক-চিহ্ন দুটি এসেছে গ্রীকসভ্যতা থেকে। স্ত্রী-চিহ্নের ঐ যোগচিহ্নটা আসলে দর্পণের প্রতীক। কার দর্পণ? আফ্রোদিতের! যাঁর রোমক নাম : ভেনাস। সাদা বাঙলায় যিনি রতি। তাঁরই প্রসাধন দর্পণ।

আর তীরচিহ্নটা? ওটা মদনশর!

জীববিজ্ঞানের তত্ত্বকথায় একটু কাব্য-কাব্য গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না এবার?

কাজের কথায় আসি।

ক্রোমোজোমই কি জীবনের শেষ কথা? —না।

জীববিজ্ঞানীরা আবিস্কার করলেন, ক্রোমোজোমের ভিতরে আর একটি সূক্ষ্মতর বস্তু।

তার নাম : 'জীন'। বস্তুত ঐ 'জীন'ই জীবের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করে —'জেনেটিক কোড' মাধ্যমে। মানুষের ক্ষেত্রে সন্তানের গায়ের রঙ, চোখ-চুল কটা হবে না কালো অথবা নীল, সন্তান জড়-বুদ্ধিসম্পন্ন হবে না বুদ্ধিমান, সব কিছুই নির্ভর করে পিতা ও মাতার জীন কী অনুপাতে জন্ম-মুহূর্তে সন্তান দেহে প্রবেশ করেছে, তার উপর। শুধু পিতা-মাতা নয়, তাদের পূর্বপুরুষেরও। কীভাবে তা নির্ধারিত হয় এখনই তা আলোচনা করব।

জীবকোষকে ভেঙে পেয়েছিলাম সেল-নিউক্লিয়াস ; তার ভেতরে পাওয়া গেল ক্রোমোজোম। তারা নাকি জোড়ায়-জোড়ায় থাকে ; আর মাত্র এক-জোড়া হচ্ছে লিঙ্গ-নিয়ামক। এখন শুনছি, ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকে 'জীন'। কিন্তু তার আকৃতি কত বড় ? অথবা কত ছোট ? অণু বা পরমাণুর তুলনায় জীন কতটুকু ? এবার সেটা ধারণা করে নেওয়া যাক। ক্রোমোজোমের মাপ ধরুন 10^{14} ঘন সেন্টিমিটার। অর্থাৎ সেটি 1/10,00,00,00,00,00,000 ঘন সেন্টিমিটার। ঐ অত ক্ষুদ্র ক্রোমোজোমে জীন আছে কয়েক হাজার। অর্থাৎ জীনের আয়তন 10^{17} ঘন সেন্টিমিটার। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, একটি পরমাণুর গড় আয়তন 10^{23} ঘন সেন্টিমিটার। অর্থাৎ একটিমাত্র অতি ক্ষুদ্র জীনে লাখ-দশেক পরমাণু আছে।

যে প্রসঙ্গ থেকে এত কথার অবতারণা সেই মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক : 'শান্টিং এঞ্জিনটা কে চালায় ?'

এ পর্যন্ত জেনেছি যে, অধিকাংশ জীবের (যাদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদ আছে) জন্মমুহূর্তে মাতৃদেহের ডিম্বকোষে জনকদেহের শুক্রকোষ প্রবেশ করে সেটিকে নিষিক্ত করে। সেই নিষিক্ত ডিম্বটি 'এককোষী' ; তাতে আছে একটি কেন্দ্রস্থ 'সেল-নিউক্লিয়াস' (যার ভেতর নাকি ক্রোমোজোম, জীন ইত্যাদির অবস্থান, আরও কী-কী সব)। আরও জেনেছি, ঐ একমাত্র জীবকোষটি নিষিক্ত হবার পর দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুটি কোষ হয়, দুই থেকে চার, চার থেকে আট, ক্রমে ষোলো, বত্রিশ, চৌষট্টি – এভাবে গুণোত্তর শ্রেণীর আঁককষার ঢঙে অচিরেই কোটি কোটি জীবকোষ পয়দা হয়। গর্ভাবস্থাতেই তা ঘটতে শুরু করে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে আমৃত্যু। তৃতীয়ত জেনেছি, প্রতিটি কোষ দ্বিধাবিভক্ত হবার সময় সেল-নিউক্লিয়াসটিও দু-টুকরো হয়ে যায়, বলাবাহুল্য তার অভ্যন্তরস্থ ক্রোমোজোম ও জীনসহ। সেল-নিউক্লিয়াস-এর এক-এক টুকরো এক-একটি সন্তান-কোষে ঠাঁই পায়। জীবটির দেহ-বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। অথচ স্বচক্ষে দেখছি, বড় হলে এক-এক কোষ থেকে এক-একটি ভিন্ন ধরনের জীব পয়দা হচ্ছে। কোটি-কোটি কোষ-বিশিষ্ট পরিণত জীবটি শুধু তার বাপ-মায়ের ঢঙেই গড়ে উঠেছে—প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্য লাভ করছে। বাপ-মার যে বৈশিষ্ট্য ছিল, সন্তানেরও তাই থাকছে। কেউ হচ্ছে প্রজাপতি, কেউ পাখি, কেউ জিরাফ, কেউ জোনাকি। সবাই কিন্তু খেলা শুরু করেছিল একটি মাত্র কোষ থেকে : নিষিক্ত ডিম্বটি। সুতরাং স্বীকার করতে হবে যে, জন্মমুহূর্তেই জীবের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ঐ এককোষ-বিশিষ্ট নিষিক্ত ডিম্বে ছিল। গত শতাব্দীতে বিজ্ঞানীরা বলতেন—সেই বৈশিষ্ট্য ঐ ক্রোমোজোমে বিধৃত।

তাহলে দেখি, ক্রোমোজোমের উপাদান কী ?

ক্রোমোজোমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হচ্ছে 'নিউক্লিয়ো-প্রোটিন' ; অর্থাৎ

নিউক্লিক-অ্যাসিডের' সঙ্গে যুক্ত কিছু প্রোটিন অণু। আধুনিক জীববিজ্ঞান মনে করে ঐ নিউক্লিক-অ্যাসিড'ই জীবদেহের মূল নিয়ামক। তারই নির্দেশে 'শান্টিং এঞ্জিন'টা চলে। দুটি 'নিউক্লিক-অ্যাসিড' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ; তাদের দুজনেরই দুটি গালভরা ভালো-নাম আছে। বললেও এখন মনে থাকবে না। তবে ডাকনামটা শুনেছি—জীববিজ্ঞানের ছাত্র হই-না-হই। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার দুরূহ তত্ত্ব — রিলেটিভিটি, কোয়ান্টাম থিয়োরী, ব্ল্যাক হোল ইত্যাদি যেমন আমাদের কাছে পরিচিত শব্দ, তেমনি সুপরিচিত ঐ ডাকনাম দুটি : DNA এবং RNA!

ছোট্ট সহজ ফর্মূলা $E=mc^2$ যেমন আমাদের কাছে ডাল-ভাত, বিজ্ঞানের ছাত্র হই-না-হই ; তেমনি শিক্ষিত মানুষ মাত্রেই জানে DNA-র চেহারা হচ্ছে ডবল্-হেলিক্স—একজোড়া রেলিং-বিশিষ্ট স্পাইরাল স্টেয়ার-কেস্।

রসিকতা থাক। ব্যাপারটা দুরূহ — ঐ DNA আর RNA-র কাণ্ডকারখানা। আমরা এখন আছি জীববিজ্ঞানের 'ফার্স্টবুক' পর্যায়ে। সবে বানান করে পড়তে শিখছি—'এ ম্লাই ফক্স মেট্ এ হেন'। এখনি যদি বোঝাতে শুরু করি : কার্ল মার্কস-এর মতে মুরগীটা হচ্ছে শোষিত 'প্রোলিতারিয়েৎ' আর লেনিন আমাদের শিখিয়ে গেছেন— কীভাবে ঐ ধূর্ত শৃগালকে কব্জা করতে হয়, তাহলে ঘোড়ার আগে গাড়ি জোতা হয়ে পড়বে।

এখন তাই মোদ্দা কথাটা শুধু বলি :

ঐ DNA এবং RNA-র মাধ্যমে প্রতিটি জীবের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য—'জেনেটিক কোড' বংশপরম্পরায় বাহিত হয়।

প্রজনন তত্ত্ব

DNA, RNA অথবা জেনেটিক কোড-এর দুরূহ আলোচনা প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা পরিহার করেছি। পরবর্তী কোন অধ্যায়ে এ নিয়ে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা করতে হবেই। কিন্তু প্রজনন-তত্ত্বের বিষয়ে একটি মৌল ধারণা প্রথম থেকেই যদি না করি তাহলে জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা সম্ভবপর হবে না। অ্যামিনো-অ্যাসিড, পলিপেপটিড-শৃঙ্খল ইত্যাদির জটিলতা এড়িয়ে কিছু প্রতীকের মাধ্যমে মোদ্দা ব্যাপারটা এই পর্যায়েই বুঝে নেওয়া যায় কিনা সে চেষ্টা বরং করে দেখা যাক।

জীববিজ্ঞানের পরিভাষায় 'প্রজনন' মানে শুধুমাত্র জন্ম দেওয়া নয়। একটা বেড়াল বাচ্চা পাড়ল মানেই 'প্রজনন' সুসম্পন্ন হল না। যখন দেখব, একজোড়া বেড়াল—মাদী ও মদ্দা—আর একজোড়া 'হুলো-মিনি' পয়দা করতে পেরেছে তখনই জীববিজ্ঞানের ভাষায় 'প্রজনন-ক্রিয়া' সুসম্পন্ন হয়েছে বলা যাবে।

মনে রাখা দরকার, ব্যাপক অর্থে 'প্রজনন' শুধু যোগ বা গুণ-এর অঙ্ক নয়, তার সঙ্গে বিয়োগ বা ভাগের অঙ্কও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঐ যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ মিলে-মিশে একটি বিশেষ প্রজাতিকে দুনিয়ায় টিকিয়ে রাখে। একটা রুই মাছ হয়তো কয়েক লক্ষ বা কয়েক কোটি ডিম পাড়ে, তার ভিতর হয়তো মাত্র এক জোড়াই সাবালক হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে মাদী অ্যাল্‌বাট্রস গড়ে মাত্র চারটি ডিম পাড়ে ; একটা গণ্ডার গড়ে ছয়টি সন্তান প্রসব করে। কিন্তু প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে তারা প্রজনন-প্রক্রিয়া পরবর্তী প্রজন্মে

চালিয়ে যায়। দেখা গেছে, যাদের সন্তান সংখ্যা কম তারা পরিবেশীয় কুলুঙ্গিতে (জীববিজ্ঞানে যাকে ইংরাজিতে বলে ecological niches) সুদৃঢ়ভাবে ঠাঁই করে নিয়েছে, তারা বর্ধিত হতে সময় নেয় বেশি, আকারেও বড় হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে যারা অসংখ্য সন্তানের জন্ম দেয়—ডিমই হোক অথবা বাচ্চা—তারা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে, অল্পসময়ে বর্ধিত হয়, আকারেও তারা ছোট।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, দ্বিতীয় জাতের জীবের অধিক সন্তানপ্রসব একটা অহৈতুকী অপব্যয়। বাস্তবে তা কিন্তু নয়। প্রাকৃতিক নিয়মে এটারও প্রয়োজন আছে। ঐ যে রুই মাছ বা পোকা-মাকড়ের অযুত-নিযুত ডিম অপব্যয়িত হল মনে হচ্ছে তারাও প্রকৃতি-রাজ্যে তাদের অবদান দিয়ে গেছে—অন্যজাতের জীবের আহার-সরবরাহের কাজে।

এখানেই ঐ বিয়োগ বা ভাগ অঙ্কটির ভূমিকা।

এবার যোগ বা গুণ অঙ্কের প্রসঙ্গে আসি :

জীবকোষ দ্বিধাবিভক্ত হয় দুইভাবে।

প্রথমটিকে বলি : মাইটোসিস (mitosis)। এর দ্বারা জীবদেহের সামগ্রিক বৃদ্ধি ঘটে, ক্ষতস্থান বা বিনষ্ট অঙ্গে সুস্থ কোষ সৃষ্টি হয়। জনক-কোষ এবং অপত্য-কোষের আকৃতি হুবহু এক রকম হয়। তার অর্থ, ক্রোমোজোমস্থিত জীনগুলি সমান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য-কোষে স্থানলাভ করে। নতুন কোষ সর্বদাই বিভাজিত কোষের সমসংখ্যক ক্রোমোজোম লাভ করে। তার ফলে অপত্য কোষ হুবহু বাপ-কা-বেটা হয়।

দ্বিতীয় জাতের কোষ বিভাজনের নাম : মায়োসিস (meiosis)। এটি ঘটে থাকে লিঙ্গ-নিয়ামক জীবকোষে। সেখানে কোষটি দ্বিধাবিভক্ত হবার পূর্বে ক্রোমোজোমগুলি দ্বিধাবিভক্ত হয়। এবং অপত্যকোষে অর্ধেক-সংখ্যক ক্রোমোজোম চলে আসে। কারণটা সহজবোধ্য। উদ্ভিদ বা প্রাণী যাই হোক, স্ত্রী-জাতীয়ার ডিম্বের সঙ্গে পুরুষের শুক্রকোষের যখন মিলন ঘটে তখন দুটি সেল-নিউক্লিয়াস মিলিত হবে। তার অর্থ ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাওয়া। এতে পিতা-মাতার কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার চেয়ে সন্তানের কোষে ক্রোমোজোম ডবল হয়ে যাওয়ার কথা। পরের প্রজন্মে তার চারগুণ, তার পরের প্রজন্মে আটগুণ হয়ে যাবে। তা হলে তো চলবে না, কারণ প্রতিটি জীবের সেল-নিউক্লিয়াসে যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকার কথা। এ জন্যই এই 'মায়োসিস'-এর ব্যবস্থাপনা। গ্রীক ভাষায় 'meion' অর্থ ক্ষুদ্রতর, ফলে meiosis মানে ক্ষুদ্রতর হওয়া। এই প্রক্রিয়ায় নিষেকের পূর্বে মিলনেচ্ছু প্রতিটি লিঙ্গ-নিয়ামক কোষের ক্রোমোজোম আর জোড়ায়-জোড়ায় থাকে না। কোষ থেকে জন্ম নেয় কোষাণু বা 'গ্যামেট'—শুক্রকোষ থেকে শুক্রাণু (পুং-গ্যামেট) আর ডিম্বকোষ থেকে ডিম্বাণু (স্ত্রী-গ্যামেট)। তাতে জোড়-ভাঙা ক্রোমোজোম থাকে এক-একটি করে। যাতে ঐ দুটি মিলে যে ভ্রূণাণু বা জাইগোট (zygote) সৃষ্টি হয় তাতে অর্ধেক ক্রোমোজোম আসে বাবার কাছ থেকে আর বাকি অর্ধেক মায়ের কাছ থেকে। জোড়-ভাঙা আধা-আধা ক্রোমোজোম আবার জোড় বাঁধে। আধা যুক্ত আধা সমান এক!

মায়োটিক বিভাজন দুই স্তরে হয়ে থাকে। প্রথম দশায় সেল-নিউক্লিয়াস যখন বিভাজিত

হয় তখন ক্রোমোজোম সংখ্যা হ্রাস পেয়ে অর্ধেক হয়ে যায়। দ্বিতীয় দশায় জনক-কোষের সমসংখ্যক ক্রোমোজোম অপত্যকোষে ঠাঁই নেয়।

জীবসৃষ্টির আদিম পর্যায়ে—সেই যখন স্ত্রী-পুরুষে ভেদাভেদ ছিল না, তখন শুধুমাত্র মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীব বংশবৃদ্ধি করত। আজও বহু অমেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে ঐ ভাবেই কোষ বিভাজন হয়, বংশবৃদ্ধি ঘটে থাকে। যেমন অ্যামিবা—এক কোষ ভেঙে দুই কোষ হয় ; যেমন হাইড্রা, যার অঙ্গে আপনা থেকেই কুঁড়ি ফুটে ওঠে। তা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক জীব হয়ে যায়।

সৃষ্টি যদি নিরন্তর এভাবেই চলত তাহলে পৃথিবীতে জীব থাকত বহুতর ; কিন্তু তাদের বৈচিত্র্য থাকত না, বৈশিষ্ট্য থাকত না। প্রতিটি জীব হত তাদের পিতা-মাতার হুবহু নকল। বৈচিত্র্য সম্ভবপর হয়েছে যখন স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ হয়েছে। যখন মায়োটিক বিভাজন শুরু হয়েছে। স্ত্রী-সত্তা ও পুং-সত্তা এক দেহেও থাকতে পারে, তাদের প্রত্যক্ষ মিলন হতেও পারে, নাও হতে পারে—কিন্তু ঐ যে দুইয়ে মিলে এক হচ্ছে, মায়োটিক প্রক্রিয়ায় দুটি সত্তার গুণাগুণ অপত্যকোষে সঞ্চারিত হচ্ছে, তখনই সন্তান পিতা-মাতার গুণাবলী উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করতে পারছে। মিলন-মুহূর্তের ঠিক পূর্ববর্তী পর্যায়ে যখন শুক্রাণু ও ডিম্বাণুতে ক্রোমোজোমগুলি জোড় ভেঙে নতুন করে জোড় বাঁধছে তখনই 'জেনেটিক কোড'-এর বিভিন্ন নির্দেশ সন্তান-কোষে সঞ্চারিত হচ্ছে। সন্তান তার পিতা-মাতার, এমনকি ঠাকুর্দা, ঠাকুরমা, দাদু-দিদার জীনে প্রভাবিত হচ্ছে। জীবজগতে বৈচিত্র্য আসছে। সে বৈচিত্র্য প্রাকৃতিক নির্বাচনকে ত্বরান্বিত করছে। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যে খাপ খাওয়াতে পারল না সে ক্রমে মুছে যাচ্ছে, আর যে তা পারল সে বিবর্তনের পথে আর এক ধাপ এগিয়ে গেল।

'জেনেটিক কোড'-এর বার্তা কীভাবে প্রজন্মকে প্রভাবিত করে তা একটি চিত্রকল্পের মাধ্যমে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। বলাবাহুল্য এটা প্রতীকী-চিত্র, জটিলতা ও রাসায়নিক ফর্মূলা এড়িয়ে মোদ্দা ব্যাপারটা বোঝানোর উদ্দেশ্যে—

তিনটি প্রজন্ম দেখানো হয়েছে। পরপৃষ্ঠার চিত্রে। মনে করুন ঐ জীবটির মাত্র তিন-জোড়া ক্রোমোজোম।

প্রথম প্রজন্মে বাঁ-দিকে দেখা যাচ্ছে মাতামহের শুক্রাণু ও মাতামহীর ডিম্বাণু। যেহেতু তারা 'গ্যামেট', তাই ক্রোমোসোমগুলি জোড়-ভাঙা। মাতামহী ও মাতামহের তিনটি করে জেনেটিক-বার্তা আছে, যথাক্রম ক-বর্গের ও চ-বর্গের।

মিলনান্তে দেখছি, মাতামহীর নিষিক্ত ডিম্বাণু বা ভ্রূণাণুতে আবার এসেছে তিন-জোড়া ক্রোমোজোম, তাতে দু-পক্ষের জেনেটিক বার্তাই স্থান পেয়েছে। মাতামহীর গর্ভস্থ ভ্রূণাণুতে যেভাবে বার্তাগুলি ছিল তা অবিকৃত রইল মাতার জন্মের পর। মাতা বয়ঃপ্রাপ্তা হল। মানুষের ক্ষেত্রে পনের-বিশ বছর ধরে শুধুমাত্র মাইটোসিস বিভাজনই সংঘটিত হয়েছে। ফলে মাতৃদেহে ক্রোমোজোমের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তারপর মাতা বয়ঃপ্রাপ্তা হল। পিতার সঙ্গে মিলনের পূর্ব-মুহূর্তে মায়ের ডিম্বাণুতে দেখছি আবার ক্রোমোজোমগুলি জোড় ভেঙেছে। তা হোক, তাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বা জেনেটিক বার্তা অবিকৃতই আছে।

এইবার মায়ের সেই ডিম্বাণু মিলিত হল পিতার শুক্রাণুর সঙ্গে। পিতা এসেছে পরের

ঘর থেকে। তার ক্রোমোজোমে জেনেটিক-বার্তা হয়তো ভিন্নতর। ধরা যাক তা হচ্ছে 'ট-ঠ-ড'। এই দুটি গ্যামেটের মিলনে মাতার গর্ভে যে নিষিক্ত ডিম্বটি আশ্রয় পেল, দেখা যাচ্ছে তা আবার হয়তো তিনজোড়া। কিন্তু জেনেটিক বার্তা নানান-রকম ঠাঁই বদল করে এখন হয়েছে একজোড়া 'কচট' এক জোড়া 'খছঠ' এবং তৃতীয় জোড়া 'গজড'।
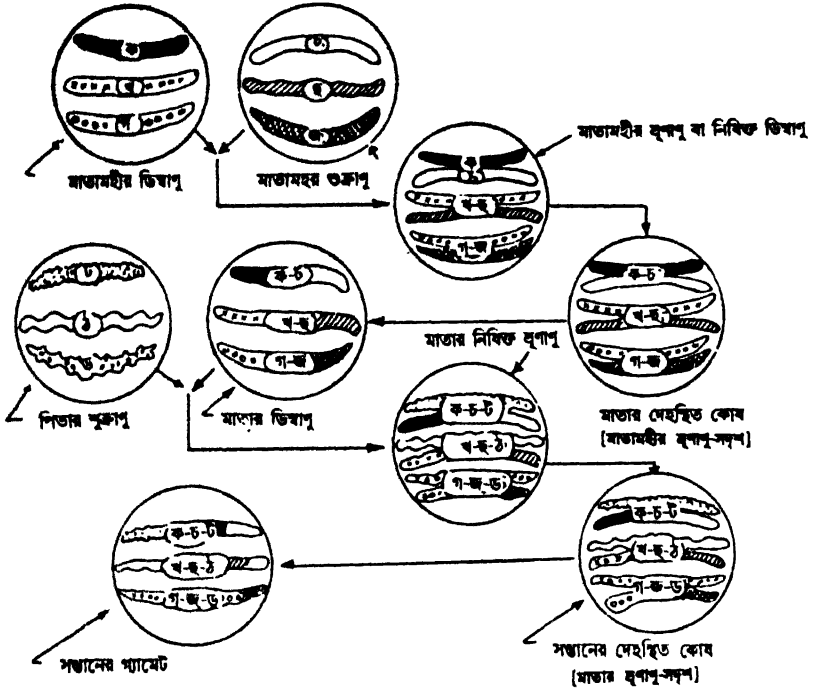
বংশানুক্রমিক জেনেটিক উত্তরাধিকার

একইভাবে এবার মায়ের গর্ভে ঐ নিষিক্ত ডিম্ব মাইটোসিস-বিভাজন প্রক্রিয়ায় বর্ধিত হতে শুরু করল। সন্তান ভূমিষ্ঠ হল, ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হতে থাকে ; কিন্তু যেহেতু তার বৃদ্ধি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায়, তাই তার প্রতিটি কোষে ঐ বার্তা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—'কচট, খছঠ, গজড'। যতদিন না সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হচ্ছে, বিবাহ করছে। তার মিলন-মুহূর্তের ঠিক পূর্ব-পর্যায়ে আবার হবে মায়োটিক বিভাজন। তার গ্যামেটে ক্রোমোজোম জোড় ভাঙবে। সে তখন তার জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনীর শুক্রাণু বা ডিম্বাণুর নয়া জেনেটিক বার্তার জন্য প্রহর গুণবে।

ইংরেজিতে একটা প্রবচন আছে : 'ব্যতিক্রমই নিয়মের পরিচায়ক।' সেই প্রবচনটি অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা বা রসায়নে তেমন খাটে না, কিন্তু জীব-বিজ্ঞানে তা বারে বারেই খেটে যায়। তাই বলি, এতক্ষণ স্ত্রী-পুরুষের মিলনের যে পর্যায়টি বর্ণনা করলাম তার বেশ কিছু ব্যতিক্রম আছে। পিঁপড়ে, মৌমাছি, শ্যামাপোকা ইত্যাদি ঐ বর্ণনা অনুযায়ী বংশবৃদ্ধি করে না। তা সেসব 'নিপাতনে সিদ্ধ' প্রসঙ্গ এখন বরং মুলতুবি থাক। আমরা বরং দেখি—এ পৃথিবীতে জীব কী-ভাবে প্রথম আবির্ভূত হল।

জীবের উৎপত্তি

পৃথিবীতে জীব কোথা থেকে এল?

জবাবটা বিজ্ঞান আজও সঠিক জানে না। তবে সময়টা আন্দাজ করতে পারি : আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ কোটি বছর আগে। কিন্তু কী লাভ সে বিষয়ে আলোচনা করে?

জবাবটা জানার দু-দুটি বাস্তব প্রয়োজনও আছে। প্রথম কথা : আমরা ইদানীং বহির্বিশ্বে জীবনের সন্ধান করছি : সে কাজে ও-জ্ঞানটা প্রয়োজনীয়। ঘরের খবরটা না জানলে পরের খবর জানার চেষ্টা করাটা বোকামি। দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞান টেস্ট-টিউবে জীবন পয়দা করতে চাইছে। সে পরীক্ষার জন্যও ওটা জানা দরকার। সুতরাং প্রশ্নটা 'তৈলাধার পাত্র' না 'পাত্রাধার তৈল' জাতীয় শুধুমাত্র তাত্ত্বিক নয়।

বহু পূর্বযুগ থেকে বিজ্ঞানীরা জানতেন যে, রাসায়নিক পদার্থগুলি দু-জাতের। একজাতের পদার্থে উত্তাপ প্রয়োগ করলে তাদের কোনও মৌল পরিবর্তন হয় না। যেমন লবণ, সীসা বা জল। উত্তাপ প্রয়োগ করলে সাধারণ লবণ হয়তো লাল হয়ে ওঠে, সীসা কঠিন থেকে তরল হয়ে যায়, আর জল তরল অবস্থা থেকে হয়ে যায় বাষ্প। কিন্তু উত্তাপ দেওয়া বন্ধ করে দেখি, ওরা তিনজনেই যে যার 'আমড়াতলার মোড়ে' ফিরে এসেছে। তার মানে পূর্বের অবস্থায়। দ্বিতীয় জাতের পদার্থে উত্তাপ প্রয়োগ করলে, তাদের 'পাকাপাকি' পরিবর্তন হয়, যার ফলে শীতল হবার পরেও তারা সচরাচর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে না। যেমন ধরুন, চিনি কিম্বা অলিভ তেল। ওদের তাতিয়ে দেখুন—কী কাণ্ডটা হয়। উত্তাপ হবার সময় চিনি সেই যে কালো হয়ে গেছিল, সেই কালিমা ঠাণ্ডা হলেও ঘোচে না। মনে হবে, চিনি বুঝি এক অতি-অভিমানী কিশোরী, একবার তাকে তাতালে আর তার টুকটুকে ফর্সা রঙটা ফিরে আসার যো নেই। কিম্বা অলিভ তেল। উত্তপ্ত করার পর সেই যে তিনি বাষ্পীয় বা গ্যাসীয় অবস্থায় উপে গেলেন, তাঁকে আর ঠাণ্ডা করে তরল অবস্থার সাবেক-ভিটেতে ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করে দেখেছিলেন, প্রথম জাতের পদার্থ পাওয়া যায় জড় জগৎ থেকে আর দ্বিতীয় জাতের পদার্থ আসে জীব বা উদ্ভিদ জগৎ থেকে। সুইডিশ্ বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াস তাই প্রথম জাতের পদার্থকে বললেন 'অজৈব পদার্থ' এবং দ্বিতীয় জাতের পদার্থগুলিকে 'জৈব পদার্থ'। গত শতাব্দীর প্রথম দশকে তাই জন্ম নিল দু-জাতের রসায়ন-বিজ্ঞান : ইন-অর্গ্যানিক আর অর্গ্যানিক। বার্জেলিয়াস আরও বললেন যে, অজৈব পদার্থ থেকে বিজ্ঞানাগারে জৈবপদার্থ জন্ম দেওয়া অসম্ভব, কারণ জৈবপদার্থের মৌল উপাদান হচ্ছে : প্রাণশক্তি বা 'ভাইটালিজম'।

বার্জেলিয়াসেরই এক ছাত্র কিন্তু এমন এক কাণ্ড করে বসলেন যাতে ঐ 'প্রাণশক্তি'র ধারণাটা বাতিল করতে হল। ছাত্রের নাম উলার। জার্মান বৈজ্ঞানিক। 1828 সালে তিনি তাঁর বিজ্ঞানাগারে অজৈবপদার্থ থেকে জন্ম দিলেন একটি জৈব-পদার্থের : ইউরিয়া। যা নাকি বার্জেলিয়াসের থিয়োরি অনুসারে শুধুমাত্র কোন জীবের কিড্‌নি থেকেই পয়দা হওয়া সম্ভব। ক্রমে বোঝা গেল— জৈব ও অজৈব পদার্থের পার্থক্যটা এ কারণে নয় যে, প্রথমোক্তদের উপাদান— 'প্রাণশক্তি'। সংজ্ঞাটা বদলে গেল। মেনে নেওয়া হল — জৈব পদার্থে

আবশ্যিকভাবে থাকবে কিছু কার্বন-পরমাণু এবং অন্যান্য মৌল পরমাণুর সঙ্গে মিলে-মিশে খুব জটিল রূপ ধারণ করার ক্ষমতা তার থাকবে। বার্জেলিয়াস-এর মূল তত্ত্বটা সংশোধন করে বলা যায় : জীবের দেহে জৈব-পদার্থ এক আবশ্যিক উপাদান ; শুধুমাত্র অজৈব পদার্থে জীবদেহ গঠিত হতে পারে না।

আমাদের মূল প্রশ্নে ফিরে আসি : জীব কী করে এল ?

বিজ্ঞান এ-প্রশ্নটা নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ভেবেছে কিন্তু খোলাখুলি আলোচনা করতে সাহস পায়নি। কারণটা সহজেই অনুমেয়। ধর্মযাজকদের প্রচার —'ঈশ্বরই তার একমাত্র কারণ'—এই মতটাকে তাহলে অস্বীকার করতে হয়। তবু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে —অর্থাৎ 'ঈশ্বরকে' না ঘাঁটিয়ে দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা এর সন্ধান করে গেছেন নিজেদের গণ্ডির ভিতর। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল বিশ্বাস করতেন —জীব স্বয়ম্ভু — অর্থাৎ আপনা থেকে জন্মেছে। ধর্ম-নিরপেক্ষ বিজ্ঞান মধ্যযুগে ঐ মতটাই মেনে এসেছে।

অ্যাকুইনাস, এবং নিউটনও তাই মানতেন।

এই মতবাদকে প্রথম খণ্ডন করলেন একজন ইতালিয়ান চিকিৎসক ফ্রাঁসেসকো রেডি, সপ্তদশ শতাব্দীতে। তিনি বাজার থেকে মাংস কিনে এনে দু-ভাগে ভাগ করে তাঁর গবেষণাগারে সংরক্ষণ করলেন। একটি ভাগ থাকল খোলা টেবিলে, একটি ভাগ থাকলো খুব ঘন জালতি দিয়ে ঘেরা 'জার'-এ। দেখলেন, খোলা মাংসটায় কিছুদিনের মধ্যেই ক্রিমি-জাতীয় পোকা জন্মালো, অথচ ঢাকা দেওয়া মাংসপিণ্ডে তা জন্মালো না।

উনি সিদ্ধান্তে এলেন — মাছির পায়ে অতি সূক্ষ্ম ক্রিমি-ডিম্ব এসে মাংসপিণ্ডে আশ্রয় পায়, খাদ্য পায়—এ কারণেই খোলা মাংসে ক্রিমি জন্মায়। জীব যদি 'স্বয়ম্ভু' হত তাহলে ঢাকা দেওয়া মাংসতেও ক্রিমি জন্মাতো।

পরে ইতালিয়ান বিজ্ঞানী স্প্যালাঞ্জানী এবং লুই পাস্তুর নিঃসন্দেহে প্রমাণ করলেন—ঐ 'স্বয়ম্ভু' থিয়োরিটা ভ্রান্ত। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরা জীবনের উৎস-সন্ধানে আর এক দিক থেকেও অগ্রসর হচ্ছিলেন। তার আদিসূরী রাশিয়ান বিজ্ঞানী ওপারিন। লেনিনের মৃত্যুর বছরে (1924) তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর গবেষণা-গ্রন্থ 'জীবনের উৎস সন্ধানে'। রাশিয়া তখন খ্রীষ্টান-জগতের ধার ধারে না, তাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতে তাঁর কোনও অসুবিধা হয়নি। এই যুগান্তকারী বইটির ইংরাজি অনুবাদ হতে সময় লাগল বারো বছর। 1936-এ তার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হল : The Origin of Life. 1907 সালে প্রকাশিত হয়েছিল আরও একটি গ্রন্থ Worlds in the Making, লেখক অ্যারেনিয়াস। তাঁর মতে—মৌল পদার্থগুলি (হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি) যেন অনাদিকাল ধরেই বিদ্যমান—জীবনও তাই।

'প্রাণশক্তি' বীজের (spore) আকারে অন্য কোনও গ্রহ থেকে ভাসতে ভাসতে মহাকাশ পাড়ি দিয়ে এসেছে—যেভাবে কাপাস-তুলোর বীজ বাতাসে ভাসতে ভাসতে দূরে চলে যায়। কোন অতিদূর প্রান্ত থেকে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল তা জানা যায় না।— হয়তো এভাবে তা সব গ্রহে-উপগ্রহেই গিয়ে পড়ে, যেমন পড়ে সূর্যের আলো বা মহাজাগতিক রশ্মি। পৃথিবীর আবহাওয়া অনুকূল হওয়ায় সেই প্রাণশক্তির বীজ বিকশিত হয়ে উঠবার অবকাশ পেয়েছিল।

আপাতদৃষ্টিতে এ মতটা আকর্ষণীয় ! কিন্তু 1910 সালে দেখা গেল মহাকাশে বেগুনিপারের আলোয় (আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি) ও-জাতীয় বীজ টিকে থাকতে পারে না। পৃথিবীর চারিদিকে 'ওজন'-এর 'রক্ষা-চন্দ্রাতপ' আছে বলেই ঐসব মারাত্মক রশ্মি — আলট্রা-ভায়োলেট-রশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি, সৌর-এক্সরে প্রভৃতি — পৃথিবীর জীবকে ধ্বংস করতে পারে না।

প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে একটা কথা বলি। এখনি হয়তো তার অর্থ বোঝা যাবে না। তা হোক, মার্জিনে না হয় পেনসিলে একটা (?) দিয়ে রাখুন। পরে যখন জীবনের মূল উপাদান বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব তখন এই তথ্যটার অর্থ বোঝা যাবে।

1970-এ, জীববিজ্ঞানী সিরিল পোনামপেরুমা একটি উল্কাখণ্ড নিয়ে গবেষণা করতে করতে এক অদ্ভুত তথ্য আবিষ্কার করেছেন। ঐ উল্কা-খণ্ডটি পড়েছিল অস্ট্রেলিয়াতে 28.9.1969 তারিখে। অতি সযত্নে বিশ্লেষণ করে তিনি ঐ উল্কাখণ্ডে পাঁচটি 'অ্যামিনো-অ্যাসিড'-এর অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন। তারা হল —গ্লাইসিন, অ্যালানিন, গ্লুটামিক-অ্যাসিড, ভ্যালিন, এবং প্রোলিন। তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন এই অ্যামিনো-অ্যাসিডগুলি—যা নাকি জীবদেহে পাওয়া যায়—উল্কাখণ্ডটি পৃথিবীর সংস্পর্শে আসার পর উল্কা-দেহে প্রবেশ করেনি। উল্কাদেহে ঐ অ্যামিনো-অ্যাসিডগুলির উপস্থিতির ব্যাখ্যা একটাই : ঠিক যেভাবে, আমরা পরপৃষ্ঠায় দেখব, মিলারের কাচের ফ্লাস্কে তারা পয়দা হয়েছিল।

আগের অনুচ্ছেদে আমরা জেনেছি যে, জীবদেহে দুটি উপাদানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত প্রোটিন। দ্বিতীয়ত নিউক্লিক অ্যাসিড। প্রোটিন শুধু জীবদেহের কাঠামোটা রচনা করে না, তারা 'এনজাইম'-এর ভূমিকাটুকুও পালন করে। এনজাইম —আগেই বলেছি — ঘটকের ভূমিকা পালন করে। এনজাইম (যা প্রোটিনই) অনেক কাজের সঙ্গে 'নিউক্লিক-অ্যাসিড' পয়দা করে নিজে অপরিবর্তিত থেকে। কী-ভাবে করে তা আগেই বোঝাবার চেষ্টা করেছি, আবার না হয় একটি চিত্রকল্পে বোঝানোর
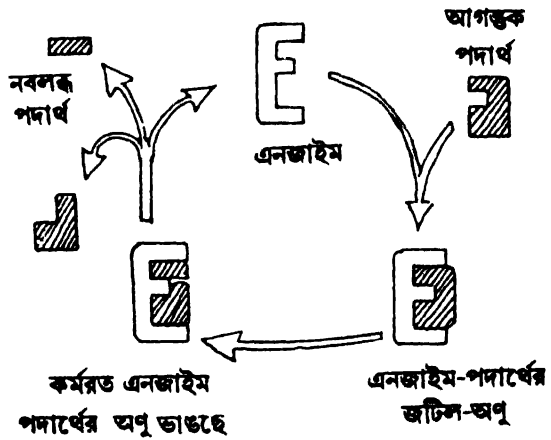
এনজাইম-এর অনুঘটন

চেষ্টা করি : এই বিক্রিয়ায় মনে হচ্ছে এনজাইম যেন একটি জৈব-অণুকে ক্যাঁক করে ধরে খাঁজে-খাঁজে পাকড়াও করে দুটি অণুতে ভাগ করে ছেড়ে দিচ্ছে—নিজে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থেকে —দ্বিতীয় আর একটি অনুরূপ অণুকে পাকড়াও করবার মতলবে।

আমরা জেনেছি—পরে তত্ত্বটা আরও ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করব— 'জীন'-এ অবস্থিত ঐ নিউক্লিক অ্যাসিডগুলি তাদের বিন্যাসের কায়দায় জীব-বিশেষের 'ব্লু-প্রিন্টের' কাজ করে। DNA, RNA-র মাধ্যমে ঐ নিউক্লিক-অ্যাসিডগুলির বিভিন্ন বিন্যাসছন্দ বংশানুক্রমিকভাবে জীবের বৈশিষ্ট্যগুলি টিকিয়ে রাখে। তার অর্থ আমরা একটি 'বিষচক্রের' পাল্লায় পড়েছি : প্রোটিন নির্ভর করে নিউক্লিক-অ্যাসিডের উপর এবং নিউক্লিক-অ্যাসিড প্রোটিনের উপর নির্ভরশীল। মোটামুটি বলা যায়, এই 'বিষচক্র'টা ভেঙে ফেলতে পারলেই আমরা সমাধানে পৌঁছতে পারব — কীভাবে এই পরস্পর-নির্ভরশীলতার চক্রটা শুরু হয়েছিল। প্রশ্নটা যেন : মুরগী আগে, না ডিম আগে ? অর্থাৎ কোনটা আগে জন্মেছে— প্রোটিন, না নিউক্লিক-অ্যাসিড ? নাকি দুজনেই একসঙ্গে পয়দা হয়েছে ? কিন্তু তা কেমন করে হবে ? প্রথম প্রোটিন কীভাবে জন্মাবে, যদি তার পূর্বে নিউক্লিক-অ্যাসিড না পয়দা হয়—কারণ তারাই তো প্রোটিনের 'ব্লু-প্রিন্ট', 'টেমপ্লেট', বিন্যাসছন্দের মূলসূত্র ? আবার উল্টো দিকেও একই প্রশ্ন। নিউক্লিক-অ্যাসিড আগে জন্মাবে কী-ভাবে ? প্রোটিনের 'এনজাইম' সত্তাই তো নিউক্লিক-অ্যাসিডকে জন্ম দেবে। ছবিতে যেভাবে দেখা যাচ্ছে।

এছাড়া আরও একটি সমস্যা আছে : শক্তি উৎস। 'প্রাণধর্মের' বা জৈবিক বিপাকের (metabolism) জন্য শক্তি আবশ্যিক।

প্রোটিন এবং নিউক্লিক-অ্যাসিড দুজনেরই আবির্ভাব তখনই সম্ভব যখন বাহির থেকে শক্তির যোগান হবে। বর্তমান পৃথিবীতে সেই শক্তি হচ্ছে সূর্য। সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায়—ব্যাপারটা পরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব—উদ্ভিদ সৌরশক্তিকে কাজে লাগায়। অন্যান্য প্রাণী এজন্য উদ্ভিদ-জগতের কাছে ভিখারী। সালোক-সংশ্লেষ ব্যাপারটায় অনেক জাতের এনজাইম কাজ করে। পৃথিবীর আদিম অবস্থায় যখন উদ্ভিদ ছিল না তখন জীবনের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে সৌরশক্তিকে কে কীভাবে কাজে লাগালো ?

প্রত্যাশিতভাবেই সমস্যাটি সমাধান করতে দুটি বিভিন্ন বিশ্লেষণ-ধারা জন্ম নিয়েছে। একটিকে বলা যেতে পারে প্রোটিন-জ্যেষ্ঠ অভ্যুপগম (Protein-First Hypothesis); অর্থাৎ প্রথম দলের মতে 'প্রোটিন' আগে এসেছে ; দ্বিতীয় দলের মতে 'জীন' বা 'নিউক্লিক-অ্যাসিড' হচ্ছে বয়ঃজ্যেষ্ঠ। কোন মত জিতবে ? ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের এই প্রথম ম্যাচটির ধারা বিবরণ দেওয়ার আগে আসুন খেলার মাঠটিকে প্রথমে বিচার করে দেখি— অর্থাৎ যে পটভূমিকায় এই সম্ভাবনাদ্বয়কে বিচার করছি :

ইতিপূর্বেই বলেছি যে, জীব আবির্ভাবের পূর্বযুগে — ধরুন চার-সাড়ে চার শ' কোটি বছর আগে—পৃথিবী-বেষ্টনকারী আকাশে কী কী উপাদান ছিল এ নিয়ে বিজ্ঞানীরা দ্বিমত। সেখানে তখন মুক্ত অক্সিজেন ছিল না—এ কথা সবাই মেনে নিয়েছেন। এক দল বলছেন, মূল উপাদান ছিল—অ্যামোনিয়া (NH_3), মিথেন (CH_4) এবং জল (H_2O); অন্য দল বলছেন, তখন সেখানে মূল উপাদান ছিল কার্বন মনোক্সাইড (CO), কার্বন ডায়োক্সাইড (CO_2), নাইট্রোজেন (N_2) এবং হাইড্রোজেন-অণু (H_2)।

এবার লিপিবদ্ধ করি মিলার-সাহেবের একটি বিচিত্র পরীক্ষার কথা। মিলার হচ্ছেন উরের ছাত্র। মিলার দেখতে চাইলেন, গবেষণাগারে পৃথিবীর তদানীন্তন পরিমণ্ডল কৃত্রিমভাবে তৈরী

করে অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থ, বিশেষ করে 'অ্যামিনো-অ্যাসিড' পাওয়া যায় কি না (1959)।

একটি কাঁচের পাত্রে তিনি ঐ অজৈব পদার্থগুলিকে (যেগুলি আদিম পার্থিব পরিমণ্ডলে ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে, সেগুলি) রেখে উত্তাপ দিতে থাকেন। পরে ওতে কিছু বিদ্যুতের স্পার্ক দিলেন— শক্তির উৎস যোগান দিতে। আদিম পৃথিবীতে যেমন বিদ্যুৎ, সৌর বা আলট্রা-ভায়োলেট রেডিয়েশন হত। সপ্তাহখানেক পরে তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন, অবশিষ্ট পদার্থে তিনটি অ্যামিনো-অ্যাসিড পাওয়া গেছে। তার ভিতর গ্লাইসিন ও অ্যালানাইন সরলজাতের অ্যামিনো-অ্যাসিড ; জৈব রসায়নে তাদের ভূমিকা সামান্যই। কিন্তু তৃতীয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যামিনো-অ্যাসিড অ্যাডেনাইন। তখন অনেকেই ভাবলেন যে, তাহলে আদিম পার্থিব পরিমণ্ডলে ঐ পদার্থগুলিই ছিল : অ্যামোনিয়া, মিথেন ও হাইড্রোজেন।
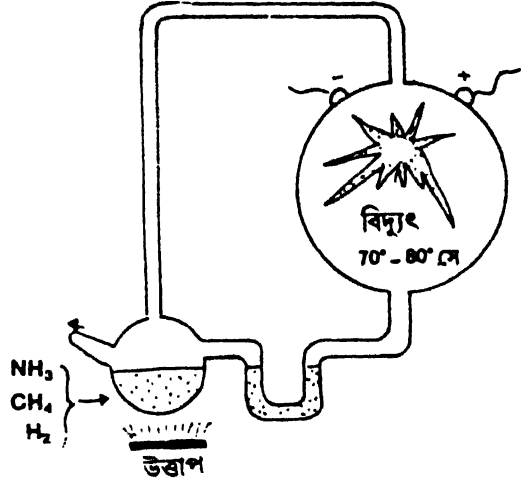
বিজ্ঞানাগারে জীবসৃষ্টির প্রয়াস

ইস্টবেঙ্গল তখন এক গোলে জিতছে।

গোলটা শোধ দিলেন অ্যাবেলসন 1966 সালে। প্রমাণ করলেন -- আদিম পার্থিব পরিমণ্ডল যদি দ্বিতীয় জাতের হত, তাহলে তা থেকেও অ্যামিনো-অ্যাসিড পাওয়া অসম্ভব হত না। তিনি দেখালেন CO, N_2, এবং H_2 থেকে হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড (HCN) পাওয়া সম্ভব। এবং ঐ সঙ্গে ফর্মাল্ডিহাইড (HCHO)।প্রথমটি, অর্থাৎ হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিডকে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির সংঘাতের সম্মুখীন করলে তা থেকে অন্তত ষোলো রকমের অ্যামিনো-অ্যাসিড পাওয়া সম্ভব। এখানে প্রসঙ্গত বলে রাখি, রসায়নবিদ্যায় সর্বমোট মাত্র কুড়িটি অ্যামিনো-অ্যাসিড-এর নাম আছে। তার পাঁচভাগের চারভাগ তিনি এভাবে পেয়েছেন। ঐ ষোলোটি অ্যামিনো-অ্যাসিডের ছয়টি জীবদেহ গঠনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (গ্লাইসিন, অ্যালানাইন, সেরিন, থ্রিয়োনাইন, অ্যাসপাটিক-অ্যাসিড, ও গ্লুটামিক অ্যাসিড)। উনি আরও প্রমাণ করলেন HCN এবং H_2O থেকে সরাসরি কিছু পলিপেপটিক শৃঙ্খল পাওয়া সম্ভব। অর্থাৎ অ্যামিনো-অ্যাসিডের ধাপ ডিঙিয়ে, ঠিক যেমন লাইনোটাইপ মেশিনে অক্ষরের ধাপ ডিঙিয়ে সরাসরি গোটা লাইন পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত তিনি যা বলেছেন তাতেই মিলার সাহেবের দেওয়া গোল শোধ হয়েছে। তিনি দেখালেন—শুধু HCN নয়, তিনি পয়দা করেছেন HCHO, অর্থাৎ 'ফর্মাল্ডিহাইড'। তাকে উত্তপ্ত করলে পাওয়া যায়

শর্করা—যা জীবদেহের আর এক আবশ্যিক উপাদান।

বিজ্ঞান মেনে নিল : খেলা ড্র।

তার মানে, দুটি বিকল্প সম্ভাবনাই জীবের পক্ষে অনুকূল।

তথাকথিত 'প্রাণশক্তি'র সাহায্য ছাড়াই রাসায়নিক বিক্রিয়ায়, শক্তি উৎসের সন্ধান পেলে 'জীবন'-এর বেশ কিছু উপাদান ল্যাবরেটারিতেই উৎপন্ন করা সম্ভব। খুব সম্ভবত পৃথিবীতে সেটাই ঘটেছে— আদিম পার্থিব পরিমণ্ডলে—দুটি বিকল্পের যেটাই হোক না কেন।

আজ থেকে আন্দাজ সাড়ে তিনশ কোটি বছরেরও আগে এভাবেই সমুদ্রগর্ভে জন্ম নিয়েছিল কিছু কার্বন-অণুর যৌগিক পদার্থ, অ্যামিনো-অ্যাসিড, অ্যামিনো-অ্যাসিডের চেন বা পলিপেপটিক-শৃঙ্খল, শর্করা আর তার সঙ্গে নাইট্রোজেন বা ফসফরাসের যৌগিক অণু। এরা কেউই 'জীব' নয়, 'জীবন' নয়, — বলা যায়, এরা ভবিষ্যৎ জীবনের আবশ্যিক উপাদান মাত্র।

ভাষান্তরে : জীবনের সম্ভাবনা।

'বিবর্তন' শব্দটা আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। 'আপেক্ষিকতাবাদ' প্রসঙ্গ উঠলেই যেমন মনে পড়ে আইনস্টাইনকে, তেমনি 'বিবর্তনবাদ' প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে মনে পড়ে যায় সেই দাড়িওয়ালা মানুষটিকে : চার্লস ডারউইন। তাঁর বিবর্তনবাদের কথা আমরা পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। আপাতত বলি : ডারউইন-বর্ণিত জীব বিবর্তনের পূর্বযুগে একটি 'অজৈব-বিবর্তন' সংঘটিত হয়েছিল। তার ইংরেজি নাম : Chemical Evolution. আমরা বাঙলায় তাকে 'রাসায়নিক বিবর্তন' বলতে পারি।

আমরা জেনেছি, কী-ভাবে জীবনের সম্ভাবনাময় কিছু যৌগিক পদার্থ সৃষ্ট হয়ে আদিম সমুদ্রে ভাসতে থাকে। সে আমলে তা সহজে বিনষ্ট হবার আশঙ্কা ছিল না। না ছিল কোন বড় জাতের সামুদ্রিক প্রাণী যে খেয়ে ফেলবে, না কোনও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাক্‌টিরিয়া যে পচনকার্য ত্বরান্বিত করবে। না ছিল বায়ুমণ্ডলে কোনও মুক্ত অক্সিজেন যে তাকে 'অক্সিডাইজ' করে ভেঙে ফেলবে। নষ্ট করে ফেলার একটা আশঙ্কা অবশ্য ছিল— মহাকাশ থেকে ভেসে আসা নানারকম তেজস্ক্রিয় রশ্মি। কিন্তু সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গে নিশ্চয় যৌগিক পদার্থের কিছুটা অংশ চলে গিয়েছিল সমুদ্রের গভীরে, যেখানে ঐ তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাব ছিল না। সিংহলী বিজ্ঞানী পোন্নামপেরুমার মতে তখন সমুদ্রের মাত্র এক-শতাংশ পূর্ণ হয়েছিল ঐ জাতের যৌগিক পদার্থে। তা যদি হয়, তাহলে ঐ বৈজ্ঞানিকের হিসাবমতো প্রাণ সম্ভাবনাময় জৈব-রসায়নের যৌগিক পদার্থ-মিশ্রিত 'প্রাণপঙ্ক'টির ওজন এক লক্ষ কোটি *(10^{12}) টনও ছাপিয়ে যাবে। এত বিরাট প্রাণপঙ্কে এত দীর্ঘ সময়ে (কোটি বছর) সবরকম* 'পার্মুটেশন কম্বিনেশন'ই সম্ভবপর!

একটা কৈফিয়ৎ এখানেই দিয়ে যাই। ঐ নামকরণটির বিষয়ে : 'প্রাণপঙ্ক'।

ওর ইংরেজি নাম : Organic Soup.

'সূপ' শব্দটা একই অর্থে সংস্কৃতেও আছে। ভীম ছিলেন ভালো রাঁধুনি —সূপকার ; ফলে ভবিষ্যতে পরিভাষা বিশারদেরা হয়তো ওর নামকরণ করবেন : জৈব সূপ।

তা হোক, আমরা ওকে 'প্রাণপঙ্ক'ই বলে যাব। 'পঙ্ক' শব্দটা 'পঙ্কজ' শব্দের উপাদান

বলেই শুধু নয় — সত্যেন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করে। মহৎ প্রাণের সম্ভাবনা যেখানে আছে সেখানে 'পঙ্ক' অগৌরবের নয়। নফর কুণ্ডু তার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ।

নফর কুণ্ডু কে? নিতান্ত সাধারণ একজন ছা-পোষা কেরানি। কিন্তু কলকাতা শহরে তাঁর নামে একটি গলিরাস্তা আছে। কেন তাই বলি : অফিস যাবার পথে নফর কুণ্ডু মশাই দেখলেন মাঝরাস্তায় একটা মানুষের ভীড়। কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলেন— কী হয়েছে? কে একজন বললে, ঐ ম্যানহোলে একটা ম্যাথর নেমেছিল ময়লা সাফা করতে। আর উঠে আসছে না। বোধহয় বিষাক্ত গ্যাসে.....

বাকিটা নফর কুণ্ডু শোনেননি। 'ছাতাটা ধরতো' বলে অপরিচিত একজনের হাতে ছাতাটা দিয়ে নেমে গিয়েছিলেন সেই পঙ্ককুণ্ডে (1907)। আর উঠে আসেননি। সংবাদপত্রে এ খবর পড়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথ একটি চতুর্দশপদী রচনা করেছিলেন সেই মহাপ্রাণ কেরানির উদ্দেশ্যে। লিখেছিলেন, 'নফর নফর নয়, একমাত্র সেই তো মনিব, নফরের দুনিয়ায়....'।

লিখেছিলেন, '—পঙ্কে সে মানেনি অগৌরব, সে শুধু মানসচক্ষে দেখেছিল বিপন্ন মানব!'

'প্রাণপঙ্ক' তাই অগৌরবের নয়। তাতেই পঙ্কজের মতো ফুটে উঠবে মানুষ এবং না-মানুষেরা।

প্রাণপঙ্কে যে পদ্মটা ফুটবে—'জীবন', তার স্বরূপ কী? জীবনের জন্য চাই একটা কাঠামো, চাই শক্তির উৎস, এবং বংশানুক্রমে একই ছন্দে প্রবাহিত হবার ক্ষমতা। কাঠামোটা জোগান দেবে 'প্রোটিন', শক্তির যোগান দেবে শর্করা এবং জৈব-ফসফেট্‌রা, আর বংশপরম্পরায় 'জীবনবার্তা' পরিবহন করবে 'জীন' তার জেনেটিক কোড-এ। এই শেষোক্তের দায়িত্ব যৌথভাবে বর্তাবে প্রোটিন ও নিউক্লিক-অ্যাসিড-এর উপর।

প্রোটিন হচ্ছে অ্যামি অ্যাসিড দ্বারা গঠিত একজাতের 'পলিমার' (stereopolymer)। আমরা আগেই দেখেছি, প্রোটিন জন্ম নেবার আগে উৎপন্ন হয়েছিল পলিপেপ্‌টিক্‌-শৃঙ্খল — অর্থাৎ বিভিন্ন অ্যামিনো-অ্যাসিডের মালা। পলিপেপ্‌টিড খুব সম্ভবত উৎপন্ন হয়েছিল অ্যামিনো-অ্যাসিড থেকে, জল-অণু সরিয়ে (dehydration condensation)। প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক গঠনটি গুরুত্বপূর্ণ, যাতে অ্যামিনো-অ্যাসিডের বিন্যাসছন্দটি 'জেনেটিক কোড' দ্বারা বাহিত হতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই বিন্যাসছন্দটি পর্যায়ক্রমে বিবর্তিত হয়েছিল অনেক পরবর্তী যুগে।

আদিমতম পর্যায়ে জীবনের বিকাশ নির্ভর করছিল প্রোটিনের সঠিক গঠনের উপর। সেটা নির্ভর করে অ্যামিনো-অ্যাসিডের বিন্যাসছন্দে। জীবন-বিকাশের জন্য 'শক্তির'ও প্রয়োজন। তার মূল উৎস 'সূর্য' আবহমানকাল ধরেই আছে; কিন্তু সৌরশক্তির যোগানদার 'উদ্ভিদ' তখনো রঙ্গমঞ্চে আসেনি; 'ফটো-সিন্থেসিস' বা সালোক-সংশ্লেষ-এর কারবার খুলে বসেনি। তা হোক, প্রাণপঙ্কে ছিল শর্করা এবং একটি যৌগিক ফসফেট, যার ডাকনাম ATP; তারা শক্তির যোগান দিতে সক্ষম।

এই অবস্থায় এখন বিচার করে দেখি—কে বড়দা, কে ছোড়দা? অগ্রজ কি ঐ বিন্যাসছন্দটি, না কাঠামোটি? জীন না প্রোটিন?

জীন-জ্যেষ্ঠ অভ্যুপগম

এই মতের প্রবক্তারা বলেন জীবন শুরু হয়েছিল 'জীবন্ত-অণু' (Living molecule) হিসাবে। তাকে বলা হয় 'নগ্ন জীন' (naked genes) : তাদের আবশ্যিকভাকে থাকতে হবে তিনটি গুণ : (1) স্বয়ং-দ্বিত্বলাভের ক্ষমতা অর্থাৎ স্বয়ং-প্রজনন (2) রূপান্তরিত হবার দক্ষতা (capable for mutation) এবং (3) পারিপার্শ্বিককে প্রভাবান্বিত করার ক্ষমতা, যাতে টিকে থাকতে পারে, টিকে থাকার উপাদান আশপাশ থেকে সংগ্রহ করতে পারে।

প্রথম ও তৃতীয় গুণটি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না ; কিন্তু 'মিউটেশন' ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। ঐ তথাকথিত জীবন্ত-অণু যদি রূপান্তরে (mutation-এ) সক্ষম হয়, এই 'মিউটেশান' ধর্মটা বিবর্তনের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যিক। 'মিউটেশান' যদি হয় তবেই দু-জাতির মধ্যে প্রাকৃতিক নির্বাচনে একটি জিতবে, একটি হারবে। বিবর্তন যেহেতু প্রত্যক্ষ সত্য, তাই জীবের পক্ষে 'মিউটেশান-ধর্ম' আবশ্যিক গুণ। কিন্তু বিচার বিবেচনা করে দেখা গেল—জীবন্ত-অণুর ঐ তিনটি আবশ্যিক গুণ সমন্বিত হতে হলে তাকে অনুঘটক রূপে কাজ করতে হবে। অর্থাৎ 'এনজাইম' যে কাজটা করে। নগ্ন-জীন বা জীবন্ত-অণুর পক্ষে এ কাজটা কিছুতেই সম্ভবপর বলে মেনে নেওয়া গেল না। তার ফলে 'জীন-জ্যেষ্ঠ অভ্যুপগম'টি গৃহীত হল না। সোজা কথায় জীবের আগে 'নগ্নজীন' আসেনি।

প্রোটিন-জ্যেষ্ঠ অভ্যুপগম

ওপারিন, হ্যালডেন, ফক্স প্রভৃতি জীববিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখালেন যে, কোন কোন 'অবদ্রব'-এর (ইমালশান = emulsion) এমন গুণ আছে যাতে তারা জটিল অণু সৃজন করে ফাঁপা গোলক তৈরী করতে পারে। এই ফাঁপা গোলকের ভিতর ও বাহির অংশের মাঝখানে একটি পর্দা বা আবরণ থাকে। এই গোলকগুলিকে বলে Coacervate droplets. আমরা 'molecular coacervate'-এর বাঙলা হিসাবে 'আণবিক সমাশ্লেষ' শব্দটি ব্যবহার করছি। ফাঁপা-গোলকের ঐ পর্দাটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভবিষ্যতে যাকে বলব, 'জীবনধর্ম', অর্থাৎ প্রত্যেকটি জীবের সেল-নিউক্লিয়াসের স্ট্রং-রুমে লুক্কায়িত 'জেনেটিক কোড', তাকে বাইরের দুনিয়ার এলোমেলো হাওয়া থেকে পৃথক করার জন্য একটা আবরণ দরকার। দেখা গেল, 'আণবিক সমাশ্লেষ'-এ সেটা এসেছে।

ফক্স দেখালেন (1955) অ্যামিনো-অ্যাসিডকে অনার্দ্র (anhydrous) অবস্থায় উত্তপ্ত করলে কিছু প্রায়-প্রোটিন বস্তুকে পাওয়া যায়। তাদের নাম দেওয়া হল 'প্রোটিনয়েড'। প্রোটিন-এর অনেকগুলি গুণই ওর আয়ত্তাধীন। আবার অনেকগুলি গুণ নেই, যেমন প্রোটিনের সেই প্যাঁচানো দেহের গঠনছন্দ—কর্কস্ক্রুর মতো, বা 'স্পাইরাল স্টেয়ার্-কেস'-এর মতো (helical structure)।

প্রোটিনয়েডকে পর্যায়ক্রমে উত্তপ্ত ও শীতল করে জলে ছেড়ে দিলে দেখা যায় জলে ভাসছে অতি ক্ষুদ্র কিছু গোলক। দেখতে কেমন জানেন ? তেলে-জলে মিশিয়ে খুব ঝাঁকালে যেমন ছোট ছোট গোলক দেখা যায়। এগুলি অবশ্য আকারে অনেক অনেক ছোট। তাই ওর নাম হল 'মাইক্রোগোলক' (microspheres)। এই কৃত্রিমরূপে উৎপন্ন 'মাইক্রোগোলক'

কত ছোট ?

প্রায় জীবাণুর (bacteria) মাপ।

বিজ্ঞানী ইয়াং বললেন (1955), 'মাইক্রোগোলকগুলি কোয়াসার্ভেটের (আণবিক সমাশ্লেষ) চেয়ে বেশী স্থায়ী (stable) এবং পৃথিবীর আদিমতম অবস্থার অনুরূপ পরিমণ্ডলে এদের সৃষ্টি করা গেছে।' মাইক্রোগোলকগুলি জীবকোষের অনেকগুলি গুণ লাভ করেছে দেখছি। এরা 'বিভাজন'-এ সক্ষম (capable to divide by fission)। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দেখা গেল জীবকোষের অনুরূপ এদেরও চারিদিকে দু-পর্দার চাদর আছে। যদিও ঐ পর্দায় (membrane-এ) কোনও চর্বিজাতীয় পদার্থ নেই, যা থাকে জীবকোষের বহিঃস্থ আবরণে (cell-membrane)। দস্তার উপস্থিতিতে মাইক্রোগোলকগুলি ATP (adinosine triphosphate)কে বিভাজিত করতে সক্ষম। এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উত্তরণ। কারণ ATP বিভাজিত হয়েই শক্তির যোগান দেয়। সুতরাং একে 'কোষপ্রতিম' (precell) বলা যেতে পারে।

কোষপ্রতিম (Precells)

আণবিক সমাশ্লেষ থেকে কোষপ্রতিমে উত্তরণ (formation of precells from molecular coacervates) ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল। কী করে, কেন হল, বুঝিয়ে বলা মুশকিল। এর আগেও 'অজৈব বিবর্তনের' আর একটি ধাপে আমরা সেই জটিলতার সম্মুখীন হয়েছিলাম, যখন ধরে নিয়েছিলাম—কোন একটি কারণে প্রাণপঙ্কে জটিল কার্বন যৌগিক পদার্থ জন্ম নিয়েছিল। এত-এত মৌলিক পদার্থের মধ্যে প্রকৃতি কেন যে কার্বনকে বেছে নিল তা কেউ আন্দাজ করতে পারে না। প্রকৃতি যদি কার্বনের বদলে সিলিকন বা ফস্‌ফরাসকে বেছে নিত তাহলে কি তারাও জটিল জৈব অণু নির্মাণ করতে পারত না ? কেউ এ প্রশ্নের জবাব জানে না।

ঠিক তেমনিভাবে আমরা জানি না—কেন কীভাবে 'সমাশ্লেষ' কোষপ্রতিম রূপ পরিগ্রহ করল। খুব সম্ভবত এটা প্রকৃতির খেয়ালে 'ঝপ করে' একবারে হয়েছে। দীর্ঘদিনের বিবর্তনে নয়। ঘোরাতে ঘোরাতে নিতান্ত আন্দাজে যেমন 'রুবিক-কিউব' এর সব কিছু হঠাৎ মিলে যেতে পারে ; ঠিক তেমনি ভাবে কোন কিছু হঠাৎ ঘটে গেছিল। কিন্তু একবার তা ঘটে যাওয়ার পরেই প্রকৃতি স্বয়ং তাকে তুলে নিল নিজের হাতে—ঐ 'অজৈব বিবর্তনবাদের' প্রাকৃতিক নির্বাচনে। অর্থাৎ কোষপ্রতিম যখন 'মিউটেশানে' দড় হল তখন প্রাকৃতিক নির্বাচনে (natural selection) স্থির হতে থাকে কে টিকে থাকবে, কে মুছে যাবে। কোষপ্রতিম যখন আচ্ছাদন বানাতে সক্ষম হল (membrane) তখন তার কার্যকারিতার গোপন বার্তা বাহিরের দুনিয়ায় হারিয়ে যেতে দিল না। কোষপ্রতিম যখন ATPকে বিভাজিত করতে সক্ষম হল তখন শক্তির অভাবও হয় তো ঘুচল।

কোষপ্রতিমের তখন প্রধান অন্তরায় : 'এনজাইম'-এর অভাব সত্ত্বেও কীভাবে অনুঘটকের কাজটা চালাবে— কী প্রক্রিয়ায় replicate (বাঙলা জানি না — 'অযৌন জনন'-এর কথা বলছি না— নিজের অনুরূপ কোন সত্তা নির্মাণের কথা বলছি)। এ যেন উপনিষদের ভাষায় : 'একোঽহম্ বহুস্যাম্' কী করে ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে ? প্রসঙ্গত একটা সমান্তরাল

ব্যাপারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সাম্প্রতিককালে প্রমাণিত হয়েছে যে, কিছু সিলিকেট-গঠিত অণু (silicate-based lattices) স্বয়ং অনুঘটকরূপে (autocatalytically) 'রেপ্লিকেট' করতে পারে। অর্থাৎ কারও সাহায্য ছাড়াই, নিজে নিজে নিজের প্রতিরূপ গঠনে সমর্থ। তারা কিন্তু 'জীবন্ত' নয়। জীবন্ত-অণুর মধ্যে নিউক্লিক-অ্যাসিডই এনজাইম-ধর্মী অনুঘটন-ক্ষমতায় 'রেপ্লিকেট' করতে সক্ষম। কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন, ঐ জাতীয় 'সিলিকেট-খনিজ' (silicate-clay minerals) অনুঘটকের কাজটা প্রথম পর্যায়ে চালিয়ে নিয়েছিল—যার ফলে নিউক্লিয়টাইড এবং প্রোটিনয়েডরা জড়াজড়ি করে থাকার সুযোগ পায়। যখন তাদের পরস্পর-নির্ভরশীলতা এতটা গাঢ় হল যাতে একে অপরের পরিপূরক ও অনুকরণে সক্ষম হল তখন তাদের ঘিরে জন্ম নিল 'মাইক্রোগোলক'—যাতে ওদের এই পরস্পর-নির্ভরশীলতার বিক্রিয়া বাইরের দুনিয়া থেকে আড়াল করা যায়। তার পরের ধাপে ঐ সিলিকেট অনুঘটকদের ওরা বিদায় করে দেয়— ঠিক যেমন ইট আর সিমেন্টের মশলা ততক্ষণই ভারার বাঁশগুলিকে বরদাস্ত করে, যতক্ষণ না তারা একে অপরের সঙ্গে মিলে-মিশে প্রাচীর-গঠনের কাজটা শেষ করে। দেওয়াল-গাঁথা শেষ হলেই ভারার বাঁশ সরে যায়।

আদিম কোষবিযুক্ত প্রাণী

জীববিজ্ঞানীরা ইংরাজিতে যাকে বলেন First Acellular Organism. তার বাস্তব অস্তিত্বের প্রমাণ নেই, তবে তাকে মেনে নিলেই অঙ্কটা মেলানো সম্ভব হয়। বীজগণিতের 'রুট-ওভার মাইনাস্-ওয়ান'-এর মতো!

কোষবিযুক্ত প্রাণসত্তা আজকের পৃথিবীতেও আছে ; কিন্তু আমাদের তথাকথিত 'আদিম কোষবিযুক্ত প্রাণী'র সঙ্গে তার বেশ কিছু প্রভেদও আছে। আমরা ধরে নিচ্ছি— তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া (hypotheucal) সেই কোষবিযুক্ত প্রাণীর আয়ত্তাধীনে ছিল এই চারটি গুণ :

(1) কোষ না থাকলেও কোষের একটি বাস্তব বহিরাবরণ (true cell-membrane)

(2) নির্দিষ্ট 'জেনেটিক-কোড'

(3) সংবাদ সরবরাহ ব্যবস্থা (DNA– প্রোটিন)

(4) শক্তি আহরণের ক্ষমতা।

মনেরা ও প্রোটিস্টা

আমরা জানি, আজকের পৃথিবীতে না-মানুষকে প্রধান দু'ভাগে ভাগ করা হয়— উদ্ভিদ (Plant world) এবং প্রাণী (Animal world)। আর আছে ঐ দুইয়ের মাঝামাঝি কিছু মাইক্রোঅর্গানিজম্ যেমন ব্যাক্‌টিরিয়া, যাদের কোন দলেই ফেলা যায় না। গত শতাব্দীতে জার্মান বিজ্ঞানী হেকেন তাদের নাম দিয়েছিলেন 'প্রোটিস্টা'। বর্তমান শ্রেণীবিন্যাস হিসাবে ঐ আলো-আঁধারী প্রাণ-প্রাঙ্গণের বাসিন্দাদের দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে : মনেরা (Monerans) এবং প্রোটেস্টা (Protestans) : কী ওদের পার্থক্য ?

ব্যাকটিরিয়া এবং নীল-সবুজ অ্যাল্‌গি (Algae) হচ্ছে মনেরা শ্রেণীভুক্ত। ওদের নির্দিষ্ট সেল-নিউক্লিয়াস নেই। আছে নিউক্লিয়াস এলাকা (nuclear zone)। তার ভিতর আছে

ক্রোমাটিন ফিতা (chromatin strands)। এদের জীবকোষে দু-পর্দার আচ্ছাদন থাকে এবং সবচেয়ে বড় কথা এরা সৌর-শক্তি আহরণে সক্ষম।

প্রোটিস্টাদের নির্দিষ্ট সেল-নিউক্লিয়াস থাকে। এরা নিজে থেকে সরাসরি সৌর-শক্তি আহরণে অশক্ত। এদের উদাহরণ : প্রোটোজোয়া, ব্লু-গ্রীন ব্যতীত অন্যান্য জাতের অ্যাল্‌গি।

মনেরা থেকে কালে জন্ম নিয়েছিল উদ্ভিদ জগৎ ; শ্যাওলা থেকে রেড-উড ফরেস্টের বিশালতম বনস্পতি।

প্রোটেস্টা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল প্রাণীজগৎ : কীট-পতঙ্গ, ব্যাঙ, কুমির, পাখি, স্তন্যপায়ী, মানুষ।

আশঙ্কা হচ্ছে এবার আপনাদের ধমক খেতে হবে।

বলবেন, 'বাপুহে ! তুমি পৃথিবীর জন্ম থেকে শুরু করে মানুষে এসে থামলে, কিন্তু আসল কথাটা কৌশলে এড়িয়ে গেলে কেন ? এই ডামাডোলের বাজারে নিষ্প্রাণ পৃথিবীতে 'প্রাণ' এল ঠিক কখন ? কোনটাকে আদিমতম জীব বলব ? — Coacervate, Precells, First Acellular Organism, Monera, Protesta না Virus?

অপরাধ স্বীকার করছি। কী করব ? নানা মুনির নানা মত। তবে ঢাউস-ঢাউস বই ঘেঁটে আমার নিজের কী মনে হয়েছে বলব ? ভয়ে না নির্ভয়ে ?

আমার মনে হয়েছে, অতি দীর্ঘ পথের ঐ বিশেষ বাঁকটা—যখন নিষ্প্রাণ প্রাণপঙ্কে 'আণবিক সমাশ্লেষ' প্রাককোষীয় প্রাণীতে রূপান্তরিত হচ্ছে—ঐটাই হল জীবের প্রথম জন্মদিন।

কী যুক্তিতে ? বৈজ্ঞানিক যুক্তি থাক। আমি নিতান্ত সাহিত্যসেবী—বিজ্ঞানী নই। তাই গুরুবাক্য স্মরণ করি :

> 'বহু জন্মদিনে গাঁথা আমার জীবনে
> দেখিলাম আপনারে বিচিত্র রূপের সমাবেশে।
> একদা নূতন বর্ষ অতলান্ত সমুদ্রের বুকে
> মোরে এনেছিল বহি
> তরঙ্গের বিপুল প্রলাপে
> দিক হতে যেথা দিগন্তরে
> শূন্য নীলিমার 'পরে শূন্য নীলিমায়
> তটকে করিছে অস্বীকার....
> এসেছি সে পৃথিবীতে যেথা কল্প কল্প ধরি
> প্রাণপঙ্ক সমুদ্রের গর্ভ হতে উঠি
> জড়ের বিরাট অঙ্কতলে
> উদ্‌ঘাটিল আপনার নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয়
> শাখায়িত রূপে রূপে।

কবির মতে সেটাই তাঁর প্রথম জন্মদিন।

মাছের প্রজনন-বৈচিত্র্য ও বাৎসল্য

মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে মাছের বেলাতেই প্রজননক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বৈচিত্র্য। সাধারণ ভাবে বলা যায়, ওদের স্ত্রী-পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন মাছ। অনেক অ-মেরুদণ্ডীর বেলায় যেমন একই দেহে পুরুষ ও নারীর জননেন্দ্রিয় দেখি—অর্ধনারীশ্বর দেবতার মতো—মাছের ক্ষেত্রে তা সচরাচর হয় না। তাদের প্রত্যক্ষ মিলনও সচরাচর হয় না। অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে যা হয় তাকে 'প্রত্যক্ষ-মিলন' বলবেন কিনা সেটা আপনাদের বিবেচ্য।

যেমন ধরুন মিঠেজলের ল্যামপ্রে মাছ। এদের বাচ্চা হয় নদীতে, বসন্তকালে। একটু বড় হয়েই বাচ্চারা সাগরের দিকে অর্থাৎ মোহনার দিকে রওনা হয়। ওদের বিচিত্র মিলনের কথা বলি :

সচরাচর যে কোন মাদী মাছ জলে ডিম পাড়ে। আর পুরুষ মাছ তাকে নিষিক্ত করে তোলে। এই ব্যবস্থায় অনেক অনেক ডিম আদৌ নিষিক্ত হয় না। ঐ দম্পতির দৃষ্টিকোণ থেকে সেই অনিষিক্ত ডিম্বগুলি ব্যর্থ বটে, কিন্তু জীবজগতের সামগ্রিক বিচারে 'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা।' কারণ ঐ অনিষিক্ত ডিম্বগুলি অন্যান্য জলচর জীবের খাদ্য। অনিষিক্ত ডিম্বগুলিকে যেহেতু ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, তাই এই জাতের মাদী মাছ অত্যন্ত বৃহৎ সংখ্যার ডিম প্রসব করে। অবিশ্বাস্য রকমের বৃহৎ সংখ্যায়। একটা মাঝারি মাপের কর্ড মাছ বছরে ষাট লক্ষ ডিম পাড়ে—দৈনিক লাখের উপর। আজ্ঞে না, ছাপার ভুল হয়নি, হিসাবও ঠিক আছে। দৈনিক গড়ে লাখ হলে বছরে ষাট লক্ষ হয় না ; কিন্তু ওরা তো সারা বছরই ডিম পাড়ে না, শুধু মরশুমেই পারে। এবং তা পাড়ে।

বিটারলিং ও ঝিনুক

হ্যাগ-ফিস তাই একটা নতুন কায়দা রপ্ত করেছে। মিলনের প্রাক্কালে বসন্তসমাগমে কর্তাগিন্নি নদীগর্ভে একটা ভালো বাসা বানায়। নুড়ি বা পাথর সরিয়ে সরিয়ে। স্বীকার্য—ওদের হাত-পা নেই ; কিন্তু ওষ্ঠাধরে আছে শোষক প্রত্যঙ্গ। ছোট মাপের পাথর সরানো ওদের পক্ষে কোন কঠিন কাজ নয়।
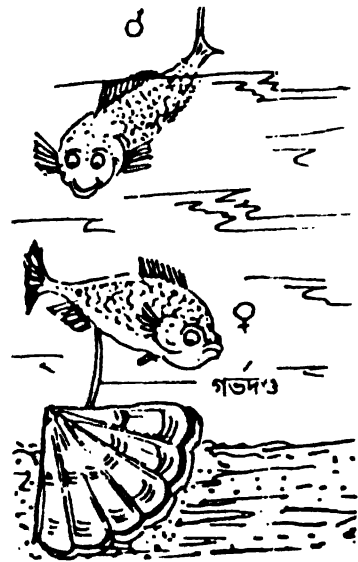
বাসা তো তৈরী হল। তখন গিন্নি-ল্যামপ্রে একটা পাথরকে তার মুখের 'ভ্যাকুয়াম-ক্লিনার' দিয়ে মোক্ষম করে সেঁটে ধরে। ঠিক ঐ বাসার উপর। তখন কর্তা-ল্যামপ্রে ঘনিয়ে আসে। সেও হয়তো একই পাথরে অথবা পার্শ্ববর্তী প্রস্তরখণ্ডে মুখটা আটকে দেয়। তারপর স্ত্রী-

তিলাপিয়ার সন্তান বৎসলতা
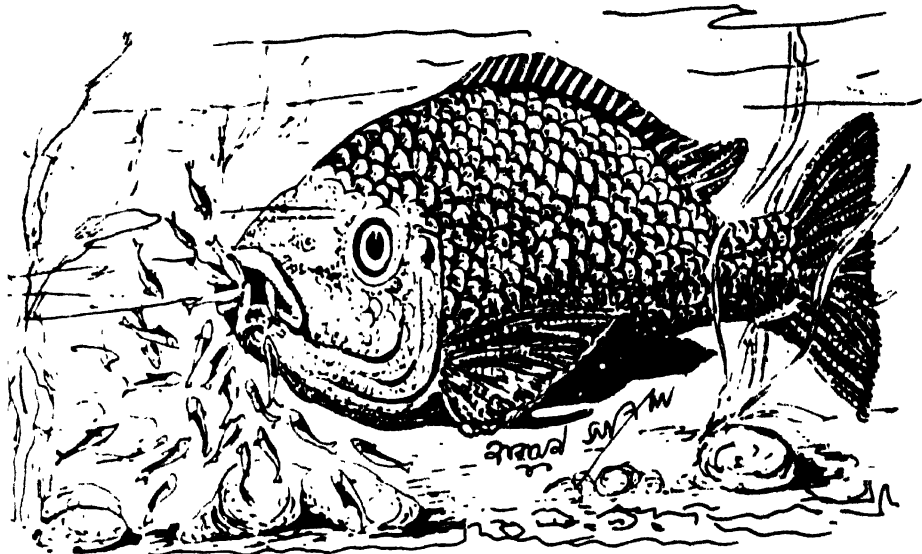
ল্যামপ্রের দেহটা সাবড়ে ধরে। আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় স্ত্রী-ল্যামপ্রে তার অনির্ষিক্ত ডিম্বগুলি ঐ বাসার উপর ছেড়ে দেয়। পুরুষও তার বীর্য ত্যাগ করে। ডিম্বগুলি নিষিক্ত হয় জলেই। মাতৃগর্ভে নয়। একে দৈহিক মিলন বলবেন কিনা সেটা আপনারা বিবেচনা করে দেখুন।

মোট কথা, নিজ প্রজাতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ল্যামপ্রে অবক্ষয়ের পরিমাণটা কমিয়ে আনতে পেরেছে।

লিঙ্গের ব্যাপারে মাছের বৈচিত্র্য প্রচণ্ড। অনেক মাছ উভলিঙ্গ। আবার অনেকে দিব্যি লিঙ্গ পরিবর্তন করে। যেমন আমাদের অ্যাকোয়ারিয়ামের অতি পরিচিত সোর্ড টেইল। কেউ হয়তো স্ত্রীজাতীয়া হিসাবে জীবন শুরু করে—সন্তানের জন্ম দেয়। তারপর দিব্যি লিঙ্গ পরিবর্তন করে জন্মদানে-সক্ষম পুরুষ মাছে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

কোন কোন মাছ তার ডিমকে মাংসাশী প্রাণীর হাত থেকে বাঁচাতে বাসা বানায়। পাহারা দেয়। আবার কেউ কেউ ভিন্ন পর্বের জীবের দেহে ডিম্বকে সুরক্ষিত করে। একটি বিচিত্র উদাহরণ হচ্ছে বিটারলিং।

এদের মাদী মাছের দেহে আছে দীর্ঘ গর্ভদণ্ড বা 'ওভিপজিটার'। তার সাহায্যে সে কোনও বর্মীশ্রেণীর জীবের—যেমন ধরুন ঝিনুক— খোলের ফাঁকফোকরে ডিমটি পেড়ে যায়। এতে মাংসাশী মাছের এক্তিয়ারের বাইরে ডিমটি ফুটবার সুযোগ পায়। কর্তা বিটারলিং ঐ ঝিনুকের খাঁজেই বীর্যপাত করে। সেটি নিষিক্ত হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

অনেক মাছ নিষিক্ত ডিম্বকে মুখে নিয়ে ফেরে। যতদিন না ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। একটি

আমাদের অতি পরিচিত তিলাপিয়া মাছের আফ্রিকান জ্ঞাতিভাই ; অপরটি ক্যাট-ফিশ বা মাগুর মাছের জ্ঞাতিভাই। ডিম ফুটে বাচ্চা হবার পরেও তিলাপিয়া তাদের মুখে করে ঘোরে। নিরাপদ স্থানে বাচ্চাদের মুখ থেকে বার করে দেয়। বাচ্চারা নিজের মতো খেলা করে। ভয় পেলেই ছানাপোনার দল মায়ের মুখের ভিতর ঢুকে পড়ে। আর মা স্থানান্তরে পালিয়ে যায়। সেখানে আবার মুখ থেকে বাচ্চাদের উগরে বের করে দেয়—ঠিক যেমন করে মাদী ক্যাঙারু। মজার কথা, এই সময় সদ্যজননী বেশ কয়েকদিন আদৌ আহার করে না—পাছে ভুল করে কোনও সন্তানকে খেয়ে ফেলে। এভাবেই ওদের দ্রুত বংশবৃদ্ধি হয়। আমরা সে তথ্যটার খবর রাখি না। ওদের মাতৃস্নেহের প্রশংসা করি না, শুধু বলি তিলাপিয়া মাছের চাষে লাভটা জবর।

ক্যাটফিসের মুখে নিক্ষিপ্ত ডিম্ব

এই যে মাদী মাছ ডিম মুখে নিয়ে ঘোরে এটাকে আরও কাজে লাগাবার ধান্দায় মদ্দা সিকলিড (cichlid) মাছ আবার একটা নতুন ফন্দি বার করেছে। মাদী মাছের ঐ সংস্কারের সুযোগ নিয়ে সে সন্তান-সম্ভাবনাকে যেভাবে বৃদ্ধি করেছে তার ভিতর বাহাদুরি আছে।
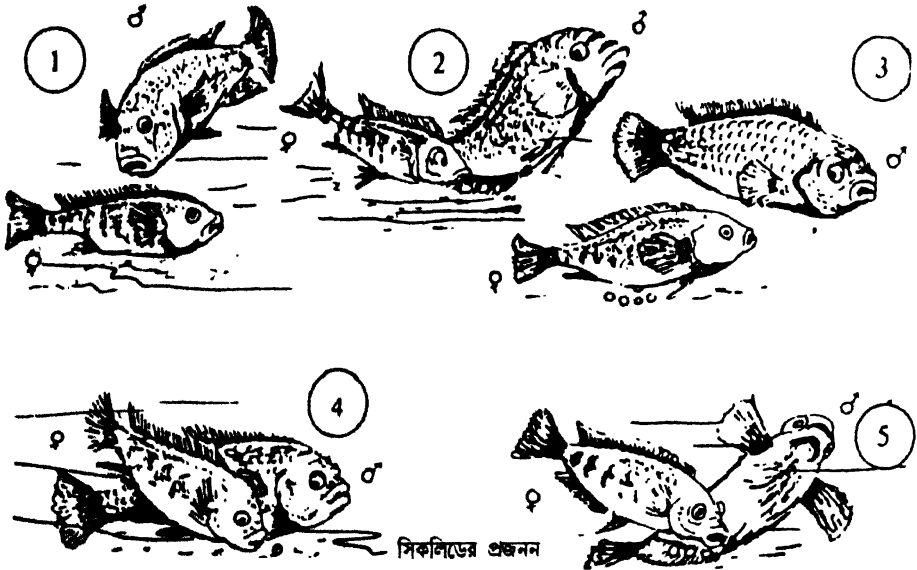
সিকলিডের প্রজনন

বলি শুনুন :

পুরুষ সিকলিড মাছ প্রজননকালে তার পায়ু-পাখনার কাছে ডিমের মতো দেখতে কিছু সাময়িক প্রত্যঙ্গ পয়দা করে। ছবির সাহায্যে বোঝবার চেষ্টা করি বরং :

প্রথম চিত্রে (1) দেখছি, প্রজননকাল সন্নিকটবর্তী বুঝে কর্তা সিকলিড (যার ছাবির গায়ে বৃত্তের মাথায় তীর-চিহ্ন) তার সঙ্গিনীর (বৃত্তের নিচে যোগ-চিহ্ন) দিকে ঘনিয়ে আসছে। তার নিজের পায়ু-পাখনায় কিছু মেকি-ডিম লটকানো।

দ্বিতীয় চিত্রে (2) দেখা যাচ্ছে, সে গিন্নিকে তার পায়ু পাখনায় লটকানো মেকি ডিমগুলো দেখাচ্ছে। সেটা দেখলেই গিন্নির মনে পড়ে যায়, ওমা তাই তো! ডিম পাড়ার মরশুম তো এসে গেছে। তখনই সে পুটপুট করে গোটা চার-পাঁচ ডিম পাড়ে (3) এবং সংস্কারবশে মুখে তুলে নেয় (4)।

কর্তা লেজের এক ঝাপটা মেরে যেন বলে, চোখের মাথা খেয়েছ? এগুলোর কী হবে?

অর্থাৎ তার নিজের পায়ু-পাখনায় লটকানো মেকি ডিমগুলো গিন্নিকে দেখায়। প্রয়োজনে কাত হয়ে শুয়ে পড়ে (5)।

গিন্নি সলজ্জে বলে, ওঃ! স্‌রি। ও-কটা দেখতে পাইনি।

সে ঘনিয়ে এসে সেই মেকি ডিম কটাও মুখে পুরে ফেলতে চায়। আর তখনই কর্তা বীর্য ত্যাগ করে। ফলে মাদী মাছের মুখের ভিতর অনিষিক্ত ডিম্বগুলি নিষিক্ত হয়ে যায়।

কী বিচিত্র ব্যবস্থা! এতে অপচয়ের সম্ভাবনাটা অনেক কমে গেল। নয় কি?

প্রসঙ্গত বলি—তিলাপিয়া আর সিকলিড একই গোত্রের মাছ cichlidac. তারা পার্সিফর্মিস বর্গের। অর্থাৎ আমাদের সুপরিচিত কই, তোপসে, পার্শে, ভেটকির সঙ্গে সগোত্র না হলেও স-বর্গের।

সার্ফ মাছের গর্ভে অজাত ভ্রূণ
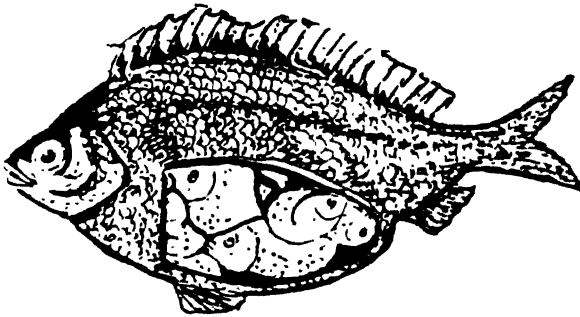
এই বর্গের কিছু মাছ আদৌ ডিম্ব প্রসব করে না। সরাসরি সন্তান প্রসব করে। যেমন সার্ফ-পার্চ।

সন্তান বাৎসল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্যাস্টেরোস্টিফর্মেস বর্গের তিনটি বিচিত্র মাছের কথা এবার বলি। সন্তানবৎসলতার বিষয়ে এই বর্গটি মৎস্যকুলে লা-জবাব।

স্টিক্‌লব্যাক : মিঠেজলের মাছ, মোহানার কাছে জোয়ার-ভাঁটাতে অভ্যস্ত। দৈর্ঘ্যে প্রায় দশ সে. মি.। কর্তা মাছের গায়ের রঙ বদলায়। স্বাভাবিক রঙ সবজেটে। কিন্তু মিলনকালের আগে চিবুক ও তলপেট ঘোর রক্তবর্ণের হয়ে যায়। পিঠের কাঁটাগুলি সর্বদা খাড়া হয়ে থাকে। তখন ও বেশ হিংস্র হয়ে ওঠে। নিজের এলাকায় অন্য কোনও পুরুষ মাছকে ঘেঁষতে দেয় না।

এবার সে জলের নিচে জলজ উদ্ভিদ দিয়ে একটা বাসা বানায়। তারপর যায় অভিসারে। অনতিবিলম্বেই 'বয় মীটস্ গ্যের্ল' (1)। মেয়েটিকে ডেকে এনে ভালো বাসাটা দেখায়। অমন তৈরী বাড়ি পেলে কোন্ মেয়ে না আকৃষ্ট হবে? কিন্তু ঢুকবে কেমন করে? মেয়েটি বলে, ভালো বাসা তো জবর বানিয়েছে, কিন্তু দোর কই? ঢুকব কেমন করে?
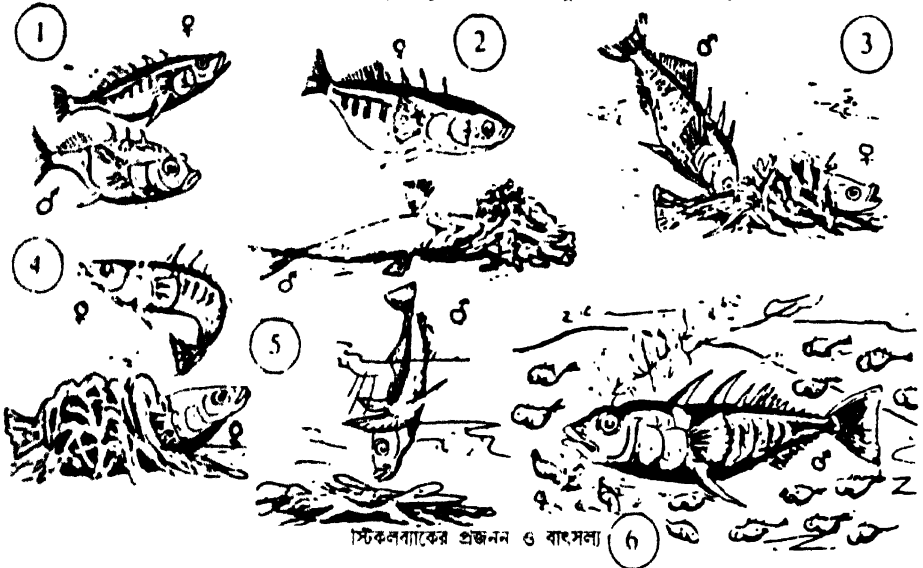
স্টিকলব্যাকের প্রজনন ও বাৎসল্য

কর্তা তখন নিজে কাত হয়ে শুয়ে কানকো দিয়ে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে নিজে ঢুকে গৃহপ্রবেশের ব্যবস্থাটা দেখিয়ে দেয় (2)। কী ভাবে লতাগুল্মে বানানো বাসার ভিতরে ঢুকতে হবে। সে বার হয়ে এলে তার সঙ্গিনী একই কায়দায় ভিতরে ঢুকে পড়ে। কর্তা এবার তার নাকের ডগা দিয়ে গিন্নির পিঠে ধীরে ধীরে টোকা মারে (3); গিন্নি তখন তার অনিষিক্ত ডিমগুলি বাসার ভিতর পেড়ে ফেলে। তারপর গিন্নির ছুটি। সে বাসা ছেড়ে বাইরে আসে। আর কর্তা একই কায়দায় বাসার ভিতর ঢুকে অনিষিক্ত ডিম্বগুলিকে নিষিক্ত করে (4)। এর পরে গিন্নির আর কিছু করণীয় নেই। ছেলেপুলেদের মানুষ, থুড়ি, 'না-মানুষ' করার দায়িত্ব কর্তামশাই স্বয়ং গ্রহণ করেন। যদি মনে করেন বাতাসের খামতি হচ্ছে, তাহলে বাসার প্রবেশদ্বারের সামনে ক্রমাগত পাখনা নেড়ে নেড়ে অক্সিজেন সরবরাহ বৃদ্ধি করতে থাকেন (5)। ক্রমে ডিম ফুটে খুদে খুদে চুনুমুনুরা জন্ম নেয়। গিন্নি তখন বে-পাত্তা—ইতিউতি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অথবা কে জানে, হয়তো নতুন নাগরের সন্ধানে ব্যস্ত।
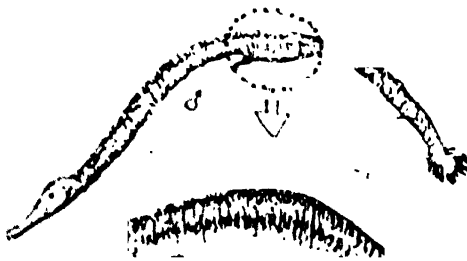
নলমৎস্যের বিকল্প-গর্ভে সন্তান

বাপই বাচ্চাদের দেখ্‌ভাল করে, যতদিন না তারা লায়েক হয় (6)।

পাইপ-ফিশ বা 'নল-মাছ' একই বর্গের (অর্ডারের) মাছ। সে আবার আর এক কাঠি উপর দিয়ে যায়। দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩০ সে. মি., মানে হাতখানেক লম্বা। স্টিকলব্যাক বাসার সামনে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করেছিল, নাবালক সন্তানদের দেখভাল করত—পাইপ-ফিশ আর এক ধাপ এগিয়ে গেল। এদের পুরুষ মাছেরা তলপেটে একটা আজব থলি পয়দা করল। বাচ্চা মাছকে বাপ্‌—না, মা নয়, বাবা—পেটকোঁচড়ে নিয়ে ঘোরে। অনেকটা মাদী ক্যাঙারুর মতো।

সী-হর্স : এদেরও সেই একই বৃত্তান্ত। যদিও বলা যায় সী-হর্স আরও এক কাঠি উপরে উঠেছে। সেও ঐ একই বর্গের অন্তর্ভুক্ত। স্টিক্‌লব্যাক সন্তানের নিরাপত্তা-বিধানে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করেছিল, পাইপ-ফিশ বানিয়েছিল পেটকোঁচড়ে একটা থলি, বাচ্চাদের পকেটজাত করবার আয়োজন। সী-হর্স তার চেয়েও একটা বড় জাতের চমক দিয়েছে।

সী-হর্সের সন্তান জন্মায়—মায়ের পেট থেকে নয়—বাপের পেট থেকে।।

স্বীকার্য—একটু পোয়েটিক লাইসেন্স নিয়েছি।

না, সোর্ডটেইল-এর মতো সে-সময় বাপের লিঙ্গ পরিবর্তন হয় না—সে তখনো পুরুষই থাকে। আমার ঐ চমক-দেওয়া বাক্যটা ব্যাপক অর্থে ধরতে হবে। অর্থাৎ বাপের গর্ভ থেকে নয়, বাপের পেটকোঁচড় থেকে।

ব্যাপারটা এই রকম :

নিষিক্ত ডিম্বটি মা-সীহর্স তার কর্তার ঐ পেট-থলির ভিতর ফেলে দেয়। সেই থলির ভেতর বাপের দেহ-উত্তাপে নিষিক্ত ডিম্বটি ফোটে। এমনকি সন্তান জন্মানোর পরে বাপই বাচ্চাগুলোর দেখ্‌ভাল করে, মা নয়।
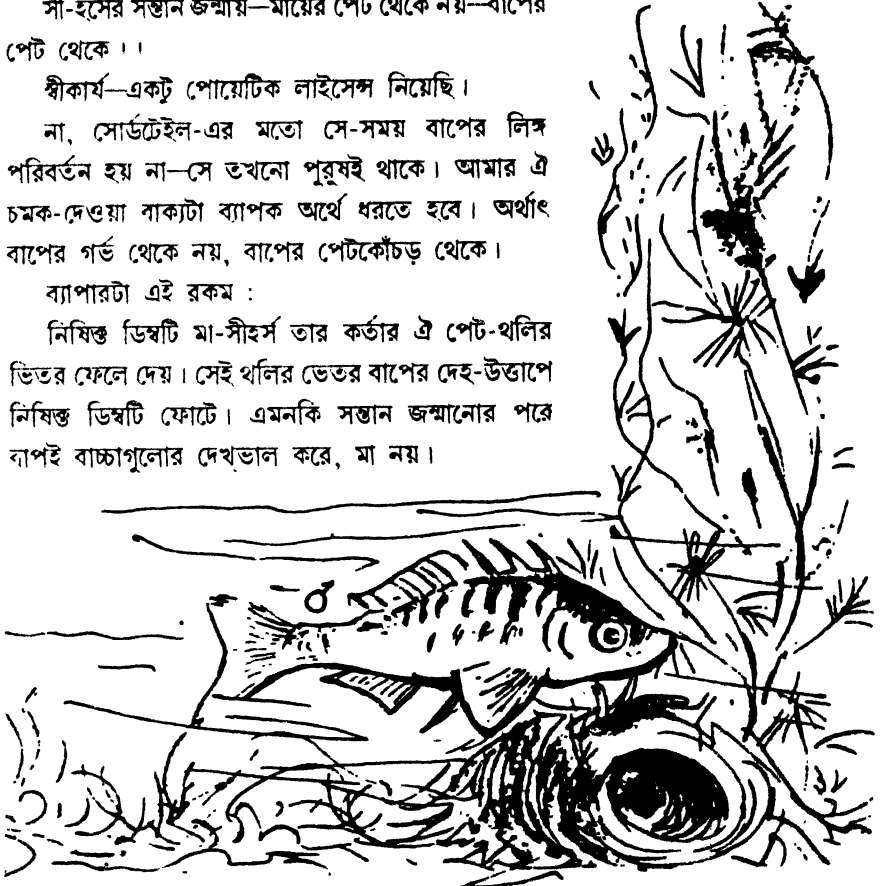
সী-হর্স আকারে 15 সে. মি. পর্যন্ত হয়, মানে বিঘৎখানেক। নানান রঙের। এমনকি টুকটুকে লাল। ভারি সুন্দর মাছ—কারণ ওরা সাঁতার কাটে খাড়া ভাবে, শুধু পিঠ পাখনা

নেড়ে নেড়ে। তা দিয়ে ওরা জলজ-উদ্ভিদের ডালপালা আঁকড়ে ধরে। এরা সামুদ্রিক—ভারত মহাসাগরে এদের দেখা বিশেষ পাওয়া যায় না। তবে ভারতে কয়েক জোড়া আছে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি। বোম্বাই-এর তারাপোরওয়ালা মৎস্যাগারে। আনন্দের কথা—দীঘা সমুদ্র-সৈকতে যে প্রকাণ্ড মৎস্যাগারটি বর্তমানে নির্মিত হচ্ছে সেখানে সী-হর্স রাখা হবে। অন্তত জুয়োলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার অন্যতম কর্ণধার ডঃ আশিস ঘোষ আমাকে সেই রকম ভরসা দিয়েছেন—তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। তিনি সফলকাম হলে হয়তো দু-এক বছরের ভিতরেই আমরা হাতের কাছে 'সাগর-ঘোড়া' মাছকে দেখতে পাব।

দীঘার কথাই যখন আবার উঠে পড়ল তখন একটা ব্যক্তিগত বেদনার কাহিনী শোনাই।

কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় স্বনামধন্য প্রকাশক শ্রীমান সুধাংশু কুমার দে বছর-দুই আগে হঠাৎ স্থির করেছিল দীঘায় একটা খানদানি হোটেল বানাবে। দু-পুরুষ ধরে সে শুধু বই-ই নাড়াচাড়া করে এসেছে—থাইসানুরা বর্গের 'বই-পোকা'র মতো। চেনে শুধু কবি-সাহিত্যিক-ঔপন্যাসিক-প্রাবন্ধিকদের। প্রচ্ছদশিল্পী, দপ্তরী, কাগজ-সাপ্লায়ারদেরও যে না চেনে তা নয়। কিন্তু বাস্তুবিদ বা স্থপতি কাউকে চেনে না। শেষমেশ আমাকেই ধরে বসল একটা নকশা ছকে দিতে। ওর ধারণা বইপাড়ায় ঘোরাঘুরি করলেও যেহেতু এককালে ঐসব কাজ আমাকে করতে হয়েছে তাই এখনো সবকিছু ভুলে মেরে দিইনি।

হোটেল বানানো শেষ হলে সুধাংশু বললে, দাদা, এতই যখন করলেন, তখন হোটেলের জন্যে একটা 'লোগো'ও ডিজাইন করে দিন। মানে, হোটেলের বিভিন্ন ঘরের চাবির সঙ্গে রিং-এ আমরা এক-একটা ব্রোঞ্জ প্লেট আটকে দেব, তাতে ঐ নকশাটা আঁকা হবে। এই ধরুন, ইঞ্চিতিনেক লম্বা, দেড় ইঞ্চি চওড়া।

আমি বলি, অত বড় একটা পেল্লায় ব্রোঞ্জ-প্লেট চাবির সঙ্গে লটকে দেবার কী দরকার? পকেটে নিয়ে ঘুরতে অসুবিধা হবে।

সুধাংশু একটা মিঠে-খিলি তার মুখবিবরে ঠেসে দিয়ে টোবল্লা-গালে যা বললে তার সারাংশ, সেটাই চাইছি, দাদা। যাতে বোর্ডারের পকেটে ওটা ক্রমাগত খোঁচা মারে। না হলে অনেকেই ভুল করে চাবি পকেটে নিয়েই হোটেল ছেড়ে চলে যান।

বুঝি, শুধু পাঠক-মানস নয়, বোর্ডার-মানসটাও ও ঠিক মতো সমঝে নিয়েছে!

আমার সরলমনে মনে হল, এই মওকায় ঐ দুর্লভ অথচ সুন্দর একজোড়া না-মানুষকে আশ্রয় করে নকশাটা ছকলে মন্দ হবে না। বিশেষ—হোটেলটা সমুদ্রসৈকতে—'সী-ভিয়ু' দেখার আয়োজন।

নকশা দেখে সুধাংশু খুশি, ছকে আমো।

তখন কে জানত—এ নিয়ে আমাকে গালমন্দ খেতে হবে!

সম্প্রতি আমার এক বন্ধু—বন্ধু ঠিক নয়, গুণগ্রাহী—স-গিন্নি আর স-বাচ্ছা ঐ সী-ভিয়ু হোটেলে কদিন অবকাশ যাপন পরে ফিরে এসেছে। দীঘা থেকে ফিরে এসেছে খবর পেয়ে জানতে চাইনুম—কেমন হোটেল? ডিজাইনটা কেমন হয়েছে?

সে বললে, হোটেলের 'ডিজাইন' কেমন হয়েছে সেকথা থাক—'লোগো' ডিজাইনটা একেরে যাচ্ছেতাই!

ঘাবড়ে যাই। জানতে চাই, কেন ? এ কথা কেন ?

—যতবার ঘরে চাবি দিয়ে বৌ-বাচ্চা নিয়ে দীঘা-সৈকতে বেড়াতে যাই, গিন্নি বাচ্চাটাকে আমার কোলে চাপিয়ে দেয়। বাচ্চা ট্যাঁকে করে ঘুরতে ঘুরতে আমার জান কাহিল। কিছু বলতে গেলেই গিন্নি আমার নাকের ডগায় ঐ চাবি-রিং-এর ব্রোঞ্জ প্লেটটা বাড়িয়ে ধরে। বলে, দেখ। দেখে শেখ। 'না-মানুষ' হতে শেখ এট্টু। বাচ্চাটা কি শুধু আমার ?

লে হালুয়া !
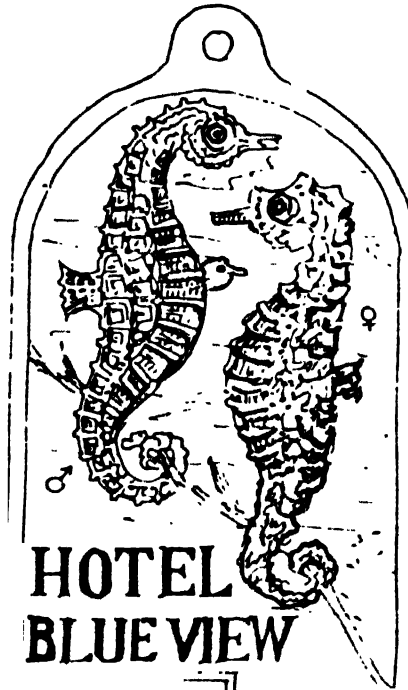
জায়েন্ট পাণ্ডা দেখা হল

জীবজগতে মানুষ আজ 'বড়দা'। থার্মোনিউক্লিয়ার অস্ত্রগর্বী মানুষ আজ দেবতার প্রতিস্পর্ধী ; তবু তার পদতলে-লীন তৃণখণ্ড যা পারে, মানুষ তা পারে না। তাই মানুষ আজও ঐ সূর্যরশ্মিপায়ী উদ্ভিদের কাছে ভিখারীর মতো হাত পাতে। বিজ্ঞান আজ বুঝেছে যে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে না পারলে শুধু ছোটভাইদের মেরে মেরে বেশিদিন 'বড়দাগিরি' করা যাবে না। মানুষ নিজেই অবলুপ্ত হয়ে যাবে পৃথিবী থেকে। তাই বিজ্ঞানীদের পরামর্শ মতো গড়ে উঠেছে নানান সংস্থা, যাতে পরিবেশ সংরক্ষণ করা যায় ; যাতে বিভিন্ন দুর্লভ প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রজাতিগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। এমনই একটি বিশ্বব্যাপী সংস্থা 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড' বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ব্রত নিয়েছেন, যাঁদের এমব্লেম হচ্ছে জায়েন্ট পাণ্ডা।

জায়েন্ট পাণ্ডা দেখা হল না

'ইয়ারো আনভিজিটেড'। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটি বিখ্যাত কবিতা। ইয়ারো নদীকে না দেখেই কবি উচ্ছ্বসিত হয়ে ঐ নদীর উপর এক জব্বর কবিতা লিখে ফেলেছিলেন। আমারও একই হাল। জায়েন্ট পাণ্ডাকে চর্মচক্ষে না দেখেই এই প্রবন্ধ লিখে ফেলেছি। বলি শোন :

এই তো সেদিনের কথা। চুরাশি সাল, আমি তখন আছি আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে সানফ্রান্সিস্কোর শহরতলী 'ওয়ালনাট ক্রীক'-এ। আমার মেয়ের বাড়িতে। নাতনি অন্তরার গার্ডিয়ানশিপে। ঐ বছর লস্ অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকসের পরেই একটা মজা হল। সানফ্রানসিস্কো চিড়িয়াখানায় মাত্র সতের দিনের জন্য ভি. আই. পি. ভিজিটে দর্শন দিতে এলেন একজোড়া জায়েন্ট পাণ্ডা। বিচিত্র না-মানুষ। স্তন্যপায়ী। কিন্তু ঠিক কোন্ পরিবারভুক্ত এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। দেখতে ভালুক আর টেডি-বেয়ারের মাঝামাঝি। দুনিয়ার দুর্লভতম প্রাণীদের অন্যতম। গোটা পৃথিবীতে ওদের সংখ্যা হাজারের কম। মহাচীনের একটি বিশেষ অরণ্যে ওদের পাওয়া যায়। চীনের বাইরে সারা পৃথিবীতে বিশেষ-বিশেষ খানদানি চিড়িয়াখানায় আছে (মানে চুরাশি সালের 'পাণ্ডা-সুমারি' মোতাবেক) মাত্র

সতেরটি। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতির কোন চিড়িয়াখানায় নেই। কোনকালে ছিল না।

সে যাই হোক, লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকস উপলক্ষ্যে চীন সরকার একজোড়া জায়েন্ট পান্ডাকে মাসখানেকের জন্য ঐ শহরের চিড়িয়াখানায় পাঠিয়েছিলেন। অলিম্পিকান্তে চীন সরকারকে মার্কিন সরকার অনুরোধ করলেন ঐ পান্ডা-জোড়াকে আরও মাসদুয়েক সে দেশে অতিথি হিসাবে রাখার অনুমতি দেওয়া হক—তাহলে অন্যান্য শহরে ওদের দু-আড়াই সপ্তাহ করে চিড়িয়াখানায় রাখা যাবে। সেই সেই শহরবাসী জন্মের শোধ জায়েন্ট পান্ডা দেখে নেবে।

চীন সরকার সম্মত হলেন। স্থির হল নিউইয়র্ক, সানফ্রানসিস্কো, ওয়াশিংটন আর ডেট্রয়েটের জু-তে ঐ মাননীয় অতিথিদ্বয় দুই-দুই সপ্তাহ অতিবাহিত করবেন।

ফ্রিস্কো জুতে ওদের আগমনের দু-তিন সপ্তাহ আগে থেকেই উত্তেজনা শুরু হয়ে গেল। খবরের কাগজে, টি. ভি.-তে ওদের বিষয়ে নানান তথ্য আর ছবি ফলাও করে প্রচারিত হতে থাকে। ফলে সকলেই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। অমিত—আমার জামাই—এক রোববারে আমাদের নিয়ে গেল চিড়িয়াখানায়। উরে ব্বাবা। সে কী ভিড়! গাড়ি পার্কিং করতে হল চিড়িয়াখানার গেট থেকে নাহোক দেড়-মাইল দূরে। শোনা গেল, ভোর রাত থেকে লোকে লাইন দিয়েছে। কোনক্রমে ভিতরে তো ঢোকা গেল, কিন্তু জায়েন্ট পান্ডার খাঁচার কাছে যে ভিড় তা আর কহতব্য নয়। কিউ-সরীসৃপের চেহারাটা দেখে বুঝতে পারি সারাটা দিন অপেক্ষা করলে সন্ধ্যে নাগাদ এক ঝাঁকি-দর্শন হলেও হতে পারে।

অন্তরা জানতে চায়, কী করবে দাদু?

আমি বলি, সারাটা দিন শুধু কিউ-অক্ষরের ঠ্যাঙ আঁকড়ে পড়ে থাকা কোন কাজের কথা নয়। অ্যালফাবেটে আরও পঁচিশটা অক্ষরও তো আছে, না কী? শুনেছি এই ফ্রিস্কো-তেই আছে নানান জাতের না-মানুষ, যাদের আমি কখনো দেখিনি। এই সওয়া তিনকুড়ি বয়সে। কেমন করে দেখব? সেসব জীব যে এদেশে দেখাই যায় না। আছে উত্তরমেরু অঞ্চলের শ্বেত ভল্লুক, দক্ষিণমেরুর পেঙ্গুইন। আছে ক্যাপিবারা, কোডিয়াক, ইন্দ্রি, লিঙ্কস্, রাস্কেল—থুড়ি! 'রাস্কেল' ওর নাম নয়, জন্তুটার প্রজাতিগত পরিচয় : রাকুন।

সুতরাং সেদিন জায়েন্ট পান্ডা দেখার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে তাদেরই শিকার করা গেল। মানে, না-মানুষ দরদীদের নয়া-শিকার পদ্ধতি মোতাবেক। অন্তরার বাবা আর মা করল ক্যামেরায়, দাদু স্কেচবুকে।

ফ্রিস্কো জু কলকাতার চিড়িয়াখানার থেকে আকারে বড় হবে বলে মনে হল না। তবে খুব ঝকঝকে তকতকে। আর প্রায় প্রতিটি খাঁচার পাশে একটা করে বাক্স। তার পাশে হেডফোন। ছ্যাঁদায় নির্দিষ্ট মুদ্রা ফেলে যদি হেডফোনটা কানে লাগাও তাহলে কয়েক মিনিট ধরে ঐ বিশেষ জন্তুটার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য জানতে পারবে—কোথায় পাওয়া যায়, কী খায়, কী বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। সেদিন যেসব অভিনবদের দেখেছিলাম তাদের বিষয়ে দুচার কথা বলি।

পেঙ্গুইন : আমি আগে দেখিনি। এরা নানান জাতের। এখানে যাদের দেখলাম তারা 'কিং পেঙ্গুইন'। তিনফুটের (90 সে. মি.) মতো খাড়াই হবে। পিঠে কালো কোট, বুকটা

ধবধবে শাদা। এদের এক জ্ঞাতিভাই—সম্রাট পেঙ্গুইন (Emperor Penguin) উচ্চতায় 115 সে. মি. পর্যন্ত হয়। ওজন গড়ে 30 কে. জি.। তারা দক্ষিণ মেরু বলয়ের বাইরে বড় একটা যায় না। কোন জাতের পেঙ্গুইনই ভাল হাঁটতে পারে না, তবে উপুড় হয়ে শুয়ে দুই হাতডানা নেড়ে-নেড়ে বেশ জোরেই এগিয়ে যায় বরফের উপর দিয়ে। দুর্দান্ত সাঁতারু। সম্রাট পেঙ্গুইনের সন্তান-বৎসলতার কথাটা শোনাই এবার : পক্ষিবিশারদ বি. স্টোনহাউস দক্ষিণমেরুতে সরেজমিন গবেষণা করে এসে জানাচ্ছেন যে, সম্রাজ্ঞী—মানে মাদী সম্রাট পেঙ্গুইন—ডিম পাড়েন শরৎকালে। সামনে যখন দুরন্ত শীত। সে কী! কেন গো? কারণ ওরা জানে, ওদের জাত-শত্রুরা ওদের মতো শীত সইতে পারে না। ডিম পাড়বার সময় হলে শত-শত হাজার-হাজার 'সম্রাট-সম্রাজ্ঞী' সমবেত হয়—জোড়ায়-জোড়ায়। এক একটা ভাসমান বরফের চ্যাঙড়ে। প্রতিটি জননী বছরে একটি মাত্র ডিম পাড়ে। ডিমটা পেড়েই সে তার জীবনসঙ্গীর জোড়া পায়ের উপর সাবধানে ডিমটা রেখে দেয়। বাবা পেঙ্গুইন দুই-পায়ের উপর ডিমটি রেখে তলপেটের পালকে ডিমে তা দিতে থাকে। ডিম প্রসব করেই মা-পেঙ্গুইনের ছুটি। সে সমুদ্রে চলে যায় মাছ খেতে। আর কর্তা পেঙ্গুইন পুরো তিন-তিনটি মাস—মানে গোটা শীতকাল—একই ভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। নড়ে না, চড়ে না, খায় না, ঘুমায় না। ভাবতে পার?
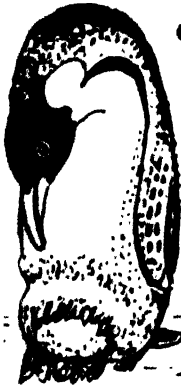
বাবা পেঙ্গুইন

পাশাপাশি এমন শত-শত বাবা পেঙ্গুইন এক একটি বিরাট বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরের দিকে মুখ করে। কারণ ওরা জানে, ডিমের লোভে আসবে নানান মাংসাশী প্রাণী—বিশেষ করে ওদের জাতশত্রু স্কুয়া পাখি। ওরা চায় না, স্কুয়া ওদের পিছন থেকে আক্রমণ করে।

অবিশ্বাস্য মনে হয় না কি? বাইরে যখন (-)40° সেলসিয়াস উত্তাপ তখন বাবা পেঙ্গুইনের দল দুর্ভেদ্য প্রাচীর তৈরী করে পাশাপাশি ডিমে তা দিয়ে চলেছে টানা তিন মাস। ডিমটির উত্তাপ—বাবার পেটের 'ওমে' প্রায় সর্বক্ষণ (+)33° সেলসিয়াস। এই তিনমাস কাল আহার-নিদ্রা তো দূরের কথা, বাবা পেঙ্গুইন একটু সরে-নড়ে দাঁড়াবার সুযোগও পায় না। ডিমটি যদি মুহূর্তকালের জন্যও বাপের পেট-কোঁচড় থেকে গড়িয়ে মাটিতে (অর্থাৎ বরফে) পড়ে যায় তাহলে অজাত সন্তানের অবধারিত মৃত্যু।

মা-পেঙ্গুইন ও খোকন

তিন মাসের অন্তে ডিম যখন ফোটে ঠিক তখনই মা পেঙ্গুইন ফিরে আসে। ডিম-ফোটা বাচ্চার দায়িত্ব এখন মায়ের। বাবা তখন টলতে টলতে বরফস্তূপের কিনারায় চলে যায়। ঝাঁপ দিয়ে পড়ে বরফ-গোলা জলে। এখন ওকে আহার করতে হবে। তিন মাস নিরম্বু উপবাসে যতটা ওজন কমেছে তা ওরা ফিরে পায় তিন সপ্তাহে।

এই তিন সপ্তাহে ওদিকে খোকন-সোনা বেশ লায়েক হয়ে উঠেছে। মায়ের হাতডানা ধরে ইতি-উতি বেই-বেই যায়।

গ্রিজলে ভালুক : উত্তর আমেরিকার বাসিন্দা, কানাডাতেও আছেন এঁরা। আকারে প্রকাণ্ড ! এর নিকট আত্মীয় আলাস্কার 'ব্রাউন বেয়ার'। সে হচ্ছে বর্তমান পৃথিবীর সর্ববৃহৎ স্থলচর মাংসাশী প্রাণী। খাড়া হয়ে দাঁড়ালে উচ্চতা আট ফুট (240 সে.মি.)। বড় একটা আফ্রিকান সিংহের ওজন যেখানে 250 কে.জি., বৃহত্তম সাইবেরিয়ান শাদা বাঘ যেখানে 300 কে. জি. হয় কি না হয়, সেখানে পূর্ণদেহী আলাস্কার ভালুকের ওজন 780 কে. জি.।

গ্রিজলে

এরা সর্বভুক। তবে নিরামিষই পছন্দ বেশি। ট্রাউট আর স্যামন মাছ খেতেও খুব ভালবাসে। বরফগলা জলের ধারে বসে থাকে, আর থাবা দিয়ে মাছ ধরে খায়।

গ্রিজলের লোম যেন সূক্ষ্মসোনার পাত। রোদে চিক্‌চিক্ করে। শীতকালে দেয় লম্বা ঘুম। যাকে ইংরেজিতে বলে 'হাইবারনেশান'। সানফ্রান্সিস্কোর জুতে যে গ্রিজলে ভালুকটা আছে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'ও গ্রিজলে ! তোমার কী খেতে সব-চাইতে ভাল লাগে গো' ?

কী বললে জান ?

জবাবে স্রেফ আবোল-তাবোল :
দাদা গো—
দেখ্‌ছি ভেবে অনেক দূর।
এই দুনিয়ার সকল ভাল।
ঘুমও ভাল ধকল ভাল,
ট্রাউট মৎস্য যেমন ভাল
ঠিক তেমনি স্যামন ভাল,
গ্রীষ্মে হরিণ-বৎস ভাল,
শীতকালে সীল মৎস্য ভাল,
গিট্‌কিরি গান গাইতে ভাল
কিন্তু সবার চাইতে ভাল
মৌচাকের ঐ মধু মধুর

গ্রিজলে খাঁচা থেকে আর একটু এগিয়ে দেখলাম আর একটি বিচিত্র জীবকে। কে ইনি ? 'মূষিকদ্বিঙ্ক' নাকি 'গজচ্ছয়'। শোনা গেল, দুটোর একটাও নয়। ইনি হচ্ছেন : ক্যাপিবারা।

ক্যাপিবারা : কানে হেডফোন লাগিয়ে শুনি খনিত্রদন্তী বর্গের বৃহত্তম প্রাণী। নিবাস দক্ষিণ আমেরিকা। থাকে জলা জায়গায়। প্রায় ভারতীয় শুয়োরের মাপ। দারুণ সাঁতার কাটতে পারে। ওর জাতীয় শত্রু হচ্ছে জাগুয়ার, কুমির আর মানুষ।

ক্যাপিবারা

ইন্দ্রি : আর জন্মের শোধ দেখে এলাম ইন্দ্রিকে। প্রাইমেট বর্গের শাখামৃগ। প্রায় জায়েন্ট পান্ডার মতোই দুর্লভ। আফ্রিকার দক্ষিণপূবে সেই দ্বীপটার কথা মনে আছে তো ? আগে যার নাম ছিল ম্যাডাগাসকার, এখন মালাগাসে ? তারই উত্তরাঞ্চলের জঙ্গলে টিকে আছে সামান্য সংখ্যায়। হাত পা বাদামী, আর গোটা মুখখানা কুচকুচে কালো। বাকি দেহ ছাই-রঙা। এরা নিরামিষাশী। গাছে গাছে বাস। দল বেঁধে থাকে। কখনো বা জোড়ায় জোড়ায়। কৃচিৎ মাটিতে নামে। তখন কিন্তু কিছুটা দূরত্ব ওরা দু পায়ে হাঁটতে পারে–সিম্পাঞ্জীর মতো। দৈর্ঘ্য 60-90 সে.মি.। ওজনে সাত/আট কে.জি.। সানফ্রান্সিস্কো জু-তে যে ইন্দ্রিকে দেখলুম, কী-জানি কেন সে খুব অবাক হয়ে আমাকে দেখছিল। আমি যেমন জীবনে কখনো দক্ষানন ইন্দ্রি দেখিনি, ও-ও কি তেমনি এর আগে কোন দক্ষলনাট বাঙালী কথাসাহিত্যিক দেখেনি নাকি ?

ইন্দ্রি

আরও অনেক-অনেক বিচিত্র না-মানুষ দেখেছি ফ্রিস্কো জু-তে। সুযোগ পেলে তোমাদের জানাব তাদের কথা। জায়েন্ট পান্ডা দেখতে না পাওয়ার দুঃখ আর রইল না। অদৃষ্টক্রমে এত এত অদৃষ্টপূর্ব না-মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে।

ফেরার পথে কন্যা বুলবুলকে বলি, এইজন্যেই মার্কিন মুলুককে আমাদের দেশে বলে 'অ্যান্টিপোডার রাজ্য' ! এখানে সবই উল্টো-উল্টো।

নাতনি অন্তরা জানতে চায় 'অ্যান্টিপোডা' মানে কী দাদু ?

বলি 'অ্যান্টি' মানে উল্টো, আর 'পড' হবে 'পা'। অর্থাৎ অ্যান্টিপোডা মানে শির-পা মানুষ। ভারতবর্ষের মানুষ যেদিক পানে পা রেখে হাঁটাচলা করে মার্কিন মুলুকের মানুষ হাঁটে তার উল্টো দিকে পা করে।

অন্তরা বিরক্তি প্রকাশ করে, আই ডোন্ট ফলো।

ওর মা বলে, সেটা বাড়ি ফিরে ছবি এঁকে বুঝিয়ে দেব। আর আমাকে বলে, হঠাৎ এ দেশের বিপরীত বুদ্ধি কী দেখলে? কলকাতার চিড়িয়াখানায় হঠাৎ যদি একজোড়া জায়েন্ট পান্ডা দু-সপ্তাহের মতো বেড়াতে আসে, তাহলে এই জাতের ভিড় হত না?

আমি বলি, কী বকছিস্ পাগলের মতো! এযে আমার নিজে চোখে দেখা। এখানে দেখলাম একজোড়া পান্ডার পিছনে হন্যে হয়ে ঘুরছে কয়েক হাজার দর্শনার্থী। আর আমাদের দেশে? কাশী-পুরী-কালিঘাট-যে কোন মন্দিরে যাস্ দেখতে পাবি এক জোড়া দর্শনার্থীর পিছনে হন্যে হয়ে ঘুরছে কয়েক শ' ভীমকায় জায়েন্ট পান্ডা!

জায়েন্ট পান্ডা দেখা হল

সানফ্রান্সিস্কো জুতে সতের দিনের জন্য এসেছে পৃথিবীর অন্যতম দুর্লভ একজোড়া প্রাণী জায়েন্ট পান্ডা। আগের রবিবার অমিত, আমার জামাই, আমাদের সপরিবারে নিয়ে গিয়েছিল ফ্রিস্কো-জুতে। দুভার্গ্য আমাদের। রবিবারের ভিড়ে ভিতরে ঢুকতে পারিনি। তা, হোক নানান বিচিত্র জীব দেখে এসেছি। সে-সব কথা গত হপ্তায় কিছু কিছু বলেছিও।

আমি নাছোড়বান্দা। দিন তিনেক পর আবার গেলাম। এবার একা-একা। অন্তরার স্কুল, অমিতের অফিস। আমি বেকার। রওনা দিয়েছি ভোর ভোর। মঙ্গলে উষা বুধে পা—ওয়ালনাট ক্রীক থেকে মেট্রোরেলে যখন রওনা দিয়েছি তখনো আকাশে 'ভুক্কো-তারা' জ্বলজ্বল করছিল। শিরপা দেশের লোকেরা অবশ্য তাকে বলে 'ভেনাস'। চিড়িয়াখানার গেটে এসে যখন পৌঁছানো গেল তখন বেশ বেলা হয়েছে। যথারীতি তার পূর্বেই কাছেপিঠের মানুষ লাইনে সামিল হয়েছে। আমিও দাঁড়িয়ে পড়ি। আমার সামনে কোনও মেয়ে স্কুলের জনা-বিশেক ছাত্রী—ছয় থেকে ষোলো। আর তাদের দিদিমণি। আন্দাজ হল ঘণ্টা দুইয়ের ভিতরেই পান্ডা খাঁচায় পৌঁছে যাব। লাইনে গুঁতোগুঁতি ঠেলাঠেলি নেই। কর্তৃপক্ষ তকমাআঁটা তদারকির এন্তেজাম করেছেন। না করলেও ক্ষতি ছিল না। কলকাতায় রোদ্যাঁ ভাস্কর্যের প্রবেশদ্বারেও এমন শান্তশিষ্ট ভিড় জমতে দেখেছি, যদিও সেটা অনেক ছোট জাতের, এমন বিরাট নয়। তবে ভোর ভোর বাড়ি থেকে রওনা হয়েছি, রাস্তায় বা টিউবরেল স্টেশনে ইউরিনাল ছিল কি-ছিল না লক্ষ্যই করিনি। একটানা 'হা-পান্ডা যো-পান্ডা' ছুটে এসেছি। এতক্ষণে একটু টয়লেটের দিকে যাওয়া দরকার। লাইনে আমার সামনে ছিলেন মেয়ে-স্কুলের দিদিমণি। তাঁর কাছে 'ছোট-বাইরে' যাবার অনুমতি নিয়ে আমি টয়লেটের দিকে যাই। তোমরা 'ছোট-বাইরে' কাকে বলে জান তো? না হলে বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করে নিও। আমরা সে-আমলে শিক্ষকের (শিক্ষিকা তখন ছেলেদের স্কুলে থাকতেন না) কাছে 'ছোট-বাইরে' বা 'বড়-বাইরে' যাবার অনুমতি নিয়ে ক্লাসের বাইরে যেতাম। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ফিরতে দেরী হত। সে যা হোক, ফিরে এসে এক খেয়ালের ভূত ঘাড়ে চাপল। লাইনে পুনঃসামিল না হয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে কিউ-সরীসৃপের স্কেচ আঁকতে থাকি আমার ড্রইং খাতায়। একটা স্মৃতিচিহ্ন।

যা আশঙ্কা করছিলাম—একটু পরেই দু একজনের নজর পড়ল। একটি মেয়ে সাহস করে এগিয়ে এসে দেখতে চাইল। দেখালাম। তারপর অনেকেই এল। দেখল। নিজেদের সনাক্ত করার চেষ্টা করল—"এই যে মাথায় বো বাঁধা, ঠিক লিজার সামনে—লিজার হাতের হাতব্যাগটা

দেখেই চেনা যাচ্ছে।"

আলাপ হয়ে গেল ওদের সঙ্গে। আমি শিরপা-দেশের মানুষ--সেই আজব শহর ক্যালকাটার -একথা শুনে ওরা উৎসাহিত হল। আবার আমাকে স্কেচ এঁকে বুঝিয়ে দিতে হল কেন ক্যালকাটার মানুষ সানফ্রান্সিস্কোর মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গিতে "অ্যান্টিপোডা।"

নিজেদের মধ্যে কী-সব শলা-পরামর্শ করে দু-একজন এগিয়ে গেল তকমাধারীর কাছে। মানে তদারককারী গার্ড-এর কাছে। লোকটা ঘনিয়ে এসে জানতে চাইল, "ইয়েস, হোয়াট ক্যানাই ডু ফর য়্যু হানি ?"

বলাতেই হবে। গার্ড চল্লিশের কোঠায়, আর ছাত্রীরা নবোদ্ভিন্ন যৌবনা। তাদের আবদেরে গলার অনুনয় শুনতে হবে বইকি। তখন বুঝতে পারিনি, পরে বুঝেছি, ছাত্রীরা আমার হয়ে সুপারিশ করেছিল গ্র্যান্ড-পা আসলে শির-পা! অ্যান্টিপোডা। ক্যালকাটার মানুষ। তাকে ফেবার দেখাতে হবে।

গার্ডও ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারেনি 'আন্টিপোডা' কাকে বলে তা ও জানে না। তখন জিওগ্রাফিতে দড় একটি মেয়ে গার্ডকে ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। গার্ড বুঝেছিল, স্কেচ দেখেই হোক, অথবা ঐ মেয়েটির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে সুগন্ধী পারফিউমের আবেশেই হোক --যে, গ্র্যান্ড-পা লোকটা সারা পৃথিবী বেষ্টন করে একশ আশি ডিগ্রি পাক মেরে এই চিড়িয়াখানায় এসেছে।

গার্ড এগিয়ে এল। বললে, হাই। তুমি আন্টিপোডা ? নকাটা থেকে আসছ ?

আমি বললুম, নো, অ্যান্ড ইয়েস। অর্থাৎ এখন আমি আন্টিপোডা নই। কলকাতায় গেলে তোমার পরিপ্রেক্ষিতে তাই হব।

গার্ড বললে, 'পরিপ্রেক্ষিত' বললে না ? রিলেটিভিটি ? আইনস্টাইন যা বলেছিলেন ? ওসব আমি বুঝি না। তা তোমার খাতাখানা একবার দেখতে পারি ?

আপত্তি কী ? স্কেচখাতাটা দেখাই। উল্টেপাল্টে দেখল। বনফুল, জরাসন্ধ, আশাপূর্ণা, কাউকেই চিনতে পারল না। আমার আঁকার দোষে নয়, নামগুলি ছবির নিচে লেখা ছিল। তবে বঙ্গভাষায়। কিন্তু দর্শনমাত্র চিনতে পারল শেষ পাতায় আঁকা ছবিগুলো—পেঙ্গুইন ক্যানবারা, গ্রিজলে বেয়ারদের। জানতে চাইল, লাস্ট সানডের তারিখ দেখছি ?

—হ্যাঁ, সেদিন এসেছিলাম। পান্ডা দেখার সুযোগ পাইনি, তাই আজ সকাল-সকাল এসেছি।

গার্ড বললে, লুক হিয়ার স্যার, এই স্কুলের মেয়েরা আমার কাছে অ্যাপীল করেছে তোমাকে স্পেশাল ফেবার দেখানো উচিত। কারণ তুমি শিরপা-দেশের লোক, ক্যালকাটায় আকাশ পানে পা করে হাঁটো। সেই কৃতিত্বের জন্য নয়, তবু যেহেতু তুমি অনেক দূর দেশ থেকে আসছ......

আমি বাধা দিয়ে বলি, কিন্তু আমি তো তোমার কাছে কোনও স্পেশাল ফেবার চাইনি ?

—না, তা চাওনি। তবে এই ফুলের মতো সুন্দর মেয়েরা যা বলছে তার পিছনেও যুক্তি আছে। তাই আমি আইন না ভেঙেও তোমাকে সাহায্য করতে স্বীকৃত। তুমি লাইন থেকে বেরিয়ে এস। দু-ঘণ্টা ধরে এ চিড়িয়াখানায় যথেচ্ছ স্কেচ এঁকে বেড়াও—তারপর দু-ঘণ্টা

কেটে গেলে বারোটা-নাগাদ এখানে ফিরে এস। কারণ সেটাই হবে তোমার ভিতরে ঢোকার আইন-নির্দেশ মোতাবেক সময়, তখন এই মেয়েদের দলের সঙ্গে আমি তোমাকেও ভিতরে ঢুকিয়ে দেব।

আমি বলি, থ্যাঙ্কু ' তুমি কাইন্ডলি একটু দাঁড়াবে। তাহলে আমার খাতায় তোমারও একখানা স্কেচ এঁকে নিতুম।

লোকটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, না ' ঐ ওরাংওটাং আর ইন্দ্রির পাশে আমার ছবি আঁকার দরকার নেই।

ওকে বোঝাতে গেলাম যে, আমি অন্য একটা শাদা পাতায় ওর স্কেচ এঁকে ওকেই উপহার দিতে চাই। কিন্তু তার আগেই মেয়ের দল খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ফেলেছে।

গার্ড-সাহেব দুম-দুম করে দূরে সরে গেল।

*　　*　　*

জায়েন্ট পান্ডা দৈর্ঘ্যে সওয়া থেকে দেড় মিটার। ছোট্ট লেজ—আছে-কি-নেই। মাপ নিতে পারলে তের সে.মি. হবে বোধহয়। ওজন দেড়শ কে.জি. পর্যন্ত। আগেই বলেছি, ওদের নিবাস দক্ষিণ কেন্দ্রীয় চীনখণ্ডে। সেখানে জন্মায় এক বিশেষ জাতের বাঁশ। ঐ বাঁশের কোঁড়ই ওদের খাদ্য। আট থেকে বারো হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচু পাহাড়ে তুষাররাজ্যে ওদের বাস।

দুটি চোখ, দুটি কান, নাকের ডগা, চারটে পা আর কাঁধের কাছে সরু হয়ে যাওয়া একটা বর্ডার হচ্ছে কুচকুচে কালো। বাকি দেহ তুষারশুভ্র। খায় থাপন জুড়ে বসে। দু-হাতে বাঁশ ধরে কড়-মড় করে চিবিয়ে খায়। দেড় ইঞ্চি (3.8 সে.মি.) ব্যাসের বাঁশ পর্যন্ত অনায়াসে চিবিয়ে খায়। ওদের বাগিয়ে বাঁশ ধরার কায়দাটাও লক্ষ্য করে দেখার। মানুষ যখন লাঠি ধরে তখন তার চারটে আঙুল থাকে একদিকে মুখ করে আর বুড়ো আঙুল থাকে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। কিন্তু জায়েন্ট-পান্ডা তার পাঁচ-পাঁচটা আঙুল দিয়েই বাঁশটাকে সাবড়ে ধরে। তার কারণ ওদের হাতের তালুতে আছে কিছু মাংসপিণ্ড (ক, খ, গ-চিহ্নিত) যা দিয়ে বাঁশটাকে স্ব-স্থানে ধরে রাখতে পারে। দিনে প্রায় পনের ষোলো ঘণ্টা ধরে ওরা এভাবে ক্রমাগত বাঁশ চিবিয়ে খায়। বাকি সময় ঘুমায়। সারা বছরে একটি পূর্ণদেহী জায়েন্ট পান্ডা প্রায় সাড়ে চার টোন বাঁশ খেয়ে ফেলে। বাস্তবে 'পান্ডা' নামটা হয়েছে ঐ জন্য। স্থানীয় চীনাভাষায় 'পান্‌ডা' মানে bamboo eater—বংশভুক।
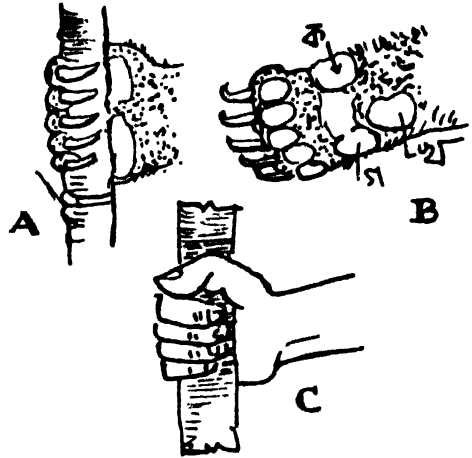
মানুষ এবং পান্ডার

দৈনিক ওর খাদ্য তিন-সাড়ে তিন হাজার সরু মোটা বাঁশ ! তাছাড়াও এরা গাছ-পাতা ফুল-মধু চেখে দেখে। কখনো বা মাংসও। তবে ওদের খাদ্যের পরিমাণে শতকরা নিরানব্বই

ভাগ হচ্ছে ঐ বিশেষ জাতের বাঁশ।

মায়ের গর্ভধারণকাল পাঁচ মাস। একবারে সচরাচর একটিই সন্তান জন্মায়। কৃচিৎ কখনো বা দুটি। বাচ্চা নেহাৎ চুন্নুমুন্নু—সদ্যোজাতর ওজন চার আউন্স (113 গ্রাম)। কিন্তু মাস-চারেকের মধ্যেই লায়েক হয়ে ওঠে। তখন বাঘাহামা দেয়। ওজন সেসময় তিন কিলো। প্রথম কয়েকমাস মা বাচ্চাদের পাহারা দেয়। তখন কোন শেয়াল, হায়না বা স্নো-লেপার্ড লোভে পড়ে পান্ডার ছানা খেতে এলে তার কপালে দুঃখ আছে। পান্ডার থাবা আর দাঁতের জোর অবিশ্বাস্য। চিতাবাঘ পর্যন্ত পালিয়ে বাঁচে।

আবার দরকার পড়লে মা-বেড়ালের মতো আলগা দাঁতে ঝুলিয়ে পান্ডা জননী তার ছানাপোনাদের ঠাঁইনাড়া করে।

জায়েন্ট পান্ডার এক জ্ঞাতিভাই আছে আমাদের দেশে। হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে। তার নাম লাল-পান্ডা। তার সঙ্গে মার্কিন দেশের রাকুনদের আকৃতি-প্রকৃতির বেশ সাদৃশ্য। কিন্তু কী রেডপান্ডা, কী রাকুন—কেউই জায়েন্ট পান্ডার মতো পশ্চাদদেশ মাটিতে রেখে, 'থেবড়ে-বসে' খাবার খায় না। তা পারে ভালুক। সেজন্য এবং আরও কয়েকটি জীববিজ্ঞান সম্মত হেতুতে কোন কোন পন্ডিতের মতে জায়েন্ট পান্ডা আর ভাল্লুক এরই পরিবারভুক্ত, নিকট আত্মীয়। আবার অন্য এক দলের জীববিজ্ঞানী বলেন, না এরা রাকুন পরিবারের।

আগেই বলেছি, জায়েন্ট পান্ডা দুর্লভতম প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম। চিড়িয়াখানায় অনেক আয়াসেও এদের বংশবৃদ্ধির প্রয়াস বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। এদের বাঁচিয়ে রাখতে হলে সবার প্রথমে সংরক্ষণ করতে হবে ঐ বিশেষ জাতের বাঁশ গাছ। মানুষ জঙ্গল কেটে ক্ষেত আর বসত বানাতে চায়। তাতে ঐ বংশভুকদের বিচরণ ক্ষেত্র ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে।

আরও একটা বিরাট সমস্যা :

প্রতিটি জাতির বাঁশগাছের মাঝে মাঝে 'গণমৃত্যু' হয়। বিশ-পঞ্চাশ বছর পর পর। সেই সময় ঐ বিশেষ প্রজাতির প্রতিটি বাঁশগাছে ফুল ধরে। একই সঙ্গে। ফুলগুলো যখন ঝরে যায় তখন বাঁশগাছের হয় মৃত্যু। এভাবে গোটা বাঁশের জঙ্গল নির্মূল হয়ে যায়।

জায়েন্ট পান্ডা ঠিক যে প্রজাতির বাঁশ খায় তার মড়ক একবার লেগেছিল 1975 সালে। পাশাপাশি বাঁশ ঝাড়ে ফুল এল, আর সব গাছ মরে যেতে শুরু করল। বিজ্ঞানীরা কোন ব্যবস্থাই নিতে পারলেন না। সে বছর শুধু খাদ্যাভাবে প্রায় 150টি জায়েন্ট পান্ডা মারা পড়ে।

ইদানীং উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা আরও নতুন-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সাফল্যলাভ করেছেন। সাম্প্রতিক সংবাদ—আবারও যদি ঐভাবে বাঁশের মড়ক লাগে তাহলে খাদ্যাভাবে জায়েন্ট পান্ডার দল মারা যাবে না।

যা হোক, পান্ডা দর্শনের কাহিনীতে এখানেই যবনিকা টানি। সোজা হিসাবে, ভারতে বিভিন্ন মন্দিরে জায়েন্ট পান্ডাদের কৃপায় ভিড় ঠেলে আমার কিছু কিছু দেবদর্শন যেমন হয়েছে ; তেমনি ঐ শিরপা দেশে দেবতাদের কৃপায় ভিড় ঠেলে আমার এক জোড়া জায়েন্ট-পান্ডা দর্শনও হয়েছে।

আকাশজয়ের সূচনা : পাখি

মেরুদণ্ডী প্রাণীর পক্ষে আকাশে ওড়ার পথে ছিল নানান জাতের দুরতিক্রম্য বাধা। তাই বিশ-বাইশ কোটি বছরের বিবর্তন-ইতিহাসে মাত্র দু'-একটি মেরুদণ্ডী প্রাণী এই দুর্লভ ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। বাকিরা অনিবার্যভাবে ব্যর্থ হয়। প্রথম কথা, মেরুদণ্ডবিশিষ্ট প্রাণীর বেশ কিছুটা ভর বা ওজন থাকতেই হবে—তার মেরুদণ্ডের জন্য, নানান অস্থির জন্য, মস্তিষ্কের জন্য। এইসব কারণে তার একটা ন্যূনতম ওজন থাকবেই। ফলে অমেরুদণ্ডী হালকা পতঙ্গ যেভাবে সহজে পার্থিব মাধ্যাকর্ষণের বাধা অতিক্রম কবতে পেরেছিল, এরা তা পারল না। সবচেয়ে হালকা ধরনের মেরুদণ্ডী জীব সবচেয়ে ভারী জাতের পতঙ্গের চেয়েও ওজনদার।

অপরপক্ষে দেহ আকাশে উড়বার উপযুক্ত হতে হলে ওজন বেশ কিছুটা কমানো চাই। ওজনের একটা উর্ধ্বসীমা অতিক্রম করলে চলবে না। মানুষের তৈরী আকাশযানের ওজনবৃদ্ধিতে আপত্তি নেই, যতক্ষণ বিজ্ঞান সেই ওজনদার এয়ারোপ্লেনকে উড্ডীয়মান থাকবার উপযুক্ত শক্তি সরবরাহ করতে পারবে। কোন জীবের দৈহিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। মাংসপেশীর তাগৎও। ফলে উড়তে যারা চাইল তারা ওজনের ঐ উর্ধ্ব ও নিম্নসীমার মধ্যে দেহকে নানাভাবে বিবর্তনে সচেষ্ট হল।

উড়তে হলে একজোড়া ডানা চাই। মেরুদণ্ডীপ্রাণীর ভিতর যারা আকাশে উড়বার চেষ্টা করেছে তারা প্রত্যেকেই সামনের হাত-জোড়ার সঙ্গে ঐ ডানাকে সংযুক্ত করেছে—কী সরীসৃপ, কী পাখি, কী স্তন্যপায়ী— হাত-জোড়ার সংলগ্ন মাংসপেশীকে ক্ষমতাশালী করে তুলেছে। ডানার সঙ্গে হস্তদ্বয়ের সংযোগকারী মাংসপেশীকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করার প্রয়োজনে বক্ষ-অস্থি (Sternum) বা breast-boneকে আকারে বৃহত্তর করেছে। অন্য কোন শ্রেণীর জীবের বক্ষ-অস্থি দেহের তুলনায় পাখির বক্ষাস্থির মতো বৃহদাকার নয়। এ-ছাড়া উড্ডয়ন অবসানে যখন জীবটা মাটিতে নামবে তখন গতিবেগ সংবরণের জন্য একটা উপযুক্ত প্রত্যঙ্গ চাই—সে দায়িত্ব দেওয়া হল পিছনের ঠ্যাঙজোড়াকে। দেহের ওজন কমানোর উদ্দেশ্যে দেহাস্থিকে বানানো হল ফাঁপা করে। 'তল্‌তা' বাঁশের মতো তা দৃঢ় অথচ হালকা।

এবার প্রশ্ন হল : ডানাজোড়া কী দিয়ে বানানো হবে ? উড্ডয়নের বিবর্তন-ইতিহাসে দেখছি সরীসৃপেরা দুটি বিকল্প পথে এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছিল। প্রথম দল টেরোসর-টেরডন-টেরড্যাক্‌টিল প্রভৃতিরা, দুই হাতের মাঝখানে পয়দা করল একজাতির ঝিল্লিময় পর্দা—'মেম্‌ব্রেন।' তারা আকাশে উড়তে পারল বটে, কিন্তু আকাশজয় দীর্ঘস্থায়ী করতে পারল না। তারা অবলুপ্ত হয়ে গেল—ঝিল্লিময় পর্দার দোষে নয়। অন্য হেতুতে—কারণ ঐ ঝিল্লিময় পর্দা নিয়ে আজও দুনিয়াদারী করছে বাদুড়।

দ্বিতীয় দল ঝিল্লিময় চামড়ার পাতলা পর্দা বানানোর চেষ্টা আদৌ করেনি। পয়দা করল একটা অভূতপূর্ব অনবদ্য দেহবৈশিষ্ট্য—পালক।

হালকা, বাতাস আটকায়, পাশাপাশি সাজিয়ে ঝিল্লিপর্দার কাজটা সারতে পারে। দেহে পালক জন্মানো শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে ওরা আর সরীসৃপ রইল না, হয়ে গেল গৌরবান্বিত ডাইনোসর—পাখি।
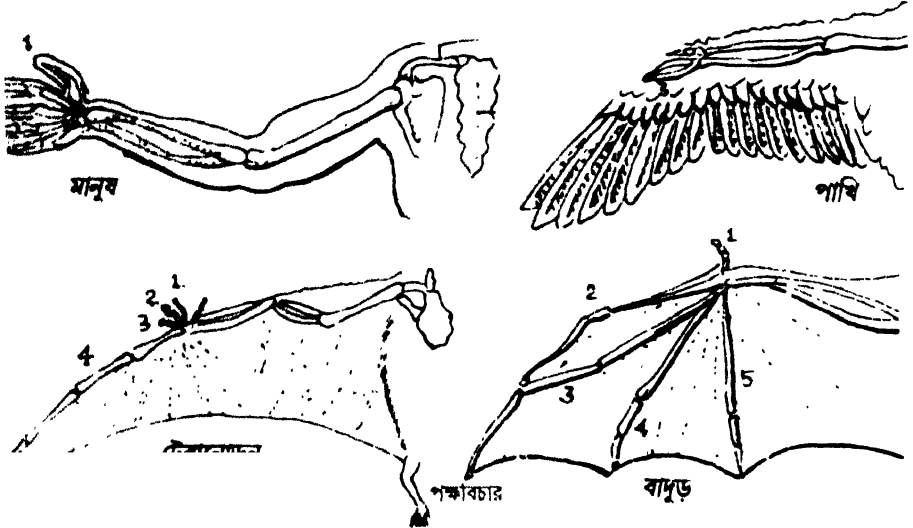
পতঙ্গ যেমন ধীরগতিতে ওড়ে—প্রজাপতি, ফড়িং, মশা—ওজনদার মেরুদণ্ডী প্রাণীর পক্ষে সেভাবে বাতাসে ভেসে থাকা মুশকিলের। 'গতি' তার উড্ডীয়মানতার অন্যতম মূলধন। গতিবেগ যত কমবে মাটিতে উল্টে পড়ার সম্ভাবনা ততই বাড়বে। অনেকটা দু-চাকার সাইকেল চালানোর মতো। ভারসাম্যের জন্য সাইকেল-আরোহীর একটা নিম্নতম গতিবেগ চাই। বেশ কথা। গতিবৃদ্ধির ব্যবস্থা না হয় করা গেল। কিন্তু তার আনুষঙ্গিক হিসাবে আরও কিছু প্রাসঙ্গিক ইন্দ্রিয়গ্রামকে যে উন্নত করতে হবে। পাখি যেমন উন্নত করেছে তার দৃষ্টিশক্তিকে—বাদুড় করেছে তার শ্রুতিকে। কারণ উড্ডয়নকালে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্যের ব্যবস্থা না থাকলে ভারসাম্য রক্ষিত হবে না। এজন্য আকাশচারীর চাই সূক্ষ্ম 'অনুভূতিপ্রবণতা'।

শেষ কথা, উড্ডীয়মান মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে উচ্চমানের জৈবরাসায়নিক বিপাকের (high rate of body metabolism) প্রয়োজন। এই শর্তটিও পূরণ করতে পারেনি টেরোড্যাকটিল জাতীয় বিশালকায় আকাশচারী ডাইনোসরেরা। তারা ছিল শীতল রক্তের প্রাণী। ক্রমাগত দ্রুত পক্ষসঞ্চালনের জন্য যে উন্নতমানের জৈবরাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্রুত পরিপূরক আবশ্যক তার আয়োজন ছিল না ডাইনোসরের শীতল রক্ত চলাচল ব্যবস্থাপনায়।

পাখি, সরীসৃপদের পিছনে ফেলে আকাশজয় করল দু-দুটি মৌল হেতুতে। এক : দেহে পালক পয়দা করে, দুই : শীতলরক্তের প্রাণী থেকে উষ্ণরক্তের জীবে উত্তরণে।

এবার দেখি, কী-ভাবে ধাপে ধাপে তা হল :

টেরসরদের আবির্ভাব

ট্রায়াসিক যুগের প্রাণী থেকডন্ট-এর একটি শাখায় বিবর্তিত হয়েছিল টেরোসরিয়া (Pterosauria) বর্গের চতুষ্পদ প্রাণী। তারা নভোচর হতে চাইল। জুরাসিক যুগের প্রথম দিকেই আবির্ভূত হয়েছিল রামফোরিঙ্কাস (Rhamphorhynchus) —যারা আকাশে উড়তে পারত। সরীসৃপ-ডাইনোসর, শীতল রক্তের প্রাণী, তবু বোধ করি মেরুদণ্ডী প্রাণী হিসাবে সেই প্রথম নভোচারী। আকারে তারা খুব বড় নয়—পৌনে এক মিটারেরও কম। অক্ষিকোটর
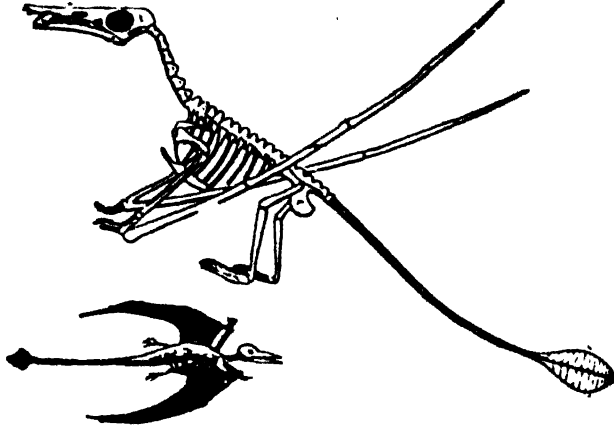
রামফোরিঙ্কাস

বড়, মুখটা বেশ লম্বাটে। তাতে দুই সারি দাঁত। এরা ছিল মৎস্যভুক। মাছরাঙার মতো জলে ঝাঁপ দিয়ে মাছ তুলে নিত মুখে। গলা বেশ লম্বা। তাতে সাতটি অস্থি (সাত ? হ্যাঁ, সেই সাতই। যা আছে জিরাফ, তিমি কিংবা মানুষের, এই বিশ কোটি বছর পরেও !) লেজটি প্রকাণ্ড। শ্রোণি চক্রের (pelvic girdle) সামনে মেরুদণ্ডের যা দৈর্ঘ্য প্রায় তার দ্বিগুণ লম্বা ঐ লেজটি। শেষপ্রান্তে আবার একটি ঝিল্লিময় বাহার। এয়ারোপ্লেনের রাডার যেন !

হিউমেরাস-অস্থি বেশ শক্ত, রেডিয়াস-আলনাও দীর্ঘায়ত অস্থি। চতুর্থ আঙুলটি মাত্রাতিরিক্তভাবে দীর্ঘ। বস্তুত এই চতুর্থ আঙুলটি—হিসাব মতো 'অনামিকা'টি—ডানার ঝিল্লির পর্দাকে ধরে রাখে। সামনের তিনটি আঙুল—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী ও মধ্যমা নখরলাঞ্ছিত হুক-এ রূপান্তরিত হয়ে গেছে। গাছের ডাল বা কাণ্ড থেকে ঝুলে থাকার জন্য তার ব্যবহার। পঞ্চম বা শেষ আঙুল, কনিষ্ঠা, বেমালুম নাপাত্তা !

টেরানোডন

জুরাসিক যুগের ক্ষুদ্র ডাইনোসর রামফোরিঙ্কাস কোনক্রমে আকাশে উড়তে পারল বটে কিন্তু নভোচারী হওয়ার পথে তখনো তার সামনে হিমালয়ান্তিক বাধা। তবু-সেই হচ্ছে আদিমতম ডাইনোসর যে আকাশে উড়বার চেষ্টা করেছিল এবং সফলও হয়েছিল। তা থেকে ক্রমে বিবর্তিত হল নানান জাতের জীব—তারাও টেরসর, তাদের বলা হয় টেরড্যাক্টিলয়েড। তাদের লেজ ক্রমশ ছোট হতে শুরু করেছে। দাঁতও মাপে ছোট হতে শুরু করেছে।

পরবর্তী ক্রিটেশিয়াস যুগে ঐ ধারায় বিবর্তিত হল—টেরানোডন গণের কিছু ডাইনোসর। তারা বস্তুত এ বিবর্তনপথের শেষ সাফল্য। টেরানোডন আকারে যথেষ্ট বড়। ডানার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ছয় মিটারের বেশি। তবু ডানা বাদে তাদের দেহবৃদ্ধি এমন কিছু নয়—টার্কি বা ময়ূরের মতো। এদের কিন্তু মুখে দাঁত নেই। লম্বা ঠোঁট ; আর ঐ দীর্ঘায়ত চঞ্চুর সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করে বিরাট লম্বা মাথা ; যেন ফুলস-ক্যাপ টুপি পরেছে। টেরানোডন নভোচারী, মৎস্যভুক, যদিও সে পাখি নয়, ডাইনোসর।
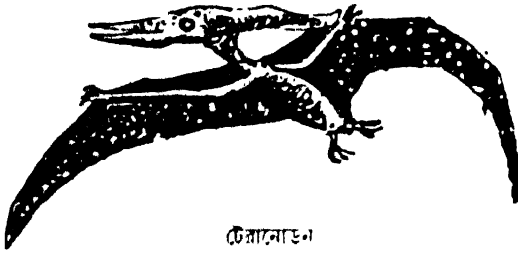
টেরানোডন

প্রসঙ্গত বলি, দেহবৃদ্ধিতে প্রায় একই সময়ে আর এক জাতের নভোচর অনেক, অনেকটা এগিয়ে গেছিল। মার্কিন মুলুকের টেক্সাসে এদের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। তাদের চলতি কথায় বলে 'সরীসৃপ-শকুন'। অতি প্রকাণ্ড নভোচর জীব। ডানার বিস্তার অন্তত পনের মিটার।

প্রশ্ন হচ্ছে : আকাশজয় সম্পন্ন করা সত্ত্বেও ঐ টেরানোডনেরা কেন জীবনযুদ্ধে পরাজিত এবং ক্রমে অবলুপ্ত হয়ে গেল? পল মুডির প্রামাণ্য গ্রন্থ Introduction to Evolution-এ দেখছি ক্রিটেশিয়াস যুগের ঐ টেরানোডন গণের প্রাণীরা আকাশ-জয়ের প্রায় সব কিছুই সফল করেছিল :

Their bones were hollow, and consequently light The sternum or breastbone was relatively large, furnishing attachment for breast muscles connected to the wings....The pterosaur brain was large for a reptile, the sense of sight being strongly developed, as in birds. Possibly pterosaurs were warm blooded, it is difficult to see how a really cold blooded animal could maintain the activity necessary for flight

তাহলে দেখছি, টেরানোডনের হাড়গুলো ছিল ফাঁপা, পাখির ঢঙে। বক্ষাস্থিও আধুনিক পাখির মতো আকারে বড়, যাতে হাতডানার মাংসপেশী মেরুদণ্ডের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত হতে পারে। মস্তিষ্ককোরক বেশ বড়—অর্থাৎ মস্তিষ্কও বড়। দৃষ্টিও পাখির মতো। সবচেয়ে বড় কথা : সে আর সরীসৃপসুলভ শীতল রক্তের প্রাণী নয়। পাখির মতো উষ্ণ রক্তের। ভাষান্তরে উড়বার সময় যে উচ্চমানের জৈব-রাসায়নিক বিপাকের প্রয়োজন তার এন্তাজাম করার হিম্মৎ ছিল টেরানোডনের। একমাত্র পালক সে পয়দা করতে পারেনি—তাছাড়া পাখির দলে তাকে চিহ্নিত করতে বাধা কোথায়?

তাহলে কেন সে জীবনযুদ্ধে পরাজিত?

তার হেতুটা সমঝে নিতে হলে টেরানোডনের কঙ্কালটাকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখা দরকার। প্রথম কথা, ওর উপরের হাত (humerus) পিঠের দিকে একটি অভূতপূর্ব অস্থির সঙ্গে যুক্ত—তার নাম নোটারিয়াম। সেটা অনেকটা স্তন্যপায়ী বা পাখির স্ক্যাপুলা অস্থির মতো। এটি ছিল না পূর্বযুগের নভোচর-ডাইনোসরের। এর ব্যবস্থাপনায় হাতটা মেরুদণ্ডের সঙ্গে

দৃঢ়ভাবে যুক্ত হবার আয়োজন হল। দ্বিতীয়ত দেখছি, চতুর্থ আঙুলটি ঠিক রামফোরিঙ্কাসের মতো দীর্ঘায়িত হয়ে ঝিল্লিডানাকে ধরে রেখেছে বটে, কিন্তু কবজির কাছে আরও একটি অস্থি গজিয়েছে—টেরয়েড-অস্থি (pteroid bone)। সেটি ডানাকে দৃঢ়তা দান করেছে কিছুটা। কিন্তু এই ব্যবস্থাপনাও ঝিল্লিডানার নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট নয়। অভাব বা ত্রুটিটা কোথায় হচ্ছে বোঝা যাবে যদি আমরা পাশাপাশি দুটি ঝিল্লিপর্দার চর্মডানা এঁকে দেখাই। একটি জীবনযুদ্ধে পরাজিত অবলুপ্ত ডাইনোসর টেরড্যাকটিলের, দ্বিতীয়টি জীবনযুদ্ধে জয়ী বর্তমান যুগের স্তন্যপায়ী বাদুড়ের। ঐ সঙ্গে মানুষ ও পাখির হাত। টেরানোডনের ঝিল্লিপাখার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একপ্রান্তে সাপোর্ট। দীর্ঘায়ত চতুর্থ আঙুলে। অপরপক্ষে বাদুড় শুধু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠতে নখ জিইয়ে রেখেছে, গাছের ডাল আঁকড়ে ধরার জন্য (বস্তুত সে-প্রয়োজনে ও ঠ্যাঙ-জোড়াকেই বেশি ব্যবহার করে), বাকি চারটি আঙুলে ডানাকে জোরদার করার ব্যবস্থাপনা। তর্জনী ও মধ্যমা সংযুক্তভাবে প্রান্তভাগের মহড়া নিচ্ছে, চতুর্থ ও পঞ্চম আঙুল অপর দুটি 'এড়ো-ঠেকার' কাজ করছে। এজন্য ঝড়ে বা প্রবল বাতাসে বাদুড়ের ডানা ছিঁড়ে যাবার আশঙ্কা কম, টেরনোডনের ক্ষেত্রে তা খুবই বেশি। কোন জীববিজ্ঞানী অবশ্য একথা স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে যে, পাখির গুণাবলী পুরোপুরি করায়ত্ত করা সত্ত্বেও টেরানোডন যে জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেল তার হেতু : সে ভাল জাতের এঞ্জিনিয়ার ছিল না—সে তার ডানায় এড়োএড়ি-ঠেকা দেয়নি। গোটা ডানা একটি আঙুলে 'ক্যান্টিলিভার' করে দেহ গঠন করেছিল। তাই গ্রীক দেবতা ইকারাসের মতো ছিন্নপক্ষ টেরানোডন বারে বারে সলিল সমাধি লাভ করেছে। বাদুড় ইকারাসের পিতৃদেব দাদালাসের মতো কালসমুদ্র পাড়ি দিতে পেরেছে।

কিন্তু ঐ সামান্য ত্রুটিটা কেন টেরানোডনের উত্তরসূরীরা বিবর্তনের মাধ্যমে শুধরে নিতে পারল না? ঝিল্লিডানাটা কেন কমজোর হচ্ছে এটা তো সহজবোধ্য। বাকি আঙুলগুলো বাদুড়-ঢঙে প্রসারিত করতে কয়েক লক্ষ বছর সময় লাগার কথা। কিন্তু তা হতে পারল না অন্য একটি হেতুতে। অন্য এক প্রতিযোগীর আবির্ভাবে।

সমান্তরালে একই কাজ করে যাচ্ছিল আর এক জাতের প্রাণী। তারাও সরীসৃপ, তারাও ডাইনোসর—ঐ আদিম থেকডন্টেরই উত্তরপুরুষ। তারাও আকাশজয়ের প্রতিযোগী।

তারা চর্মপর্দার ঝিল্লি দিয়ে ডানা বানায়নি—বানিয়েছে এক অভূতপূর্ব প্রত্যঙ্গ দিয়ে : পালক। তাতে শুধু পাখাই জোরদার হল না, দেহে আবরণ হিসাবে তা শীতাতপ থেকে রক্ষাকারী। তারা দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণতর করল, বুকের পাঁজরাকে আকারে বৃহত্তর করল, শীতল রক্তের প্রাণী থেকে তাদের উত্তরণ হল উষ্ণ রক্তের প্রাণীতে।

তারা হল : পাখি।

একটা কথা আমরা সচরাচর খেয়াল করি না। মনে করি, পাখিরা এসেছে বিবর্তন ইতিহাসে উড়ন্ত সরীসৃপদের অনেক পরে। অর্থাৎ রামফোরিঙ্কাস, টেরানোডন, টেরড্যাকটিলদের পরে এসেছে পাখি। সেটা ভুল। পাখিরা বিবর্তিত হচ্ছিল উড়ন্ত ডাইনোসরদের সমান্তরালে, সেই জুরাসিক যুগ থেকে। তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে করতে উড়ন্ত ডাইনোসরেরা অবলুপ্ত হয়ে গেল।

জুরাসিক যুগের পাখি

বিবর্তনের প্রসঙ্গে আমরা একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাই : 'মিসিং লিংক'। ঐ শব্দটার অর্থ অনেক কিছুই হতে পারে, কিন্তু জীববিজ্ঞানে তার একটা যোগরূঢ় অর্থ আছে : একটি বিশেষ জীব যার সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি, অথচ যা দুটি সুপরিচিত এবং সুনির্দিষ্টভাবে
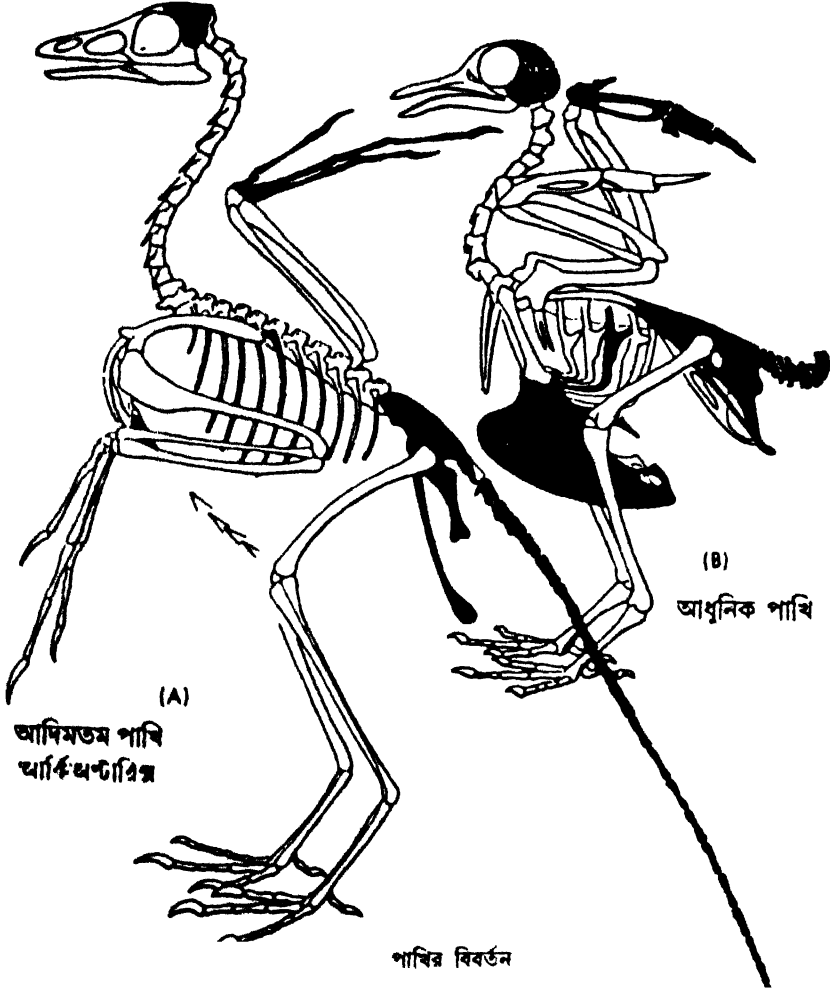
পাখির বিবর্তন

চিহ্নিত পৃথক ধরনের জীবের মাঝখানে অবস্থিত বলে অনুমান করা হচ্ছে। যেমন নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানের বিভিন্ন পরিচিত ধাপ—রামাপিথেকাস, অস্ট্রালোপিথেকাস, হোমোহ্যাবিলিস, হোমোইরেক্‌টাস, হোমোসেপিয়েন্স-এর মাঝখানে মাঝে মাঝেই 'মিসিং লিংক'-এর সন্ধান নিয়ে আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

উড্ডীয়মান সরীসৃপের ধাপ থেকে পাখির বিবর্তনের মাঝখানেও বিজ্ঞানের কল্পনায় ছিল অমন একটি 'মিসিং লিংক'। নিতান্ত ঘটনাচক্রে সেটিকে উদ্ধার করা গিয়েছিল জার্মানীর

ব্যাভেরিয়া অঞ্চলে। সেটিকেই বলা হয় পাখির বিবর্তন ইতিহাসে আদিমতম পক্ষী : archaeopteryx : আরকিয়প্টরিক্স। পাখিটার জীবাশ্ম নয়, তার 'ছাপ'-এর। পাখিটা ব্যাভেরিয়ায় অবস্থিত একটি জলাশয়ে পড়ে যায় এবং তার উপর চুন-মিশ্রিত পলিমাটির আস্তরণ পড়তে থাকে। ক্রমে সেই চুন-মাটি চুনাপাথরে রূপান্তরিত হয়ে যায় আর ঐ মৃত পাখিটার নিখুঁত ছাপ কোটি-কোটি বছর ধরে অবিকৃত আকারে ধরে রাখে। এত নিখুঁত জীবাশ্ম একটা দুর্লভ সম্পদ! শুধু হাড়ের ছাপ নয়, ঐ পাখির পালকের ছাপও।

সে পালকের ছাপ যদি না দেখতে পাওয়া যেত তাহলে বিজ্ঞানীরা ঐ জীবাশ্ম-ছাপকে একটি সরীসৃপের বলে ধরে নিতেন, কারণ আর্কিয়প্টরিক্স-এর দেহগঠনে সরীসৃপীয় চারিত্রিক নিদর্শন যথেষ্ট। আকারে একটা দাঁড়কাকের মতো। মাথাটা টেরসর-ধরনের—লম্বা গলা—জোরালো একজোড়া পিছনের পা, তাতে চারটি করে আঙুল। লক্ষণীয়, তিনটি আঙুল সামনের দিকে এবং একটি পিছন ফিরে—ঠিক যেমন দেখা যায় আজকের দিনের পাখির, এবং যেমন ছিল না রামফোরিণ্‌ক্যাস থেকে নের (তাদের চারটি আঙুলই একমুখী)। প্রসঙ্গত এই 'তিন-আঙুল-সামনে ও একটি পিছনে'-র যে ছন্দ এটা আমরা লক্ষ্য করব কিছু থেরোপড ডাইনোসরের ক্ষেত্রেও—তাদের প্রসঙ্গে এখনি আসা যাবে।

অ্যার্কিঅপ্টারিক্স-এর জীবাশ্ম

আর্কিয়প্টরিক্সের সামনের হাতজোড়াতে দেখা যাচ্ছে—হিউমারাস অস্থি সুপরিণত। স্ক্যাপুলা-অস্থি গঠিত। ক্লাভিকিল (মানুষের ক্ষেত্রে যা Collar bone বা কণ্ঠাস্থি) বর্তমান। যদিও মনে হয় দুটি অস্থিই পাথরের চাপে স্থানচ্যুত। রেডিয়াস আর আলনা সংযুক্ত। হাতে তিনটি দীর্ঘায়ত নখলাঞ্ছিত আঙুল।

বেশ বোঝা যায় এ উড়তে তো পারতই, মুরগী বা তিতিরের মতো মাটিতে হাঁটতেও পারত, যা সম্ভবত পারত না টেরানোডনেরা। বৃহদাকার করোটি থেকে অনুমান করা হয় যে, ওর মেরুদণ্ডের অন্তরে সুগঠিত কেন্দ্রীয় স্নায়ুগুচ্ছ অবস্থিত ছিল। উড্ডীয়মান কোন জীবের পক্ষে যা একান্ত জরুরী। ওর পালক প্রমাণ দেয় যে বাইরের শীতাতপ থেকে দেহকে সুরক্ষা করার আয়োজন ও করতে পেরেছিল। যার অনুসিদ্ধান্ত ও সরীসৃপের মতো শীতলরক্তের প্রাণী ছিল না—আধুনিক পক্ষিকুলের মতো ছিল : উষ্ণরক্তের বিহঙ্গ।

বিহঙ্গের আদিম আকাশচারণ

হোমোসেপিয়ন্স প্রজাতির আদিম আকাশচারণের ইতিহাসটা নিশ্চয় জানেন। গ্রীকবীর ইকারাস থেকে মার্কিন রাইট-ব্রাদার্স। এর পশ্চাতে ছিল দীর্ঘদিনের সাধনার ইতিহাস। বস্তুত মানুষের আকাশজয়ের চিন্তা দ্বি-ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। যাঁরা ঐ দুটি পথের একটিকে বেছে নিয়ে মরণপণ লড়াই করেছিলেন তাঁরা বোধকরি জানতেন না—দশ-বিশ কোটি বছর ধরে প্রাগমানব একটি জীব—ডাইনোসর, ঠিক ঐদুটি বিকল্প পথেই একই সমাধান খুঁজেছিল : আকাশে ওড়া।
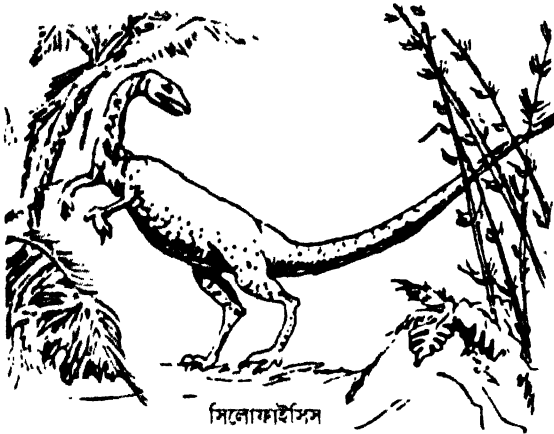
সিলোফাইসিস

মানুষের নভোবিজয়ের দুটি ধারা কী ? এক নম্বর : দুটি হাতে কৃত্রিম ডানা বেঁধে উঁচু জায়গা থেকে ঝাঁপ খাওয়া। হাত-ডানা নেড়ে নেড়ে বাতাসে ভাসবার চেষ্টা করা। যাকে বলে 'গ্লাইড' করা।

ঐতিহাসিক কালের ইংলন্ডেশ্বর ব্লাদুদ ঐভাবে আকাশজয়ের বোধকরি প্রথম শহীদ। পুত্রের পরিচয়ে অন্তত তাঁকে চিনবেন। কিং ব্লাদুদ হচ্ছেন কিং লিয়রের পূজ্যপাদ পিতৃদেব। তারপর একাধিক উৎসাহী ঐপথে চেষ্টা করে দেখেছেন। যেমন সল্‌স্‌বেরীর পাদরী অলিভার। পুনঃপুন প্রচেষ্টার দৌলতে তাঁর নামই হয়ে গেছিল 'দ্য ফ্লাইং মংক'। এছাড়া রেনেসাঁ যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভা লেঅনার্দো দা ভিঞ্চি। ফরাসী বৈজ্ঞানিক দে-গামা, ইংলন্ডের জর্জ ক্যালে, পার্সি পিলচার প্রভৃতি। মহাসাধক ফরাসী বৈজ্ঞানিক লিলিয়াঁথাল তো এই প্রচেষ্টায় প্রাণই দিলেন। মূর্খের মতো নয়, আদর্শ বিজ্ঞানসাধকের মতো। কারণ তাঁর আমলে বোঝা গিয়েছিল এভাবে হাতে কৃত্রিম-ডানা লাগিয়ে আকাশজয় সম্ভবপর নয়। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তা করতে হবে।

ইংলন্ডের বৈজ্ঞানিক পার্সি পিলচার তখন একটা আকাশযান বানাবার চেষ্টা করছেন। তিনি ফ্রান্সে এলেন লিলিয়াঁথাল-এর সঙ্গে দেখা করতে। সসঙ্কোচে বললেন, আপনার পরীক্ষার ফলাফলগুলি একবার দেখতে পারি ?

লিলিয়াঁথাল হেসে বলেছিলেন, আপনি ভুল করছেন, মঁসিও। 'এয়ারোপ্লেন আবিষ্কারক'-এর খেতাব পাওয়ার লোভে আমি ক্রমাগত ঝাঁপ খাচ্ছি না। আমি সেই আবিষ্কারের পথটা পরিষ্কার করবার ব্রত নিয়েই কাজ করছি। আপনার সঙ্কোচের কোন কারণ নেই মিঃ পিলচার। আমার সমস্ত পরীক্ষার ফলাফল তো আপনাদের জন্যই।

নিরভিমান বৈজ্ঞানিকের এ-কথা শুনে পিলচার অভিভূত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, কী আশ্চর্য ! এত বড় প্রতিভা নিয়ে আপনি এয়ারোপ্লেন আবিষ্কারের চেষ্টাই করছেন না ? আপনি কি বোঝেন না—আপনার এ পরীক্ষার দাম দুনিয়া কোনদিনই দেবে না—আর এয়ারোপ্লেন আবিষ্কারককে গোটা দুনিয়া মাথায় তুলে নাচবে ?

লিলিয়াঁথাল এবারও হেসে বলেছিলেন, জানি বন্ধু! কিন্তু আপনি কি জানেন যে, সারা দুনিয়ার মানুষ যে আবিষ্কারকের উদ্দেশ্যে মাথার টুপি খুলবে, সেই লোকটিই আবার তার মাথার টুপি খুলবে আমার উদ্দেশ্যে?

তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। আপনি-আমি লিলিয়াঁথালের নাম হয়তো জীবনে প্রথম শুনছি—'এয়ারোপ্লেন আবিষ্কারক' তাঁকে কোনদিনই ভোলেননি।

1896 খ্রীষ্টাব্দে—মানুষের আকাশজয়ের মাত্র সাত বছর আগে এমনি এক ঝাঁপ দিতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করলেন লিলিয়াঁথাল। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হয়নি, হয়েছিল তার পর দিন, হাসপাতালে। তাঁর শেষ কথা ছিল, তা কিছু লোককে তো মরতে হবেই! দাম না দিলে কি কিছু পাওয়া যায়?

গল্পটা আমার শেষ হয়নি। ঐ ঘটনার আট বছর পরে আকাশজয়ী রাইট-ব্রাদার্স এলেন পারীতে। জাহাজঘাটা থেকে শোভাযাত্রা করে তাঁদের হোটেলে নিয়ে যাবার আয়োজন হয়েছিল। কিন্তু বাধা দিলেন অরভিল আর উইলবার। যাঁরা ওদের জাহাজঘাটায় সম্বর্ধনা জানাতে এসেছিল তাঁদের বললেন, না। আমরা জাহাজঘাটা থেকে ধুলোপায়ে সরাসরি যাব সেই সিমেটরিতে, যেখানে শহীদ লিলিয়াঁথালের কবর আছে।

এসব কথা পূর্ব-প্রকাশিত-গ্রন্থ 'হে হংসবলাকা'য় বিস্তারিত বলেছি। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখন শুধু বলতে চাই মানুষ দ্বিধারায় আকাশজয় করতে চেয়েছিল—একদল উপর থেকে ঝাঁপ খেয়ে পড়ে, দ্বিতীয়দল যান্ত্রিক পদ্ধতিতে।

দ্বিতীয় এই দলের প্রতিযোগীরা হচ্ছেন ইংলন্ডের পার্সি পিলচার, ফ্রান্সের স্যামুয়েল পিয়ারপন্ট ল্যাংলে আর মার্কিন ভ্রাতৃদ্বয়—উইলবার আর অরভিল রাইট।

তাঁরা চাইছিলেন দ্রুত, আরও দ্রুত মাটিতে ছুটতে—দুই ডানা মেলে—ভেবেছিলেন, ক্রমে গতি এত বেশি হবে যে, ডানায় 'হাওয়া ধরে যাবে'। যন্ত্রসমেত মানুষ আকাশে উঠে যাবে! তাই গিয়েছিল, 1903 সালে।

জুরাসিক আর ক্রিটেশাস যুগের ডাইনোসর ঠিক ঐ দুই বিকল্প পথেই আকাশজয় করতে চাইছিল যেন।

ডাইনোসরদের পক্ষে সাফল্য এসেছিল বিপরীত পথে। মানুষ ঝাঁপ খেয়ে আকাশজয় করতে পারেনি, দ্রুতগতি দৌড়ে তা করেছিল। ডাইনোসর দ্রুতগতি দৌড়ে আকাশজয় করতে পারেনি, পেরেছিল গাছের ডাল থেকে ঝাঁপ খেয়ে পড়ে।

প্রথম দলের বিবর্তন ইতিহাস শুরু করা যেতে পারে ট্রায়াসিক যুগের আদি পর্ব থেকে। ধরুন বিশ-বাইশ কোটি বছর আগেকার কথা। থেকডন্টিয়া বর্গের একটি জীব সিলোফাইসিস (Coclophysis) পিছনের দু-পায়ে দাঁড়িয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। না, ইগুয়ানোডন, আল্লোসরাস্ বা টিরানোসরাস-এর মতো লেজে ভর দিয়ে কোনক্রমে খাড়া হওয়া নয়। তারা দু-পায়ে দ্রুতগতিতে চলতে পারছে, দৌড়তে পারছে। তাছাড়া ঐসব দ্বিপদী ডাইনোসরদের সামনের হাতজোড়া ছিল নিতান্ত ফালতু। টিরানোসরাস রেক্স তো তার হাত দিয়ে খাবার মুখে তুলতেও পারত না—হাত দুটি ছিল এতই ছোট।

এরা—থেকডন্ট, সিলোফাইসিস প্রভৃতি যখন পিছনের দু-পায়ে দেহভার রক্ষা করত

তখন লেজ দিয়ে দেহকে তে-পায়া বানাতো না। গতির মাধ্যমে ভারসাম্য রক্ষা করত। যেন ট্রাইসাইকেল ছেড়ে বাইসাইকেল চড়া শেখা।

পরের যুগ। ক্রিটেশাস পিরিয়ড। ধরুন বারো থেকে পনের কোটি বছর আগে। ঐ সময়কালের ভূস্তরে পাওয়া যাচ্ছে ডিনোনিচাস (Deinonychus)-এর জীবাশ্ম। এরা চতুষ্পদ-ভঙ্গিতে হাঁটাতেই পারত না। তার হাত দুটি দীর্ঘ, 'স্ক্যাপুলা' বা 'ক্লাভিকিল' অস্থি নেই বটে,

ডিনোনিচাস

কিন্তু হাত বেশ শক্তিশালী, টিরানোসরাসের মতো শোভাবর্ধনকারীমাত্র নয়। দু-পায়ে খুব জোরে ছুটতে পারত। পিছনের পায়ে তিনটি করে আঙুল। তার একটাতে অতি তীক্ষ্ণ নখ। সেটা ওর যুদ্ধাস্ত্র। বাঘ বা বেড়ালের মতো নখটা সে থাবার মধ্যে টেনে নিতে পারত। এরা হয়তো মানুষের মতো এক পায়ে দেহভার রক্ষা করে দ্বিতীয় পায়ে পদাঘাতও করতে পারত। সেভাবে লড়তে হলে চক্ষু ও চরণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সমঝোতার প্রয়োজন। শীতল রক্তের প্রাণীর পক্ষে এতটা ক্ষিপ্রগতি এবং বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন। অনেকে তাই অনুমান করেন ডিনোনিচাস ছিল উষ্ণরক্তের প্রাণী। ছবিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয় ওর লেজের ভঙ্গিমা। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছুটতে পারলেই লেজকে ওভাবে জমির সমান্তরালে রাখা সম্ভব। সৌরিশিয়া বর্গে আরও কিছু দৌড়বাজ মাংসাশী ডাইনোসর আবির্ভূত হয়েছিল প্রায় সমকালে। আকারে ছোট, কিন্তু পাখির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য তার দেহে দেখা দিয়েছে। যেমন অর্নিথোলেস্টেস (Ornitholestes)। দৈর্ঘ্যে দু-মিটারের কম। অথবা অর্নিথোমিমাস্। গ্রীক ভাষায় তার মানে 'প্রায়-পাখি'। এদের পায়ের আঙুল ও নখ পাখির মতো।

মেজোজোয়িক কল্পের শেষাশেষি, ধরুন সাত-আট কোটি বছর পূর্বে, আবির্ভূত হয়েছিল 'স্টুথিঅমিমাস'। প্রায় এক মিটার দৈর্ঘ্যের। এ কথাটার মানে 'প্রায়-উটপাখি'। এদের দাঁত ছিল না। খাদ্য ছিল ডাইনোসরদের ডিম। এদের শ্রোণি-অস্থি বা pelvis পাখির মতো নয় কিন্তু। প্রসঙ্গত বলি, আপাত—অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটা ঘটনা : যেসব ডাইনোসরের পক্ষিপ্রতিম পেলভিস ছিল না তাদের শাখাতেই পাখিরা

স্টুথিঅমিমাস

আবির্ভূত হয়েছিল, আর যাদের পেলভিস ছিল পক্ষিধর্মী তাদের ধারায় পাখিরা বিবর্তিত হয়নি ("Paradoxically, dinosaurs without bird-like hips gave rise to birds. While those with such pelvis did not."–Paul Moody)

না, রাইট-ব্রাদার্সের মতো জোরে, আরও জোরে, ছুটতে ছুটতে এরা বাতাসে ভাসতে পারেনি। তবে কে জানে হয়তো এই ধারা থেকেই কালে আবির্ভূত হয়েছিল উড্ডয়নক্ষমতাহীন বর্তমান কালের দৌড়বাজ পাখিরা : অস্ট্রিচ, রুয়া, এমু, ক্যাসূয়ারি প্রভৃতি। এ-কথা কোন জীববিজ্ঞানী জোর দিয়ে বলেননি বটে, কিন্তু এ সম্ভাবনাকে তাঁরা উড়িয়েও দিতে পারেননি। কারণ এ দিকে আরও যুক্তি, আরও উদাহরণ আছে :

ধরুন, বর্তমান কল্পের প্রথম দিকে অবলুপ্ত প্রাণী ডায়াট্রিমা এবং হেসপার্নিস্। এরা আর ডাইনোসর নয়, সরীসৃপ নয়। পক্ষিকুলের বর্গভুক্ত। প্রথমটির ডানা ছিল না, কিন্তু গায়ে পালক ছিল। উচ্চতায় দুই মিটার। পিছনের পায়ে প্রচণ্ড শক্তি, খুব জোরে দৌড়তে পারে। এদিকে—ঠোঁট মস্ত বড় আর টিয়াপাখির মতো শক্ত। উত্তর আমেরিকায় এদের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। ডায়াট্রিমা নিজে অবলুপ্ত হলেও তারই উত্তরসাধক গ্রুইফর্মেস বর্গের এবং কারিয়ামিডি গোত্রের একটি পাখি Seriemas—দক্ষিণ আমেরিকায় আজও টিকে আছে।

হেসপেরোর্নিসও (Hesperornis) অবলুপ্ত হয়েছে বর্তমান কল্পের প্রথম দিকে, ছয়-সাত কোটি বছর আগে। এদেরও পালক ছিল, ডানা ছিল না। বস্তুত সামনের হাতজোড়ার কোন আভাসই ছিল না। অথচ পায়ের আঙুল হাঁসের মতো জোড়া দেওয়া। দুর্দান্ত সাঁতার কাটতে পারত এরা। পানকৌড়ির মতো তাড়া করে মাছ ধরে খেত।

মাত্র কয়েক শ বছর আগে অবলুপ্ত হয়েছে আরও দুটি পক্ষবিহীন বৃহদায়তন পাখি : হাতি-পাখি (elephant bird) এবং মোয়া (moa)।

বরং সাফল্যলাভ করেছিল সেই জাতের ডাইনোসর যারা হাতজোড়ায় পালক বানিয়ে গাছ থেকে ঝাঁপ খাবার চেষ্টা ক্রমাগত চালিয়ে গেল। মেজোজোয়িক কল্পের প্রো-আভিস বা প্রোটো-আভিস্ একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাদের দুই হাতে পালক গজিয়েছে কিন্তু লেজে গজায়নি। পাখির পালক যে সরীসৃপের শল্কের বিবর্তন তা বেশ বোঝা যায় প্রো-আভিসদের কথা চিন্তা করলে। কারণ ওদের দেহে—লেজের দিকে পালক আছ, হাতার আস্তিনেও পালক আছে ; কিন্তু তারা আর্কিয়প্টেরিক্স-এর মতো নিশ্চয় উড়তে পারত না। বড়জোর লেঅনার্দো বা লিলিয়াঁথালের মতো হাতডানায় ভর দিয়ে ঝাঁপ খেত। এই প্রো-আভিস বা প্রোটো-আভিস

প্রো-আভিস

আবিষ্কৃত হয়েছে অতি সম্প্রতি—বস্তুত 1986 সালে। আবিষ্কারক একজন বাঙালী। শ্রীশঙ্কর চ্যাটার্জি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস-অঞ্চলে তিনি প্রো-অ্যাভিস-এর জীবাশ্ম আবিষ্কার করে 'প্রাগার্কিয়প্টরিক্স' প্রায়-পাখিদের স্বরূপ উদঘাটন করেছেন। প্রো-আভিস-এর জীবাশ্মটির বয়স সাড়ে-বাইশ কোটি বছর। আর্কিয়প্টরিক্স-এর জীবাশ্ম চৌদ্দ-পনের কোটি বছর আগেকার, ফলে প্রো-আভিস আর্কিয়প্টরিক্স-এর পূর্বসূরী।

অমেরুদণ্ডী পতঙ্গের অনুকরণে বিশ-ত্রিশ কোটি বছর ধরে মেরুদণ্ডী বিভাগের নানান শ্রেণীর জীব—উভচর, সরীসৃপ, পাখি তো বটেই এবং স্তন্যপায়ীরা আকাশচারী হবার প্রচেষ্টা করেছে। বিশ্ব-বিধাত্রীর চিরবিস্ময় মানুষ তো চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ তারা ছাড়িয়ে "ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া, খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া" মহাকাশজয়ের স্বপ্নও দেখেছে। এ কাহিনীর কোথায় শেষ কে জানে। শুধু বলতে পারি :

হেথা নয়, অন্য কোথা, আর কোনখানে।
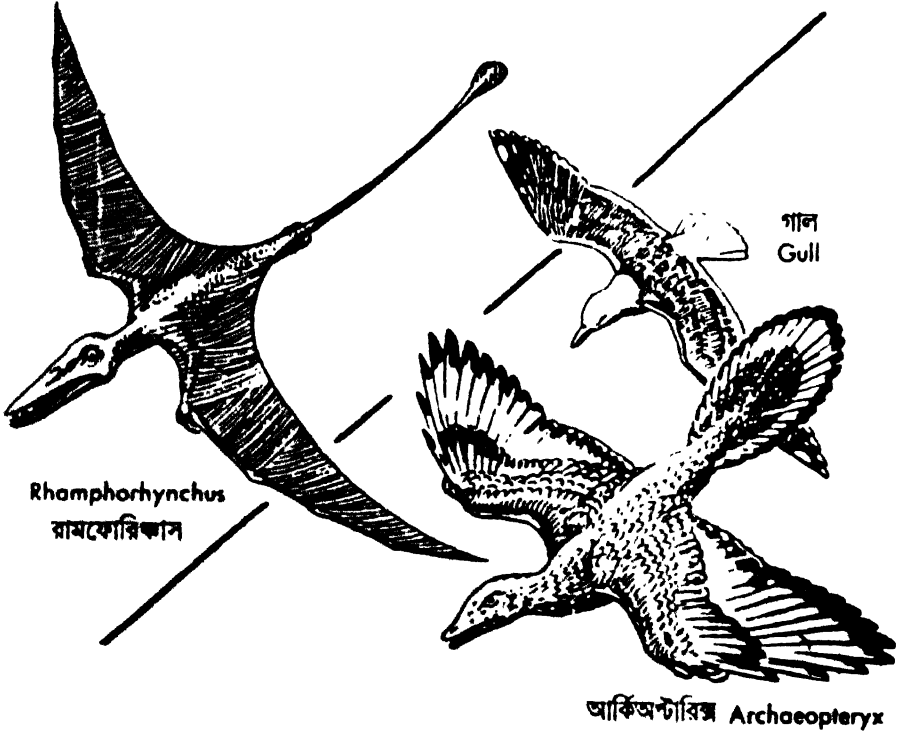
সর্বাণী ঘোষাল ও বঙ্গ-সরস্বতী

শ্রীমতী সর্বাণী ঘোষালের সব যন্ত্রণার অবসান হল বিশে জুন, এ বছর। ঠিক বিশ তারিখ কি না তাও বলতে পারব না। কারণ যে-হাসপাতালে তিনি যন্ত্রণাদায়ক ক্যান্সার রোগের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে চিরপ্রশান্তির দেশে প্রয়াত হলেন সেটা মার্কিন-মুলুকে, প্রশান্ত মহাসাগরের পারে। শহর কলকাতার প্রায় একশ আশি ডিগ্রি ফারাকে।

সর্বাণীর রচিত কোন বাঙলা বই প্রকাশিত হয়েছে বলে শুনিনি। তাঁর লেখা কোন প্রবন্ধ, ছোটগল্প বা কবিতা যদি কোন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকে তবে তা আমার নজর এড়িয়েছে। তাঁর প্রয়াণের পর দেরাজ বা আলমারি ঘেঁটে কোনও রচনার পাণ্ডুলিপি তাঁর কন্যা শর্মিলা খুঁজে পেয়েছে কিনা তাও আমি জানি না। শুধু এটুকু জানি যে, সর্বাণী ছিলেন বঙ্গ-সরস্বতীর একজন একনিষ্ঠ সেবিকা। তাঁর প্রয়াণে সেদিন স্বয়ং বাগ্‌দেবীর চোখ দুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। কেন, তাই বলি।

সর্বাণী কোনও বই লেখেননি বটে, কিন্তু একটি বাঙলা কবিতার বইয়ে ভূমিকা বা পরিচিতি-পত্র রচনা করেছেন। সে বইটির লেখিকা সর্বাণীর জননী, শ্রীমতী জ্যোৎস্নারাণী মল্লিক। বইটির নাম : *"মঞ্জরী-গাঁথা মালা"*। জ্যোৎস্নারাণীর প্রয়াণের ঠিক চল্লিশ বছর পরে মায়ের কিছু অপ্রকাশিত কবিতাগুচ্ছ একত্র করে সর্বাণী তা প্রকাশ করেন। আমাকে এক কপি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। তাঁর জীবদ্দশায় বইটি আমি পাইনি। তাঁকে প্রাপ্তিস্বীকারও করতে পারিনি তাই।

সর্বাণী ঘোষালের সারস্বত-সাধনার কথা আলোচনা করতে হলে তাঁর মায়ের ঐ ছত্রিশ পৃষ্ঠার কবিতার বইটির আলোচনা করা দরকার। মায়ের পরিচয়েই তো মেয়ের পরিচয়।

সর্বাণীর মাতৃদেবী জ্যোৎস্নারাণীর জন্ম উনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রহরে, বলা যায়, 'শতবর্ষ আগে'। রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর সামনে ব্রাহ্মগুরু কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ির পাশেই বিখ্যাত সোম-পরিবারের সাবেক বাড়ি। সেই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জ্যোৎস্নারাণী। যথারীতি ন-বছর বয়সে গৌরীদান : বালিকাবধূ চলে এলেন বৌবাজারের শ্রীনাথ দাস লেনের মল্লিক বাড়িতে। প্রকাশচন্দ্র মল্লিকের কনিষ্ঠপুত্র প্রফুল্লচন্দ্রের ঘরণী হয়ে। বিয়ের আগে জ্যোৎস্নারাণী যে কোন স্কুলে পড়েননি একথা বলাই বাহুল্য। তবে অক্ষর-পরিচয় হয়েছিল তাঁর। অল্পস্বল্প বাংলা, কিছু সংস্কৃত স্তবস্তোত্র শিখেছিলেন বালিকা বয়সে। কিন্তু মল্লিক বাড়িতে এসে তিনি পড়লেন এক আশ্চর্য মহিলার খপ্পরে। স্বর্ণময়ী দেবী ! জ্যোৎস্নারাণীর শাশুড়ী, অর্থাৎ সর্বাণীর

ঠাকুরমা। তাঁর ছিল বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। তিনি যেন সমকালের এক ব্যতিক্রম। তাঁর বাবা শ্রীনাথ দাস ছিলেন বিদ্বান, কিন্তু রক্ষণশীল আইনজীবী। বিদ্যাসাগর মশায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি দুই পুত্রকেই ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন—একজন বিধবাবিবাহ করায়, দ্বিতীয়জন কালাপানি পার হয়ে সারস্বত-সাধনায় ব্রতী হওয়ায়। সেই শ্রীনাথ দাস মশায়ের কন্যা হওয়া সত্ত্বেও স্বর্ণময়ীর মধ্যে আত্মগোপন করে ছিল এক মুক্তিকামী বিদ্রোহী মানস। স্বর্ণময়ী বিবাহের পর সরলা দেবীর 'সখী-সমিতি'র সক্রিয় সদস্যা হয়েছিলেন। কৃষ্ণভামিনী দাসীর 'অন্তঃপুরচারিণী বিদ্যালয়ের' একজন বিশিষ্টা কর্মী ছিলেন তিনি। পুত্রের উৎসাহে শুধু বাংলা, সংস্কৃতই নয়, প্যারীচরণ সরকারের ফার্স্টবুক পর্যন্ত পড়া শেষ করেছিলেন। সে আমলে কলকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালীমানস দ্বিধাবিভক্ত। একদল পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার উদারনীতিতে বিশেষভাবে প্রভাবিত—রামমোহন, ডিরোজিও, রামগোপাল, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরী প্রগতিশীল বাঙালী, তারই একটি ধারায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অধ্যাত্মচিন্তা। দ্বিতীয় ধারায় হিন্দু সমাজপতি কিছু রক্ষণশীল গোঁড়া প্রভাবশালী। এই টানা-পোড়েনে স্বর্ণময়ী মল্লিকবাড়ির রুদ্ধশ্বাস পরিবেশ থেকে বোধ করি কোনদিনই মুক্তি পাননি। নষ্টনীড়ের চারুলতার মতো জানলার খড়খড়ি তুলে দেখেছেন বাইরের সেই রৌদ্রকরোজ্জ্বল কলকাতা শহরকে, তার ঘোড়ায়-টানা ট্রাম, ভিস্তিতে-ধোওয়া খোয়া-বাঁধানো রাস্তা, বিচিত্র ফেরিওয়ালার কলরবমুখরিত ব্যস্ততাকে।

কনিষ্ঠপুত্র যখন নবমবর্ষীয়া বালিকা-বধূকে ঘরে নিয়ে এল, তখন স্বর্ণময়ী মুক্তির এক তির্যক পথের সন্ধান পেলেন। পুত্রবধূর মধ্যেই নিজেকে প্রক্ষিপ্ত করতে চাইলেন। তিনি জ্যোৎস্নারাণীকে লেখাপড়া শেখানোর আয়োজন করলেন। গান শেখার তালিম দিতে পাঠালেন ঠাকুরবাড়ির প্রেমলতা দেবীর কাছে। এসব নিয়ে তুমুল কোলাহল হয়েছিল আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে ; কিন্তু স্বর্ণময়ী ভ্রূক্ষেপ করেননি। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতিসম্পন্না এক শাশুড়ীর জাদুস্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠলেন বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদে এক বালিকা বধূ : জ্যোৎস্নারাণী। তিনি ছিলেন বহুসন্তানের জননী। সারাজীবনই ব্যস্ত ছিলেন ঘর-সংসার সামলাতে। তার মধ্যেই এসেছে পুত্রকন্যার অকালপ্রয়াণের বিয়োগব্যথা, শিক্ষিতা হওয়ার অপরাধে আত্মীয়স্বজনের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, আঘাত। শেষজীবনে আর্থিক অনটনেও পীড়িতা হয়েছেন জ্যোৎস্নারাণী। কিন্তু তবু একটি-একটি করে কবিতা লিখে দেরাজে রেখে গিয়েছিলেন তিনি। 'দিনযাপনের, প্রাণধারণের গ্লানির' মধ্যে তাঁর কবিসত্তা ছিল নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো অতন্দ্র সাধনারত।

তাঁর কবিতাগুলি নানান জাতের। অধিকাংশই ভক্তিমূলক। সব কবিতাতেই আছে অন্ত্যমিল। কবি-পরিচিতিতে মায়ের কাব্যপ্রতিভার বিচার করতে সর্বাণী লিখেছেন :

"বাংলা কবিতা এখন বিষয়ে ও আঙ্গিকে রবীন্দ্রকাব্যের বাতায়ন পার হয়ে অনেক দূরে সরে এসেছে। ছন্দপ্রকরণে ও শব্দচয়নে কোন কোন আধুনিক কবির কত প্রশংসনীয় সযত্ন অনুশীলন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখতে পাই। মায়ের কবিতায় হয়তো সাম্প্রতিককালের বিষয় ও আঙ্গিক চাতুর্য দেখতে পাওয়া যাবে না। তাঁর কবিতায় সে-কালের ছিরি-ছাঁদকেই লক্ষ্য করি। সাধারণভাবে ছন্দবন্ধ পয়ার বা ত্রিপদী। ছন্দরীতি প্রধানত অক্ষরবৃত্ত। অনেক জায়গায়

স্বরবৃত্তের ঢঙ। মনে রাখতে হবে তাঁর জন্মকালে রবীন্দ্রনাথের *মানসী* ও *সোনার তরীর পর্ব* চলছে। মায়ের কবিতার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল—অকপট আন্তরিকতা। সেই কালের প্রেক্ষাপটে, ঘরের আঙিনার সীমানায় তা সরল আন্তরিকতায় ফুটে উঠেছে। তবে রবীন্দ্রভাবনা থেকে পৃথক। কারণ ভক্তির স্বরূপ ও মূর্তি প্রতিমাকে কেন্দ্র করেই মায়ের কবিতা প্রধানত রচিত। বরঞ্চ মায়ের কবিতায় রজনীকান্তের সরল প্রকাশের ও আন্তরিকতার দূরাগত প্রতিধ্বনি যদি কেউ শোনেন তাহলে আশ্চর্য হব না। মাকে হারিয়েছি ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে। সংসারের মিশ্রিত সুখদুঃখ এবং ঝড়-ঝাপ্টায় জীবন কেটেছে। এসবের মধ্যে তাঁর কবিতাগুলির আন্তরিক আবেদন বহু সময়েই আমাদের জীবনে স্মৃতিসুখ ও সান্ত্বনা দিয়েছে। কোনো পাঠককে যদি সে আন্তরিকতা ছুঁতে পারে, তবেই তা সার্থক হল মনে করব।"

শ্রীমতী সর্বাণী ঘোষাল এই ভূমিকাটি লিখেছিলেন 1989-এর নভেম্বরে। অর্থাৎ মায়ের প্রয়াণের ঠিক চল্লিশ বছর পরে। ঘটনাচক্রে তাঁর নিজের প্রয়াণের প্রায় চল্লিশ সপ্তাহ পূর্বে।

কবি জ্যোৎস্নারাণী—ঠিকই বলেছেন সর্বাণী—অধিকাংশ কবিতার মাধ্যমে ইষ্টদেবতার কাছে আত্মনিবেদন করেছেন। প্রতিটি কবিতাই যেন এক-একটি শ্রদ্ধাবিনম্র প্রণতি! শুধু দু-একটি কবিতায় সাংসারিক জ্বালা-যন্ত্রণার প্রকাশ ফুটে উঠেছে। যেমন শেষজীবনে কবির অর্থকৃচ্ছ্রতার সময়ের শ্লেষ :

"টাকা টাকা টাকা।
ছোট্ট দুটি কথা কিন্তু অনেক ব্যাপার ঢাকা!
দেখছি আমি চেয়ে চেয়ে এই দুনিয়ার মাঝে
টাকার চেয়ে সেরা কিছুই পেলাম নাকো খুঁজে।
'ক'-অক্ষরে গো-মাংস গণ্ডমূর্খ যিনি
টাকার জোরে দেশের বুকে দশের মাথা তিনি।
সত্যপথের পথিক যিনি হৃদয়-ভরা প্রেম
ন্যায়ের শাসন দণ্ড হাতে বুদ্ধি উজল হেম ;
কিন্তু যখন নেইকো টাকা, মানুষ বলব কি?
লুকাও বাপু একটা পাশে, মুখ দেখাবে? ছিঃ!"

কাব্যগ্রন্থটিতে প্রকাশক সর্বাণী ঘোষালের ঠিকানা আছে, তেইশ হরিশ মুখার্জি রোড, (যদিও তিনি আজ দুই-তিন দশক সেখানে থাকেন না, আমেরিকা প্রবাসী) কিন্তু প্রাপ্তিস্থানের ঠিকানা অথবা বিক্রয়মূল্যটি কোথাও বলা হয়নি। বস্তুত সর্বাণী বইটি শুধু কাব্য-অনুরাগীদের মধ্যে বিলাতে চেয়েছিলেন, বেচতে নয়। এ তাঁর মাতৃতর্পণ!

আমার সঙ্গে সর্বাণীর আলাপ চুরাশি সালে। আমার বড় কন্যার বাড়িতে। সানফ্রান্সিস্কোর শহরতলী ওয়ালনাট ক্রীকে। সর্বাণী আমাকে আমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন—বার্কলেতে গিয়ে আমাকে একটি বক্তৃতা দিতে হবে।

শুনে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার দাখিল। 'বার্কলে'-র নাম নিশ্চয় শুনেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানিতে যেমন ছিল 'গ্যোটেনজেন', যুদ্ধোত্তর মার্কিন মুলুকে তেমনি বার্কলে। ক্যালিফোর্নিয়ায়। এ এক বিশ্ববিশ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়। অ্যাটম বোমার অন্যতম

আবিষ্কারক প্রফেসর ই. ও. লরেন্সের ল্যাবরেটরি ছিল এখানে। এই বার্কলে পাহাড়েই তিনি পয়দা করেছিলেন : 'ক্যালুট্রন' ! নাম শোনেননি তো ? আম্মো শুনিনি। তবে 'বিশ্বাসঘাতক' নামে একটা বই লিখতে গিয়ে জেনেছি সেটি নাকি অ্যাটমবোমার ষোলো-কলার ষোড়শ-কলা ! গত তিন-চার দশক ধরে এখানে অধ্যাপক মশাইদের মধ্যে নোবেল লরিয়েটদের সংখ্যা : গড়ে চার ! কখনো কমে তিন, কখনো বেড়ে পাঁচ। সেই বার্কলেতে গিয়ে বক্তিমে দিতে হবে শুনলে প্লীহা-কম্পন হতেই পারে।

সর্বাণী আমাকে আশ্বস্ত করতে বললেন, আমার বক্তিমে শুনতে কোন নোবেল-লরিয়েট আসার সম্ভাবনা নেই। অডিটোরিয়ামে যাঁরা উপস্থিত থাকবেন তাঁদের বয়স : গড়ে দশ। কখনো কমে পাঁচ, কখনো বেড়ে পনের।

কী ব্যাপার ? শোনা গেল সবাই সানফ্রান্সিস্কো বে-এরিয়ার 'প্রবাসী বাংলা স্কুল'-এর ছাত্রছাত্রী।

সে সময় স্কুলের বয়স ছিল দশ। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা তখন উনিশ। স্কুলে দুটি বিভাগ। জুনিয়ার বিভাগে বিদ্যার্থীদের বয়স পাঁচ থেকে নয়। তাদের বাঙলা অক্ষর পরিচয় হয়েছে। 'পুঙ্খানুপুঙ্খ' অথবা 'প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব' প্রভৃতি শব্দের বানান জানতে চাইলে 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। তবে ধীরে ধীরে বাংলা বই পড়তে পারে। সিনিয়ার বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীর বয়স দশ থেকে পনের। সে ক্লাসের মনিটার সর্বাণীর কন্যা শর্মিলা ঘোষাল। বাঙলায় তার বেশ ভাল দখল। জ্যোৎস্নারাণীর উপযুক্ত নাতনি। এমনকি বলা যায়, স্বর্ণময়ীর উপযুক্ত 'প্র-নাতনি'।

আদিযুগে ক্লাস নেওয়া হত বিভিন্ন গার্জেনদের বাড়িতে। পর্যায়ক্রমে। কিন্তু সেটা মূলগায়েন সর্বাণীদির মনঃপূত হয়নি। ওঁর অসুবিধা হল এই যে, যাঁর বাড়িতে ক্লাসটা বসছে তিনি খানা-পিনার ব্যাপারটাকেই বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করলেন।

পরবর্তী যুগে তাই ক্লাস নেওয়া হত সেন্ট আলবান্স চার্চে। রোব্বার দুপুরে। 'মাস'-এর পরে। কিন্তু তাতেও জুৎ হল না। বিদেশের চার্চে সাবাথ-ডে তে সবাই সমবেত হয়ে 'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে' বলে হরহপ্তা চেল্লাচেল্লি করাটা সৌজন্যে বাধে।

কিন্তু সর্বাণী ঘোষাল না-ছোড়বান্দা। প্রবাসী বাঙালী ছেলেমেয়েদের তিনি বাংলা ভাষাটা না শিখিয়ে ছাড়বেন না। তাই ধরে পড়লেন ঐ বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন এক বড়কর্তাকে।

ব্যবস্থা হল। বার্কলের সেই বড়কর্তা সর্বাণীকে বললেন, ও খে ' রোব্বারে ঘরগুলো তো ভেকেন্ট পড়েই থাকে। তোমরা কাপ্‌ল্ অব রুমস্ য়ুজ্ করতে পার। শেখাও তোমাদের কিড্‌সদের পোয়েট টেগোরের ঐ ল্যাঙ্গোয়েজ।

তারপর থেকে ঐ বার্কলেই হরহপ্তা রবিবার দুপুরে দুটি ঘরে বসে 'প্রবাসী বাংলা স্কুল'। বেলা দেড়টা থেকে তিনটা। বিশ-পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে পেট্রল, থুড়ি, গ্যাস পুড়িয়ে গোটা বে-এরিয়ার বাঙালী বাবা-মায়েরা বাচ্চাদের নিয়ে হাজিরা দেয়। বাচ্চা ঘরে ক্লাস করে, বাবা-মা গাছতলায় করে গুলতানি। সবাই নয়, পালা করে একজনকে ('মোস্টলি মম্‌স্ ! ক্যজ ড্যাড্‌স্ য়ুজুয়ালি হ্যাভ টু ক্লিন অ্যান্ড ভ্যাকুয়াম দ্য হাউস, য়ুনো'—আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল একটি ছাত্রী) বছরে একমাস ক্লাস নিতে হয়। এটাই, সর্বাণী ঘোষালের মতে, 'স্কুল ফী' !

কারণ স্কুল অন্যদিক থেকে অবৈতনিক। বইপত্র খাতা ইত্যাদিও যোগান দেন সর্বাণীদি, বাচ্চার বাপ-মা ভুলে গেলে। ঐ পালা করে যিনি ক্লাস নেন তাঁকে নিতে হয় নিচের ক্লাসটা, কারণ 'স্বগৃহে আহারান্তে বন্যমহিষ বিতাড়ন ব্রত'য় দীক্ষিতা শ্রীমতী সর্বাণী ঘোষাল বিগত দশবৎসর যাবৎ বছরে বাহান্নবার সিনিয়ার ক্লাসটি নিতে এক পায়ে খাড়া।

যদিও অধিকাংশের বাবা-মা দুজনেই বাঙালী তবু বাচ্চারা যখন নিজ নিজ স্কুলে উঁচু ক্লাসে ওঠে তখন সেকেন্ড ল্যাঙ্গোয়েজ হিসাবে বেছে নেয়—ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ বা জার্মান। বাংলা ভাষা ওরা শোনেই বা কতটুকু? মাতৃভাষা তো মায়ের জাত-নির্ভর নয়, মায়ের জিহ্বা-নির্ভর! জ্ঞান হবার পর অধিকাংশ বাচ্চাই শোনে বাবা মাকে ডাকে : হানি। মা সে ডাকে সাড়া দেয় : হাঈ। ক্রিব্ অথবা বেবিকটে শুয়ে শুয়ে দুধের বাচ্চারা শুনতে পায় পাশের ঘরে ড্যাড-মম ধুন্ধুমার দাম্পত্যকলহ চালিয়ে যাচ্ছে—বিশুদ্ধ ইঞ্জিরিতে! আমার নাতনি অন্তরা রাতে ঘুমাতো আমার সঙ্গে—ঘুমের মধ্যে সে যে বক্তিমে ঝাড়তো তা মার্কিনী উচ্চারণে ইস্পেকের্ ইংলিশ। মানে, যে বয়সে ওর ভেতো-বাঙালী দাদু ইংরেজি শেখার স্বপ্ন দেখতো, সেই পাঁচবছর বয়সে ও ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখে। বাংলা সে বলতে পারে, জুৎ পায় না। ও একা নয়, ওর বয়সী যতগুলি প্রবাসী বাঙালী বাচ্চাকে দেখেছি সবারই ঐ হাল। সর্বত্র। লন্ডন, পারী, নিউইয়র্ক, লস্এঞ্জেলেস—যেখানেই প্রবাসী বাঙালী বাচ্চাদের দেখেছি— সর্বত্রই দেখেছি একমুঠো হীরের টুক্রো ছেলেমেয়েকে তাদের মধ্য-যৌবনে। দু-তিন দশক আগে তারা প্রেসিডেন্সি বা লেডি ব্রেবোর্নে, শিবপুরে, কিংবা যাদবপুরে ক্লাসে ফার্স্ট-সেকেন্ড হত। এখন বাবা হয়েছে, মা হয়েছে।

ঐ খোয়া-যাওয়া হীরের টুকরোগুলোকে ফিরিয়ে এনে আবার যে গলার মালায় গাঁথবে এমন ক্ষমতা নেই দীনদুখিনী ভারত মায়ের। অক্ষমতাটা শুধু আর্থিক নয়, মর্মান্তিকভাবে মানসিকতারও। মা-হাঁ দু-তরফেই। অনেকের নাগরিকত্ব ঘুচেছে। হয় খোয়া গেছে, নয় 'খোরানা' হয়ে গেছে। কিংবা দিওয়ানা। অনেকে এখনো নামমাত্র ভারতীয়, অর্থাৎ বাঙালী। তবু ওরা কায়মনে প্রার্থনা করে ওদের খোকাখুকুর নাকের ডগায় সেই অবাক দরওয়াজাটা যেন বন্ধ না হয়ে যায়—যে দরজার চিচিং-ফাঁকে উঁকি দিলে ওরা আজও দেখতে পায় থরে থরে সাজানো আছে নানান হীরে-জহরৎ মণিমুক্তো : মাটির পিদিম, তুলসীর মঞ্চ, ধানসিঁড়ি ক্ষেত, ঘুঘুর ডাক, শিশিরভেজা ঝরা শিউলি অথবা ঝড়ে-ঝরা ফোটা কদম! যার জন্যে পাঁজরের খাঁজে খাঁজে বাজে নস্ট্যালজিক বেহাগের মূর্ছনা। সেই গানের ওপারেই যে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন : বীরভূমী বাউল, বিদ্রোহী ভৃগু, অপু-দুর্গার পুরুত-বাবা অথবা হাজার বছর ধরে পথ-চলা কোনও ক্লান্ত পথিক!

এ বেদনা বাচ্চাদের নয়। তাদের ড্যাড-মমের। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বিভূতি বাঁড়ুজ্জে বা জীবনানন্দের ছোঁয়া পাওয়ার লোভে ওরা বাঙলা শিখতে আসে না। আসে, ড্যাড-মমদের নির্দেশে। তাজা ড্যাফোডিলের মতো একটি বাচ্চা ছেলে—তার বাবা বাঙালী, মা মার্কিনী—আমাকে ফিস্ফিস্ করে জানিয়েছিল, কেন সে বাঙলা শিখতে আগ্রহী : মাই গ্যের্ল-ফ্রেন্ড ডাজন্ট ফলো ইংলিশ অ্যাট অল। বাট শী ল্যাভস্ মি হেড-ওভর হীলস্—ইফ য়ু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই মীন! আই ল্যের্ন বেঙ্গলী ওনলি ফর দ্যাট গ্যের্লস্ সেক, য়ুনো!

আমি ফিস্‌ফিস্‌ করে জানতে চেয়েছিলাম : ক্লাসের কোন মেয়েটা ?

জবাবে ধমক খেতে হয়েছিল : এরা তো সবাই ইংরেজি জানে। এখানকার কোনও মেয়ে নয়। সে থাকে বার্ডওয়ানে, নিয়ার ক্যালকাটা। মাই গ্র্যান্ডমম্‌!

সর্বাণীর সঙ্গে এ নিয়ে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। কেন তিনি সুদূর মার্কিন-মুলুকে ঐ 'প্রবাসী বাংলা স্কুল' নিয়ে এমন প্রাণপাত করছেন ? প্রাণপাত বই কী। কোন রবিবার ছুটি নেই। কাঁড়ি-কাঁড়ি ডলার ঘর থেকে খরচ করছেন। কলকাতা থেকে বাচ্চাদের জন্য বাঙলা বই আনাচ্ছেন। মেয়েকেও লাগিয়ে দিয়েছেন সেই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর কাজে।

ওঁর মতে বাংলা-মায়ের আঁচলের খুঁট খুলে ঐ যে একমুঠো জুঁই ফুল স্রোতে ভাসতে ভাসতে চলে গেছে অতলান্তিক বা প্রশান্তের ওপারে—শুধু এপার নয়, ওপার বাংলার ঝরা ফুলও, তাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য দুটি জিনিস দরকার :

ডানা আর শিকড়।

ওরা রামধনুর মতো আকাশে ফুটে উঠতে চায়, তাই প্রয়োজন একজোড়া ডানার। ওরা কালবৈশাখীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঁশঝাড়ের মতো লুটোপুটি খাবে, তবু ভেঙে পড়বে না—তাই চাই শিকড়টাও!

যে ঘাটে গিয়ে ঠেকেছে সেখানে ওরা সহজেই পেয়ে যাবে একজোড়া ডানা : Wings! পক্ষিরাজের বদলে স্পেস্‌-শাট্‌ল, উপেন্দ্র-দক্ষিণারঞ্জন-সুকুমার রায়ের পরিবর্তে হান্স অ্যান্ডারসন, গ্রীমস্‌ ভাইদের, লুইস ক্যারলকে। কঙ্কাবতীর পরিপূরক অ্যালিস, কুঁচবরণ রাজকন্যার বদলে স্নো-হোয়াইট, সিন্ডেরেলা।

কিন্তু : Roots ?

রামায়ণ-মহাভারত-ধ্রুব-নালক-একলব্য-মৈত্রেয়ী-সত্যকাম ?

সেটা বিদেশের সুপার-মার্কেটে পাওয়া যায় না!

সেটাই যোগান দেবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন স্বর্ণময়ীর নাতনি!

আমাকে তিনি বলেছিলেন, মেশোমশাই, এদের জন্য কেউ ভাবে না। এদের জন্য কেউ বই লেখে না। এরা ধোপা-নাপিত, গোগাড়ি-গঞ্জ, রাজকন্যা-রাজপুত্তুর, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী কিচ্ছু চেনে না। 'কুঁচবরণ রাজকন্যার মেঘবরণ চুল' শুনে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। জানতে চায় : Tell me, is she a blonde, brunette or a red-headed ? বাধা দুজাতের—ভাব আর ভাষা। এদের চেনা-জানা দুনিয়ার উপর একটা 'বর্ণপরিচয়' বা 'সহজ পাঠ' লিখতে পারেন ? যে বইতে অজগরের বদলে অক্টোপাস তেড়ে আসে, যে হাইওয়েতে একাগাড়ি ছোটে না, যে ডাইনিং টেবিলে ওল-এর কারি সার্ভ করা হয় না ?

আমি সলজ্জে আমার অক্ষমতার কথা জানিয়েছিলাম। ওটা পারব না। রিলেটিভিটি তত্ত্বের ব্যাখ্যা করে অথবা অ্যাটম-বোমার ফর্মূলা বুঝিয়ে বই লেখা সহজ কিন্তু 'বর্ণপরিচয়' বা 'সহজ পাঠ'-এর পরিপূরক বই কী করে লিখব ? অথচ সর্বাণীর যুক্তি অনস্বীকার্য। বিদেশে লাখ লাখ বাঙালী বাচ্চাকে বাংলা শেখাতে গেলে নতুন 'বর্ণপরিচয়', নতুন 'পেরথম ভাগ' লেখার প্রয়োজন। ওদের বোধগম্য ভাষায়। ঐসব হীরের টুকরো ছেলে-মেয়ে বাংলা ভাষা

না শিখলে ওদের ক্ষতি তো বটেই, আমাদেরও ক্ষতি। ওদের অধিকাংশই হয়তো বিদেশে থেকে যাবে, উপায় নেই। হয়তো ইংরেজি সাহিত্যে এমন বই লিখবে যাতে নোবেল প্রাইজ পাওয়া যায়, অথবা 'নোবেলোত্তর' পুরস্কারের যোগ্য বলে নোবেল প্রাইজটা পাবে না—যেমন ঘটেছিল একবার SAVITRI-র ক্ষেত্রে। কিন্তু আমরা তো সে জাতের নিখুঁত সাহেব চাই না।

আমরা চাই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসে লিখুক : *ভবানী মন্দির*। নেহাৎ যদি নাই ফেরে তবে ওদেশে বসেই লিখুক : *চিত্রগ্রীব*, *যূথপতি*...

শ্রীমতী সর্বাণীর অনুরোধে 'বর্ণপরিচয়' লিখবার হিম্মৎ আমার হয়নি। তবে ঐসব প্রবাসী বাঙালী বাচ্চাদের কথা ভেবে—যাদের সম্ভাবনার কথা জানা ছিল না দক্ষিণারঞ্জন থেকে সুকুমার রায়ের—একটা বই লিখে ফেলেছিলাম। যুক্তাক্ষর-বর্জিত শিশুপাঠ্য : *হাতি আর হাতি*। কয়েক কপি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আমার মেয়েকে। ওকে বিশেষ করে বলেছিলাম এক কপি বই সর্বাণীকে দিতে। নিশ্চয় সে তা দিয়েছিল, কিন্তু সর্বাণী তার প্রাপ্তি সংবাদ আমাকে দেননি। বইটি কেমন লেগেছে তা আমাকে জানাতে পারেননি, যেমন আমিও পারিনি তাঁকে জানাতে—তাঁর মায়ের লেখা বই আমার কেমন লেগেছে। আমরা কেউই সময় পাইনি। আমরা দুজনে প্রায় একই সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলাম। আমি অপারেশন করিয়ে ফিরে এলাম। সর্বাণী ফিরে এলেন না। সানফ্রান্সিস্কো বে-এরিয়ার যাবতীয় বাঙালীর ঘরে ঘরে নেমে এল শোকের ছায়া। কয়েক'শ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে প্রতিটি ঘরে প্রবাসী বাঙালী দম্পতি মা-কালীর কাছে প্রার্থনা জানালো : সর্বাণীদিকে ফিরিয়ে দাও। ওদের ফুটফুটে বাচ্চার দল প্রার্থনা জানালো—মা মেরীকে, কেয়ার-বেয়ারকে, কিংবা ফলিং স্টারকে : সর্বাণী মাসিকে ফিরিয়ে দাও। কেউ সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করেনি। না কেয়ার-বেয়ার, না উইশ-ফেয়ারি, না ফলিং-স্টার এবং হ্যাঁ,—না মা-কালী।

অনিন্দিতা, আমার মেয়ে, লিখেছিল : "মৃত্যুর সঙ্গে সর্বাণীদি কী ভাবে হাসিমুখে লড়াই করেছিলেন সে-সব কথা দেখা হলে বলব। ওঁর মেয়ে শর্মির কলেজে বোধহয় একটা বছর নষ্টই হবে শেষ পর্যন্ত। সর্বাণীদিকে দেখলে হৃষীকেশ মুখার্জির 'আনন্দ' ছবিটার কথা মনে পড়ে যায়।"

আমি সে সময়ে সর্বাণীর শিয়রে উপস্থিত হতে পারলে ওঁর মায়ের লেখা একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করে শোনাতাম হয়তো :

"যখন আমি পড়বো শুয়ে জীবন-রবির অস্তক্ষণে
ঘটের আসন ছেড়ে তুমি বসবে আমার গোপন মনে।
নামবে যখন আঁধার চোখে, শ্রান্ত আমি দৃষ্টিহারা
পটের মাঝে তোমার ছবি হেরবে না আর আঁখির তারা,
কর্ণ হবে বধির তখন শুনবে না আর মধুর নাম
অলস হয়ে চরণ দুটি চলবে না সে তীর্থধাম।
চরণ দুটি রাখবে শিরে চাইবে হেসে মুখের পানে
'সবার সেরা আপন তুমি'—সেই কথাটিই বলবে কানে।

মরণজয়ী হাসবো আমি, গর্ব আমার : তোমায় চিনে !
বাজবে আমার সুখের বাঁশী অনুরাগের পরশনে ॥

সর্বাণী চলে গেলেন। তাঁর প্রয়াণে শহর কলকাতায় বাংলা-ভাষা-প্রেমীরা কোন স্মরণসভার আয়োজন করারেন না—সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সানফ্রান্সিস্কো বে-এরিয়ার বাঙালীরা তা নিশ্চয় করবেন। সে স্মরণসভায় যেন ওঁরা প্রস্তাব নেন—পৃথিবীর অপরপ্রান্ত থেকে এটাই আমার অনুরোধ : সর্বাণীদির মহাপ্রয়াণকে আমরা বুঝতে পারিনি—তা ছিল আমাদের ক্ষমতার বাইরে, কিন্তু 'প্রবাসী বাঙালী স্কুল'কে আমরা মরতে দেব না।

একমাত্র সে প্রতিজ্ঞাপূরণের পথেই হতে পারে সমকালজয়ী স্বর্ণময়ীর নাতনির তথা মরণজয়ী হাস্যময়ী জ্যোৎস্নারাণীর কন্যার উপযুক্ত তর্পণ।
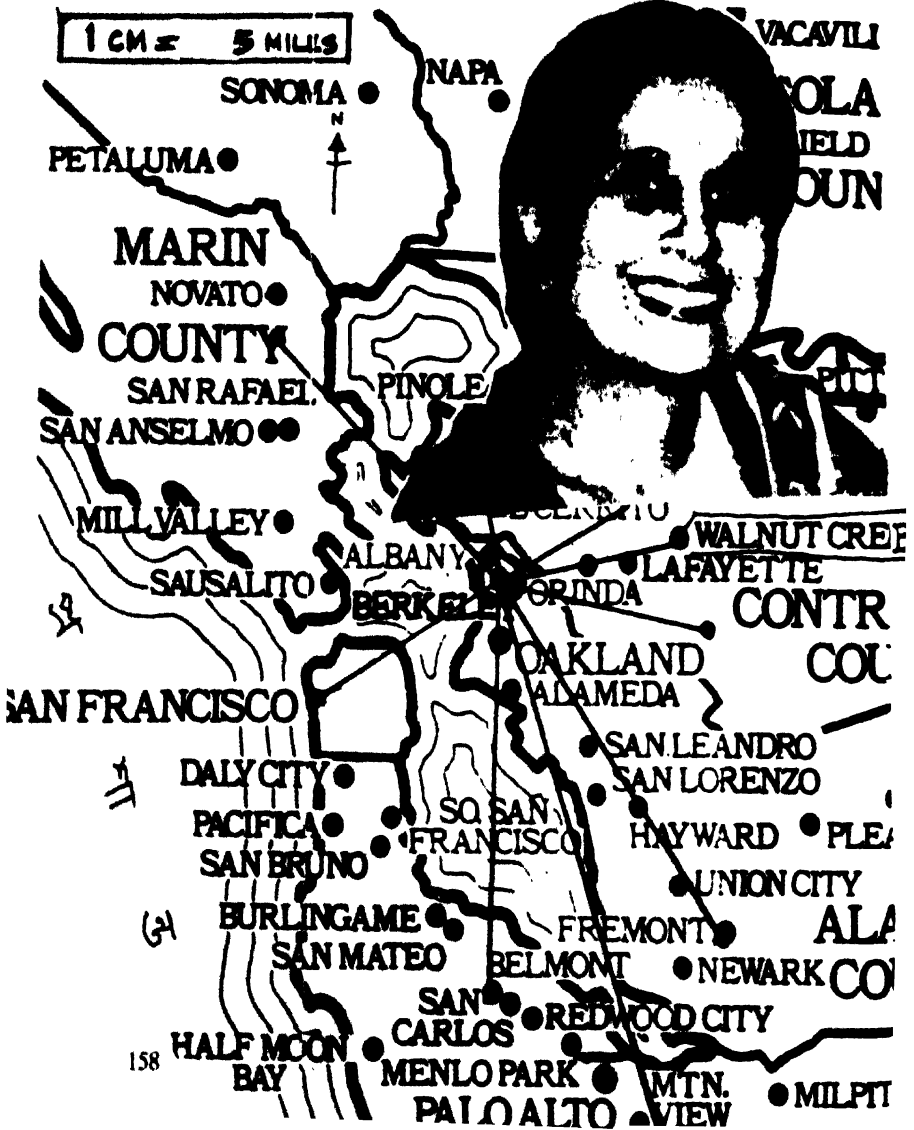
পরলোকতত্ত্ব
ও
বিজ্ঞান

সমানুপাতের ঐ বৈজ্ঞানিক হিসাবটার কথা আমিও জানি মশাই :

পরলোকতত্ত্ব ইজ টু বিজ্ঞান অ্যাজ পক্ক শ্রীফল ইজটু দণ্ডবায়স।

অর্থাৎ পরলোক আছে কি নেই এ নিয়ে বিজ্ঞানের কোনও মাথাব্যথা নেই। বিজ্ঞান যেখানে থামে সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে দর্শন ; আর দর্শন যেখানে থামে সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে ধর্ম। বিজ্ঞান প্রমাণ-নির্ভর, দর্শন যুক্তি-নির্ভর এবং ধর্মের কিছুটা উপলব্ধি কিছুটা বিশ্বাসনির্ভর। কিন্তু বিজ্ঞানের এক্তিয়ার যদি লক্ষ্মণের পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য গণ্ডীসীমার এপারে হয় তাহলে সে ঈথার থেকে 'ট্যাকায়ন'-এর কথা বলে কোন আক্কেলে ? আঁক কষতে গিয়ে ছোটহাতের 'আই' অর্থাৎ 'রুট-ওভার মাইনাস ওয়ান' এর কাছে হাত পাতে কোন্ লজ্জায় ? রাজশেখর বসু সাহিত্যিক হলেও ছিলেন বিজ্ঞানী। তাঁর সৃষ্টচরিত্র অঙ্কের অধ্যাপক মহেশচন্দ্র অঙ্ক কষেই প্রমাণ করেছিলেন, ঈশ্বর =0 ; আত্মা = ভূত =√0. কিন্তু অন্তিমে সেই অঙ্কশাস্ত্রের মহাপণ্ডিতকেও মেনে নিতে হয়েছিল : 'ও হরিনাথ, আছে, আছে, সব আছে, সব সত্যি !'

না, ভুল হল হিসাবে। ও ডিডাকশানটা রাজশেখরের তো নয়ই, এমন কি মহেশচন্দ্রেরও নয়, চাটুজ্জে মশায়ের।

ভূমিকা থাক। গল্প শোনাই। না গল্প নয়, সত্য ঘটনা। বিখ্যাত ব্যক্তির। বিজ্ঞানী নন তা বলে। যাদুকর : হুডিনি।

বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠায় তিনি জানতে চেয়েছিলেন,—বলা যায়, জীবনের বিনিময়ে জানতে চেয়েছিলেন ঐ যে-তত্ত্বটা মহেশচন্দ্র অঙ্ক কষে বার করতে চেয়েছিলেন : মৃত্যুর পরে আত্মা থাকে কি থাকে না।

জন্ম অ্যাপ্লটন-এ। আমেরিকায়। 1874 সালে। বাবার নাম স্যামুয়েল উইস, মা সিসিলা। ওঁরা পুত্রের নাম রেখেছিলেন এরিখ। হুডিনি ওঁর নিজের নেওয়া ছদ্মনাম। সিসিলা বলেন, শিশুকাল থেকে হুডিনি কখনো কাঁদেনি। কাঁদবার উপক্রম করলেই মা তাঁর শিশুকে বুকে চেপে ধরতেন। মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে, তাঁর বুকের স্পন্দন শুনতে পেলে হুডিনি নাকি কান্না ভুলে যেত। সে কথা কতটা বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন, কিন্তু হুডিনির জীবনীকারের মতে শিশুকাল থেকেই মায়ের প্রতি হুডিনির একটা বিচিত্র 'অবসেশন' গড়ে ওঠে।

ওঁর জগৎ হয়ে ওঠে জননীময় ! অন্তত জননীকেন্দ্রিক।

পরিণত বয়সেও মানসিক কোনও আঘাত পেলে হুডিনি মায়ের কাছে ছুটে আসতেন।

অবাক কথা—হুডিনি নিজেই স্বীকার করেছেন—ধেড়ে ছেলে, মায়ের বুকে কান পেতে তাঁর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন শুনতে পেলে তিনি জাগতিক দুঃখে সান্ত্বনা খুঁজে পেতেন।

কিশোরকাল থেকেই হুডিনি ম্যাজিকে দড়। তাসের ম্যাজিক দিয়ে শুরু, ক্রমে কঠিন-কঠিন নানান খেলা, শেষমেশ বন্ধনমুক্তির বাহাদুরীতে—যে ম্যাজিক আজ অনেকেই দেখান : হ্যান্ডকাফ খোলা।

হুডিনি এ খেলা প্রথম যখন দেখায় তখন এ-কালীন ম্যাজিশিয়ান তো ছাড়, বিংশ শতাব্দীটাই জন্মগ্রহণ করেনি। হাত-পা বেঁধে তাকে বাক্সের মধ্যে তালাবন্ধ করে রেখে দিলেও সে অলৌকিক উপায়ে—না, আবার ভুল হল, লৌকিক ম্যাজিশিয়ানী কায়দায়—বেরিয়ে আসবে। এই খেলা দেখিয়ে সে এত নাম করল যে, সারা যুক্তরাষ্ট্রে—পুবের নিউ ইয়র্ক থেকে পশ্চিমের লস্ অ্যাঞ্জেলেস পর্যন্ত— তার চাহিদা।

এই সময় ওর সঙ্গে আলাপ হল জো রিন-এর। সেও ম্যাজিশিয়ান ; নানান রকম খেলা দেখায়। কিন্তু তার ঝোঁক সম্মোহনের দিকে, আর প্ল্যানচেটের বিষয় পরলোকতত্ত্বকে সে সমঝে নিতে চায়।

হুডিনি বলত, ও-সব নেহাৎ বুজরুকি।

জো রিন বোঝাতে চাইত, প্ল্যানচেট বুজরুকি কি না এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি, কিন্তু সম্মোহন বিদ্যাটা বুজরুকি নয়! বিশ্বাস কর।

—ঘোড়ার ডিম। আদ্যন্ত বুজরুকি।

☆ ☆ ☆

গত শতাব্দীর শেষপাদের কথা। তখনো সম্মোহন-বিদ্যা বিজ্ঞান নিরঙ্কুশভাবে স্বীকার করে নেয়নি। ভিয়েনাতে ফ্রয়েড প্রতিষ্ঠিত সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটির জন্ম হতে তখনো দু-দশক বাকি।

এই নিয়ে দুই বন্ধুতে মন কষাকষি। দুজনে একসঙ্গে অনেক-অনেক প্ল্যানচেটের আসরে গেছে। হুডিনি সহজেই কারচুপিটা ধরে ফেলত। জো রিন-এর তবু বিশ্বাস হতে চায় না। মতান্তর থেকে মনান্তর। শেষ পর্যন্ত দুই বন্ধু চলে গেল দু-পথে। এই বিচ্ছেদের পর হুডিনির সঙ্গে জোয়ের আর কোনদিন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি।

তবু একটি বিশেষ কারণে জোয়ের কথাটা এখানে বলতে হল।

টীন এজ-এই পিতৃবিয়োগ। বিশ বছর বয়সে হুডিনি বিয়ে করল সুন্দরী বিয়াত্রিস্‌কে। সেও বরাবর খেলা দেখাতো হুডিনির সঙ্গে। স্বামী-স্ত্রীতে ম্যাজিকের খেলা দেখিয়ে বেড়ায় মার্কিন মুলুকের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। মাঝে-মাঝে বুড়ো খোকা ছুটে চলে আসে মায়ের কাছে। বিশেষ, মৃত্যুভয় দেখা দিলেই। তখনই ওর প্রয়োজন হয় মায়ের সান্নিধ্য। ওর এই দুর্বলতার কথা বিয়াত্রিস্ শুধু মেনেই নেয়নি, মানিয়েও নিয়েছিল।

ক্রমে ডাক এল ইউরোপ থেকে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়ায় ওর প্রোগ্রামের ব্যবস্থা হল। ও প্রথমেই এল লন্ডনে। প্রথম শোয়ের পর লন্ডন টাইমস্ সংবাদপত্রে সমালোচনায় ছাপা হল : "যে হ্যান্ডকাফে ওর হাত বাঁধা হয়, যে তালায় ওকে বাক্সবন্দি করা হয় তার মূল চাবির গোছা সর্বসমক্ষেই রাখা ছিল সব সময় ; হুডিনি কী করে তার

ডুপ্লিকেট চাবির গোছা আস্তিনের তলায় লুকিয়ে...."

কাগজ পড়ে ক্ষেপে লাল হয়ে গেল হুডিনি। সে চ্যালেঞ্জ করল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড গ্রহণ করল সে চ্যালেঞ্জ। সব কাগজে ফলাও করে সংবাদটা ছাপা হল।

বিশিষ্ট নাগরিক ও সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের সামনে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অভ্যন্তরে একটা প্রকাণ্ড হল ঘরে খেলার আয়োজন করা হয়েছে। কোন স্টেজ নেই, নেই উইংসের আড়াল। লন্ডন জেল-এর সুপারিন্টেন্ডেন্ট যখন স্বহস্তে ওর হাতে হ্যান্ডকাফ পরাতে এলেন তখন হুডিনি বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, স্যার। দর্শকদের একটা কথা বলার আছে। বলেই দর্শকদলের দিকে ফিরে বললেন, মহিলাদের অনুরোধ করছি তিন-মিনিটের জন্যে চোখ বন্ধ করে থাকতে।

কেন, কী বৃত্তান্ত প্রশ্ন করার পূর্বেই হুডিনি তার কোট-প্যান্ট সব একে একে খুলতে থাকে। খালি গায়ে যখন সে আন্ডার-ওয়্যার খুলতে উদ্যত তখন লন্ডনের মেয়র কঠিন স্বরে বললেন, থামুন।

হুডিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে বললেন, থামতে পারি এক শর্তে। লন্ডন টাইমস্-এর সম্পাদককে দেখিয়ে বলেন : ঐ ভদ্রলোক যদি প্রতিশ্রুতি দেন আগামীকাল উনি বলবেন না যে সুপারের নিজস্ব হ্যান্ডকাফের ডুপ্লিকেট চাবিটা আমার আন্ডারওয়্যারের ভিতর লুকানো ছিল!

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সমস্ত সতর্কতা সত্ত্বেও হুডিনি সেবার তিন মিনিট এগারো সেকেন্ডের ভিতর বাক্সের তালা এবং হ্যান্ডকাফের বন্ধন খুলে নিজেকে মুক্ত করেন।

তারপরেই এল এক মর্মান্তিক দুঃসংবাদ!

ওর মা আমেরিকায় মারা গেছেন! সব প্রোগ্রাম বাতিল করে হুডিনি সস্ত্রীক ফিরে এল পরের জাহাজে। বাড়িতে এসে শুনল মৃত্যুকালে ওর মা বলেছিলেন, "হুডিনিকে একটা বিশেষ কথা জানানোর আছে। কথাটা এতদিন ওকে বলিনি। তোমাদের কাউকেও বলতে পারব না। কাগজ কলম নিয়ে এস। আমি লিখে রেখে যাব মুখবন্ধ খামে। কুইক্!...."

হুডিনির ছোট ভাই ছুটে যায় সব সরঞ্জাম জোগাড় করে আনতে। নিতান্ত দুর্ভাগ্য : সে ফিরে আসার আগেই ওর মায়ের মৃত্যু হয়।

হুডিনির জীবনদর্শনই যেন পালটে গেল। কী কথা? কী কথা? কী এমন গোপন কথা যা ওর মা সারা জীবন লুকিয়ে রেখেছিল, আর যা বলে না গেলে সে মরেও তৃপ্তি পাচ্ছিল না। কথাটা ওকে জানতে হবে।

একে একে মার্কিন দেশের তথাকথিত পরলোকতত্ত্ব বিশারদদের দ্বারস্থ হল সে। কিন্তু দেখে সবই বুজরুকি! শেষে ক্ষেপে গিয়ে সে গোটা বিশ্বের পরলোকতত্ত্ব-বিশারদদের উদ্দেশ্যে একটা চ্যালেঞ্জ থ্রো করল : তার মায়ের আত্মাকে যিনি প্ল্যানচেটে নামিয়ে সেই শেষ কথাটা শোনাতে পারবেন তাঁকে হুডিনি পাঁচ হাজার ডলার পারিশ্রমিক দেবে! বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে পাঁচ হাজার ডলার মানে আজকের হিসাবে কত লক্ষ টাকা কে জানে!

অনেকেই চেষ্টা করলেন, কিন্তু বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ম্যাজিশিয়ানের চোখে ধুলো ছিটিয়ে কাজ হাঁসিল করতে পারলেন না। হুডিনি এই সময়ে একটি চিঠি লেখেন লন্ডনে, স্যার আর্থার

কনান ডয়েলকে। কনান ডয়েল পরলোকতত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। কনান ডয়েল জবাবে জানালেন, তুমি এখানে চলে এস। সাক্ষাতে সব কথা হবে।

দুরন্ত আগ্রহ নিয়ে হুডিনি আবার অতলান্তিক অতিক্রম করে এসে পৌঁছলেন লন্ডনে। স্যার আর্থার ওঁকে বললেন, "পরলোকতত্ত্ব ব্যাপারটা বুজরুকি নয়। প্ল্যানচেটে পরলোকগত আত্মারা সত্যিই আসেন।"

তিনি পাঁচ-সাতজন য়ুরোপীয় স্পিরিচুয়ালিস্ট এর নাম-ঠিকানা হুডিনিকে লিখে দিলেন। হুডিনির তখন কোন পরিচয়-পত্রের প্রয়োজন নেই, তবু স্যার আর্থার সেই সব পণ্ডিতদের ব্যক্তিগত চিঠি লিখে দিলেন।

হুডিনি পর্যায়ক্রমে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

কী দুর্ভাগ্যের কথা। যাঁদের প্ল্যানচেট-টেবিলে হামেহাল আত্মারা সারি বেঁধে যাতায়াত করেন হুডিনির উপস্থিতিতে তাঁরা আর সে জাতির ভেলকি দেখাতে পারলেন না।

মায়ের না বলা কথাটা ওঁকে কেউ শোনাতে পারল না।

বিয়াত্রিস ওঁকে প্রশ্ন করে, তোমার মা কী বলতে চেয়েছিলেন তা তুমি আন্দাজ করতে পার না? তবে তুমি কেমন ম্যাজিশিয়ান?

হুডিনি ম্লান হাসেন। বলেন, পারি। মা যদি এক লাইন লিখে যাবার সময় পেত তো লিখত, "এরিখ। ওকে ক্ষমা করিস।"

—'ওকে ক্ষমা করিস।' কাকে? কেন? কে কী অপরাধ করেছিল?

হুডিনি বলেন, এখন নয়। পরে সব কথা তোমাকে জানাব।

তা জানিয়েছিলেন। অনেক পরে। নিজের মৃত্যুর আগে। মায়ের না-বলা অনুরোধটা তিনি মেনে নিয়েছিলেন। বৈরী নির্যাতন থেকে নিজেকে সংযত করেছিলেন সারাজীবন। কিন্তু সেসব অন্যকথা। আমি তো W. L. Grasham এর মতো হুডিনির জীবনী লিখতে বসিনি। আমার এ-কাহিনীতে মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই : কোনও পরলোকতত্ত্ব-বিশারদ প্ল্যানচেটের মাধ্যমে মায়ের সেই না-বলা কথাটা ওঁকে শোনাতে পারেনি।

হুডিনি খেলা দেখিয়ে বেড়ান—বিশ্ববিশ্রুত যাদুকর তিনি—তাঁর আমলে নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাদুকর; কিন্তু তাঁর মনে শান্তি নেই। একটা কাঁটা সব-সময় খচখচ করে বিঁধছে। ঐ প্রশ্নটা তাঁর রাতের ঘুম কেড়ে নেয়। পরলোক বলে সত্যিই কি কিছু আছে? মৃত্যুর পর আত্মা কি টিকে থাকে? সে কি এই মর-দুনিয়ায় ফিরে আসতে পারে?

একদিন হুডিনি স্ত্রীকে ডেকে বললেন, দেখ, আমরা জীবদ্দশায় এ-প্রশ্নের সমাধান বোধহয় করে যেতে পারব না। কিন্তু মৃত্যুর ওপারে পৌঁছে তুমি-আমি যৌথভাবে বিজ্ঞানকে এ বিষয়ে সেবা করতে পারি।

—কী ভাবে?

—আমি যদি আগে মারা যাই তাহলে তোমাকে দেখা দেব। একটা গোপন কথা এসে বলে যাব। যদি তুমি আমার আগে মারা যাও তাহলে তুমি এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে। ঐ একই গোপন-কথা শুনিয়ে যাবে। স্বপ্নে নয়, সম্ভব হলে বাস্তবে। না হলে প্ল্যানচেটের টেবিলে! কেমন?

—আমি রাজি। কিন্তু কী সেই গোপন কথা ?

—কথাটা এই : "রোসাবেল ! আমি এসেছি ! পরলোক আছে।" "রোসাবেল !" বিয়াত্রিসের আদরের নাম ! ফুলশয্যা রাতে বর যে নামে ডাকে কনেকে। তৃতীয় ব্যক্তি যার সন্ধান জানে না। দুজনে দুজনের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন।

কথাটা সম্পূর্ণ গোপন রইল।

1926 সালে, বাহান্ন বছর বয়সে মারা গেলেন হুডিনি। রাত একটা বেজে ছাব্বিশ মিনিটে। মৃত্যুকালে তাঁর শেষ কথা, "বিয়াত্রিস ! ভুলো না। আমি কিন্তু তোমাকে দেখা দিতে আসব। আমাকে দেখে ভয় পেও না যেন।"

বিয়াত্রিস ভোলেনি। ভয়ও পায়নি। প্রতি রাত্রে সে ধূপ-ধুনো জ্বেলে একা প্রতীক্ষা করে। কিন্তু হুডিনির আত্মা কোনরাত্রেই আসে না। কিছুদিন পরে বিয়াত্রিস্ "আমেরিকান সায়েন্টিফিক" পত্রিকায় একটা বিজ্ঞপ্তি দিলেন সব কথা জানিয়ে। ঘোষণা করলেন চুক্তিবদ্ধ গোপন কথাটা যদি হুডিনির আত্মা এসে জানিয়ে দিতে পারেন তবে স্পিরিচুয়ালিস্টকে পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে।

এবারেও একই ব্যাপার হল। বহু সুযোগসন্ধানী এল গোপন কথাটা শোনাতে। ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল তারা।

তারপর একদিন। হুডিনির মৃত্যুর পনের মাস পরে বিধবার সঙ্গে দেখা করতে এলেন একজন বিখ্যাত স্পিরিচুয়ালিস্ট। অল্পবয়স : কিন্তু এরই মধ্যে সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর নাম আর্থার ফোর্ড। তিনি বললেন, সাত দিনের মধ্যে তিনি হুডিনির আত্মাকে নামাতে পারবেন, তবে যে ঘরে হুডিনির মৃত্যু হয়েছিল ঠিক সেই ঘরে তিনি রুদ্ধদ্বার কক্ষে সাত দিন ধরে নানান প্রক্রিয়া করবেন। ঐ সাতদিনে একমাত্র বিয়াত্রিস ব্যতীত আর কোন মরমানুষ সে ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না। বিয়াত্রিস এ শর্তে স্বীকৃত হল। কিছুটা ভারতীয়, কিছুটা চীনা পদ্ধতিতে নানান যাগযজ্ঞ হতে থাকে ঐ ঘরে।

সপ্তম দিনে আর্থার ফোর্ড ঘোষণা করল, আজ রাত্রে মহান যাদুকর হুডিনির আত্মা ঐ যজ্ঞঘরে আসবেন এবং একটি মিডিয়ামের মাধ্যমে বিয়াত্রিসের সব প্রশ্নের জবাব দেবেন।

আর্থার ফোর্ড-এর ইমপ্রেশারিও বা এজেন্ট খবরটা সংবাদপত্রে ছাপিয়ে দিল। শহরের বেশ কিছু গণ্যমাণ্য ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করা হল। বলা বাহুল্য সংবাদপত্রের 'নিজস্ব সংবাদদাতা'র দল বাদ গেলেন না। 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' পত্রিকার প্রতিনিধিও।

গভীর রাত্রে বসল প্ল্যানচেটের আসর। নীলাভ আধ-অন্ধকারে একসার প্রেতাত্মার মতো বসে আছেন দর্শকদল, হুডিনির একটি তৈলচিত্রকে ঘিরে। রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছেন ঘড়ির কাঁটার দিকে। কারণ ফোর্ড জানিয়ে রেখেছেন রাত একটা ছাব্বিশ হচ্ছে আত্মার আগমন মুহূর্ত। বড় দেয়াল-ঘড়ির কাঁটা টিক-টিক করে যেন কোন অশরীরী আত্মার দূরাগত পদধ্বনির প্রতিধ্বনি শোনাচ্ছে।

রাত ঠিক একটা ছাব্বিশ। নড়ে উঠল তেপায়া টেবিল।

আর্থার প্রশ্ন করল, আমাদের আহ্বানে কেউ কি এসেছেন ?

সম্মোহিত মেয়েটির কণ্ঠে শোনা গেল : এসেছি !

এ মেয়েটি আর্থারের সহকারী। সে ভাল মিডিয়াম। রাত একটা নাগাদ তাকে আর্থার সম্মোহিত করে রেখেছে।

আর্থার প্রশ্ন করে : আপনার নাম কী?

: এরিখ উইস।

: আপনার কি আর কোনও নাম আছে?

: আছে।

: কী?

: হুডিনি।

: আপনি কি আপনার স্ত্রীকে কিছু বলতে চান?

: চাই?

: কী সেই বার্তা?

: 'রোসাবেল। আমি এসেছি। পরলোক আছে।'

ঠিক সেই মুহূর্তেই বিয়াত্রিস মূর্ছিত হয়ে চেয়ার থেকে পড়ে গেলেন। সকলে হৈ-হৈ করে উঠল। কে একজন আলো জ্বেলে দিল। সম্মোহিত মেয়েটি জেগে উঠল। অবশ্য সামান্য শুশ্রূষার পরেই বিয়াত্রিস সুস্থ হয়ে উঠলেন। আর্থার ফোর্ড কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মাদাম। আপনার বিশ্বাস উৎপন্ন করার পূর্বেই এ দুর্ঘটনা ঘটায়...

বিয়াত্রিস বাধা দিয়ে বললেন, না! আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে। কারণ ঐ কথাটাই আমি প্রত্যাশা করছিলাম। একটু অপেক্ষা করুন, আমি চেক বইটা নিয়ে আসছি!

সায়েন্টিফিক আমেরিকান পত্রিকার তরফে যে বৈজ্ঞানিক যাচাই করতে এসেছিলেন তিনি বলেন, আপনার কোনও সন্দেহ নেই তো, মাদাম?

বিয়াত্রিস জবাব দেবার আগেই এক বৃদ্ধ দর্শক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মাদামের সন্দেহ থাক বা না থাক, আমার আছে! আমি পরলোকতত্ত্ব নিয়ে সারাজীবন গবেষণা করেছি। আমাকে ব্যাপারটা বুঝে নিতে দিন।

আর্থার রুখে ওঠে, আর বোঝাবুঝির বাকি কী আছে? মিসেস উইস তো নিজেই স্বীকার করছেন....

—উইথ অল রেস্পেক্ট টু মাদাম উইস, এ বিষয়ে শেষ কথা বলার অধিকার ওঁর নেই।

আর্থার আবার রুখে ওঠে, তবে সে অধিকার কার আছে? আপনার?

—হ্যাঁ! আমারই। যদি না আমাকে সম্মোহিত করবার হিম্মৎ এখানে আর কারও থেকে থাকে। কারো আছে কি?

সায়েন্টেফিক আমেরিকান-এর বিজ্ঞানী বলেন, এক্সকিউস মি, স্যার, ব্যাপারটা কী?

বৃদ্ধ বললেন, আমার নাম জো রিন। কিশোর বয়সে হুডিনি আমার বন্ধু ছিল। সম্মোহন বিদ্যা বিষয়ে মতান্তর হওয়ায় আমাদের বন্ধুবিচ্ছেদ হয়—সে আজ প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেকার কথা।

—তা নয়! আপনি এখন কী করতে চাইছেন?

—আলোটা নিবিয়ে দিন। আমি আর্থার ফোর্ডকে হিপ্‌নোটাইজ করব! বৈজ্ঞানিক

পদ্ধতিতে এই তত্ত্বটা যাচাই করব।

বৈজ্ঞানিক অবাক হয়ে বললেন, আর্থার ফোর্ড নিজেই একজন স্পিরিচুয়ালিস্ট। আপনি তাঁকে হিপনোটাইজ করতে পারবেন ?

জো রিন হেসে বললেন, সেটা নির্ভর করছে আমাদের পারস্পরিক 'উইল পাওয়ার'-এর উপর। মনের জোরের উপর। তবে আমি তো অ্যামেচার ধান্দাবাজ নই। আমি ওর জন্মের আগে থেকে এই নিয়ে গবেষণা করছি। আমাকে চেষ্টা করে দেখতে হবে বৈকি !

ফলে আবার ঘরের আলো নিবিয়ে দেওয়া হল। বিচিত্র প্রক্রিয়ায় অনতিবিলম্বেই জো রিন সম্মোহিত করে ফেলল আর্থারকে। তারপর প্রশ্ন করল : মিস্টার ফোর্ড। আপনি সাতদিন ধরে এই রুদ্ধদ্বার কক্ষে নানান প্রক্রিয়া করেছিলেন ?

—করেছিলাম ?

—ঘরে বিয়াত্রিস্ ছাড়া আর কেউ আসত না। সত্যি ?

—হ্যাঁ।

—সুযোগ বুঝে একদিন আপনি বিয়াত্রিসকে সম্মোহিত করেন। তাই নয় ?

—হ্যাঁ, তাই।

—সেই সম্মোহিত অবস্থায় আপনি কি মিসেস্ হুডিনিকে প্রশ্ন করেছিলেন : গোপন কথাটা কী ?

—হ্যাঁ, করেছিলাম।

—বিয়াত্রিস জবাবে আপনাকে কী বলেন ?

—'রোসাবেল ! আমি এসেছি ! পরলোক....'

হঠাৎ ঘরে আলো জ্বলে উঠল। দেখা গেল, আলোর সুইচে হাত রয়েছে, আর্থারের এজেন্টের। সে কঠিনকণ্ঠে জানতে চায়, এ সব কী হচ্ছে ? মিস্টার জো রিন ! আপনি থামবেন ?

জো হেসে বলে, নিশ্চয় ! এরপর আপনাদের দুজনকে যা বলার তা বলবেন পুলিস সুপার। আমার অবশ্য একটা কথা বলার বাকি আছে। তবে সে কথা আপনাদের কাউকে নয়—ঐ হতভাগ্য গবেটটাকে....

কোনদিকে লক্ষ্য না করে বৃদ্ধ গটগট করে এগিয়ে গেলেন ঘরের অপরপ্রান্তে। টেবিলের উপর যেখানে রাখা হুডিনির তৈলচিত্রটা। সেটাকে দুহাতে তুলে নিয়ে বৃদ্ধ বললেন, দেখলি হুডিনি, বিশ্বাস হল তো ? প্ল্যানচেট বুজরুকি, কিন্তু সম্মোহন বিদ্যা নয় ! তবে তোকে বলে কী লাভ ? তুই তো শুনতেই পাচ্ছিস না ! পরলোকতত্ত্বটাই তো বুজরুকি।

ছবিখানা টেবিলে নামিয়ে রেখে বৃদ্ধ যাদুকর লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে বেরিয়ে গেলেন নিষুতি রাত্রির কবলে—বাইরের রাস্তায়। তাঁর দু-চোখে তখন জলের দুটি ধারা।

বই মেলায় কী পাইনি

বইমেলায় কী কী পেয়েছি তার হিসেব মেলাতে বসিনি।

কারণ তা আপনাদের জানা।

প্রতি বছর বইমেলা-মরশুমে নানান পত্র-পত্রিকায় সে-কথা জানিয়ে দেন নামকরা এবং জনপ্রিয় কথা-সাহিত্যিকের দল। যাঁদের নাম ছাপা হয় বেস্ট-সেলার লিস্ট-এ। আমি বরং হিসাব মেলাতে বসেছি : কী পাইনি, তার।

পণ্ডিতেরা বলেছেন : বইমেলা এক মহা মিলনক্ষেত্র—যুক্তবেণীর ত্রিবেণী : গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী অর্থাৎ লেখক-প্রকাশক-পাঠক।

কিন্তু ওই তিন ছাড়া ত্রিবেণী-তীর্থে তো দেখেছি আরও একটি জীবকে : 'তীর্থের কাক'।

তার কথা কেউ বলে না কেন?

বিবেচনা করে দেখুন : একটি বই সূতিকা-গৃহ থেকে বুক-কাউন্টারে এসে পৌঁছবার আগে অনেক অনেক ঘাটের জল খেয়ে আসে। তার রূপায়ণে বহু কর্মীর অবদান। জনপ্রিয় কথা-সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে সচরাচর কোনও খানদানি পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরের নানান কর্মীর ছোঁয়া। অধম লেখকের মতো গোলা-মার্কা হলে সরাসরি প্রকাশকের দপ্তর। যে পথেই যাক—অনেক অনেকের অবদান থাকে এই যৌথ প্রচেষ্টায় : কম্পোজিটার, প্রুফ-রিডার, মেশিন-ম্যান, তারপর দপ্তরী এবং ঝাঁকামুটের হাত ঘুরে কাউন্টার-কর্মী।

বই এদের নিরলস যৌথ পরিশ্রমের ফল। কিন্তু শিল্পী ওই একজনই : লেখক।

তা তিনি কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, কবি—যাই হোন।

কিন্তু কথাটা কি ঠিক?

বইয়ের ক্ষেত্রে লেখক ছাড়া আরও একজন শিল্পী থাকেন। বই একটা শিল্প—উভয় অর্থেই। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি নয়, আর্ট অর্থে, বই যখন শিল্প তখন লেখক ব্যতিরেকে আরও একজন নেপথ্য শিল্পী সচরাচর উপস্থিত : প্রচ্ছদশিল্পী এবং/অথবা অলংকরণ-শিল্পী।

আশ্চর্যের কথা, এই সত্যটা কেউ স্বীকার করে না।

কোনও গ্রন্থের এডিশন হলে সবাই লাভবান হন, নতুন করে উপার্জন করেন : প্রকাশক, লেখক, প্রুফ-রিডার, প্রেস, দপ্তরি, ঝাঁকামুটে! কিন্তু ইলাস্ট্রেটর? প্রচ্ছদ শিল্পী? বাঃ! সেই 'নেসেসারি ইভল'-এর পাওনা-গণ্ডা তো প্রথম এডিশানের সময়েই মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার কী চাই?

একটি উদাহরণ দিই। শুনেছি, যতীন সেন মশাই শেষ জীবনে অর্থকৃচ্ছ্রতায় কষ্ট পেয়েছিলেন। পরশুরামের গ্রন্থ 'গড্ডলিকা' স্রোতে এডিশনের পর এডিশন হয়েছে—'পরশুরাম' প্রয়াত হবার পর তাঁর ওয়ারিশরা রয়্যালটি পাচ্ছে; আর 'নারদ'? তাঁর ললাটে শুধুই 'কজ্জলীর' প্রলেপ—সবই 'হনুমানের স্বপ্ন'! সবই 'ধুস্তুরী মায়া'। অথচ 'নারদ'-এর অবদান

কি কম ?

বিবেচনা করে দেখুন : সেকালের স্বনামধন্য প্রচ্ছদ-শিল্পীদের কাউকেই আমরা কোনও সম্মান জানাইনি। ভাল জাতির বই তৈরিতে তাঁদের অবদান কী অসাধারণ ছিল বলুন ? ফণিভূষণ গুপ্ত, প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, আশু বন্দ্যোপাধ্যায়, মুনীন্দ্র দাশগুপ্ত, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, অন্নদা মুন্সি, ইন্দ্র দুগার, ইত্যাদি প্রভৃতি ! যা হয়ে গেছে তার সংশোধন সম্ভবপর নয়, কিন্তু আমরা কি পারি না আজও যাঁরা প্রচ্ছদশিল্পী হিসাবে, চিত্রশিল্পী হিসাবে গ্রন্থকে সাজিয়ে তুলছেন তাঁদের দুই-একজন করে সংবর্ধনা জানাতে ? সবার আগে মনে পড়ছে শিল্পী খালেদ চৌধুরীর কথা। সরকার না দিক, কোনও সাহিত্য-ব্যবসায়ী হৌস বা প্রকাশক না দিক, বইমেলার তরফ থেকে কি আমরা তাঁকে সংবর্ধনা দিতে পারি না ? পঞ্চাশ বছরে এ যাবৎ হাজার দেড়-দুই বইয়ের প্রচ্ছদ তিনি এঁকেছেন, সেই 'নবান্নের' যুগ থেকে। বর্তমানে দৃষ্টি খুইয়ে অবসর নিয়েছেন। কিংবা ধরুন শিল্পী রণেন আয়ান দত্ত, মাখন দত্তগুপ্ত, সুধীর মৈত্র, পূর্ণেন্দু পত্রী, রঘুনাথ গোস্বামী, সূর্য রায়, সত্য চক্রবর্তী ইত্যাদি প্রভৃতি।

মেলার মণ্ডপের একটি দেওয়ালে এ বছরের শ্রেষ্ঠ দশটি কি বিশটি প্রচ্ছদের বিরাট বড়-বড় ব্লো-আপ কি সাজানো যায় না ? গিল্ডই তা নির্বাচন করুক। তাহলে তাতে পার্টিবাজি বা গোষ্ঠীগত পারস্পরিক পৃষ্ঠ-কণ্ডূয়ন হবে না।

গত বছরে গিল্ড-এর দু'একজন বড়কর্তা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বলেছিলেন, 'আপনার সাজেশানটা ভাল কিন্তু বড় দেরিতে এল।' হবেও বা। তা, এবার যখন 'সাপ্তাহিক বর্তমান' পত্রিকা আমাকে 'বইমেলা' সম্বন্ধে কিছু লিখবার আমন্ত্রণ জানালেন তখন সেই প্রস্তাবটাই নতুন করে রাখছি। অন্তত আগামী বছর যদি কোনও নির্বাচিত প্রচ্ছদ শিল্পী/ইলাস্ট্রেটরকে বইমেলায় একটি সংবর্ধনা জানানো হয়—তাহলে অত্যন্ত আনন্দলাভ করব। আগেও বলেছি, আবার বলি—আর্থিক প্রশ্নটা এখানে বড় নয়। বড় হচ্ছে আন্তরিকতার প্রশ্নটা ! গিল্ড যদি অর্থনৈতিক অসুবিধা বোধ করেন তাহলে 'ধুতি-পিরান' নাই দিলেন। সভা ডেকে দিন না তুলে বছরের সেরা প্রচ্ছদশিল্পীর হাতে এক গুচ্ছ গোলাপের তোড়া যাতে ঘরে ফিরে শিল্পী সেটাই তুলে দিতে পারেন তাঁর সহমর্মিণীর শাঁখা-সর্বস্ব হাতে !

খালেদ চৌধুরী

'বইমেলা-অষ্টাশি'র বিচিত্র অভিজ্ঞতা

প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। অর্থাৎ আমার বয়সও তখন ঐ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। অফিস থেকে ট্রামে করে বাড়ি ফিরছি। ডালহৌসী থেকে টালিগঞ্জ। আমি বসেছিলাম একেবারে সামনের দিকে। রাসবিহারীর মোড়ে বহু লোক নামল এবং উঠল। চাপ ভিড়। নজর পড়ল এক বৃদ্ধের দিকে। আমার ডবল বয়স। তাঁর এক হাতে লাঠি, অপর হাতে একটি বাজারের থলে। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, কাঁধে চাদর। ভিড়ের চাপে নিজেকে সামলাতে পারছেন না। রাসবিহারী-মোড়ে অনেকে সীট খালি করে নেমে গেল কিন্তু 'দাড়িয়াবান্দা'-খেলার ব্যর্থ খেলোয়াড়ের মতো তিনি শুধু এদিক-ওদিক ঝুলই দিলেন। অল্পবয়সী যাত্রীরা সদ্যশূন্য আসনগুলি দখল করে নিল। ভদ্রলোক টাল সামলে নাসিকাপ্রান্ত থেকে প্রায়চ্যুত চশমাজোড়াকে ঠিক করে নিয়ে আবার খাড়া হলেন।

ট্রাম ছাড়ল। আমি সীট ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম। ভদ্রলোককে চোখের ইশারায় কাছে ডাকলাম। কিন্তু তিনি সচল হবার আগেই আমার চেয়েও অল্পবয়সী একটি তরুণ তাঁকে কনুই-এর গোঁত্তা মেরে এগিয়ে এল। আমি পুনরায় আমার সীটে বসে পড়ি। তরুণটিকে বলি, আমি যাব টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো পর্যন্ত। ঐ বয়স্ক যাত্রীটিকে বসার জায়গা দেব বলেই উঠে দাঁড়াচ্ছি।

তরুণ যাত্রীটি লজ্জা পেল। বৃদ্ধ কিন্তু স্বীকৃত হলেন না। বললেন, না, না, সে কী! আপনি ট্রাম ডিপো পর্যন্ত যাবেন! আমি ঠিক পারব দাঁড়িয়ে থাকতে।

আমি বললাম, তাতে আর সন্দেহ কী? আপনার যৌবনে আপনি খাঁটি দুধ-ঘি খেয়েছেন ; কিন্তু আমার এই দালদা-পুষ্ট শরীরে আমি তো পারব না দাদা, আপনার বয়সে পৌঁছলে? তখন আপনার নাতির কাছ থেকে অনুগ্রহ আমি নেব কোন সুবাদে, আজ যদি এটুকু সৌজন্য না দেখাই?

বৃদ্ধ অমায়িক হাসলেন। বললেন, এর পর আর কোন কথা চলে না!

আমার 'অফার' করা সীটটি তিনি দখল করলেন। তিনিও নামলেন ঐ টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোয়। নেমে যাবার সময় আমার পিঠে একটা মৃদু চাপড় মেরে গেলেন। বললেন, 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন!'

আগে কিন্তু 'আপনি' বলেই কথা বলেছিলেন।

পাঠক মহাশয়! আপনার ভ্রূকুঞ্চনটুকু আমার নজরে পড়েছে। এবং পাঠিকা মহাশয়া, আপনার পান-জর্দায়-রাঙা অধরপ্রান্তের ঐ ব্যঙ্গ-হাস্যও। আপনারা দুজনেই মনে মনে

বলছেন : ত্রিশ বছর আগে একজনকে সৌজন্য দেখিয়ে সীট ছেড়ে দিয়েছিলেন সে-কথা অ্যাদ্দিন মনে রেখেছেন ! ধন্য আপনার স্মৃতিশক্তি ! আর সে-গপ্পো সাতকাহন করে আজ আমাদের শোনাচ্ছেন ! ধন্য আপনার কেরামতি !

আজ্ঞে না। আপনারা ভুল বুঝেছেন। এতক্ষণ যেটা বলেছি সেটা আমার 'বিচিত্র অভিজ্ঞতা'র মোদ্দা কথা নয়, পশ্চাদ্‌পট। বলা যায়, অবতরণিকা। অভিজ্ঞতা যেটা শোনাতে বসেছি সেটা হাল আমলের। এ বছরের দোসরা ফেব্রুয়ারীর কথা। বইমেলা শেষ হতে আর মাত্র দিন-তিনেক বাকি। রোজই সন্ধ্যার দিকে যাই। সেই বেস্পতিবারের বারবেলাতেও গেছি। মুক্তমঞ্চে আধুনিক কবিদের একটা কবিতা-পাঠের আসর হচ্ছিল। আমি পিছনের সীটে বসে শুনছি। আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল নীরদ হাজরা। বললে, এর পরেই একটি বিচিত্র বাংলা বইয়ের উদ্বোধন হবে। গান্ধীহত্যা মামলার মূল নায়ক নাথুরাম গডসের জবানবন্দী। মূল গ্রন্থটি ইংরাজিতে। নীরদ তার বাংলা অনুবাদ করেছে। এই জবানবন্দীটি আজ প্রায় চল্লিশ বছর আদালতে নথীবদ্ধ ছিল, সরকারী আদেশে প্রকাশ করা যায়নি। নাথুরামের ছোট ভাই গোপাল গড্‌সের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। পরে কারামুক্ত হয়ে বইটি অনুমতি পেয়ে প্রকাশ করেছেন। তারই বাংলা অনুবাদ। গোপাল গড্‌সে স্বয়ং আসছেন প্রধান অতিথি হিসাবে ; কিন্তু অনুবাদক ডক্টর নীরদবরণ হাজরা বা প্রকাশক এখনো পর্যন্ত কোনও প্রথম শ্রেণীর জনপ্রিয় সাহিত্যিককে সভাপতি হবার জন্য রাজী করাতে পারেনি। গান্ধীহত্যাকারীর জবানবন্দী বলে কথা...

অর্থাৎ নীরদ আমার দ্বারস্থ হয়েছে সেই হেতুতে ভদ্র তথা শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলে 'ভস্ম-নিক্ষেপণ-মানসে ভগ্নসূর্পের সন্ধান।'

রাজী হয়ে গেলাম।

সভা-সমাপনান্তে গিল্ড-অফিসের দ্বিতলে যেতে হল সৌজন্যরক্ষার্থে। তারপর ছাড়া পেয়ে নিচে নেমে এসেই একটা প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট শুরু হল। আঃ ! এরা জল ছিটায় না কেন ? এত ধুলো ! জোরে জোরে পা ফেলে আইফেল টাওয়ার গেটের দিকে এগিয়ে চলি। আমার নজর হল না—পথ কর্দমাক্ত বা আর কেউ আমার মতো নাকে রুমাল অথবা ধুতির প্রান্ত কিংবা শাড়ির আঁচল চেপে ধরে পথ হাঁটছে না। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে, আমার সওয়া-তিনকুড়ি বছরের সঙ্গী হৃৎপিণ্ডটা সেই মুহূর্তে একটা কালো মুখোশধারীর বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়ছে। কী করে বুঝব ? আমার রক্তচাপ পরীক্ষা করে কোনও উন্নাসিক কার্ডিওলজিস্ট এই সওয়া-তিনকুড়ি বছরে কখনো নাসিকাকুঞ্চন করেননি।

বইমেলা থেকে বেরিয়েই দেখি রাস্তাটা বিলকুল ফাঁকা। বাঁ-দিকে বিড়লা তারামণ্ডল-তক একখানা গাড়ি নেই : ডাইনে লাল-বাতির সঙ্কেতে গজরাচ্ছে একঝাঁক বাস-মিনি-ট্যাক্সি সার্কুলার রোড আর রবীন্দ্রসদনের মোড়ে। এমন সময় এ জাতের ফাঁকা রাস্তা আশাতীত ! মনে হল ও-পারের ফুটপাথ থেকে কে যেন আমাকে ডাকল—একছুটে চলে আয় !

বুড়োমতো লোকটা, অ্যাকাডেমি হল থেকে সদ্য বের হয়েছে।

তখন খেয়াল হয়নি 'চন্দ্রবিন্দু'গুলো ! ডাকটা : এঁক ছুঁটে চঁলে আঁয় !"

আহ্বানটা করেছিলেন বাঞ্ছারামের বাগানলোভী বাবুটির বাবা ! সঙ্গী খুঁজছেন তিনি !

আমি একছুটে রাস্তাটা পার হতে গেলাম। সড়কের যখন মাঝামাঝি তখন লালবাতির সঙ্কেত হল সবুজ। একঝাঁক বাস কাকে-খাই, কাকে-খাই করতে করতে তেড়ে এল। পড়ি-তো-মরি রাস্তাটা পার হয়ে রবীন্দ্রসদন গেটের উপর আছড়ে পড়ি। শ্বাসকষ্টটা প্রচণ্ড বেড়ে গেছে! মিনিট পনের চুপচাপ পড়ে রইলাম।

নিজের গাড়ি নিয়ে বইমেলায় যাইনি। গেছিলাম ট্যাক্সিতে। রোজ ফির্রি বাসে, বা মিনিতে। কিন্তু আজ আমার ক্ষমতা নেই। ট্যাক্সি পাই কোথায়? অতি ধীরে ধীরে রবীন্দ্রসদনের পশ্চিমের প্রবেশদ্বার থেকে দক্ষিণের প্রস্থানদ্বারে পৌঁছতে আমার সময় লাগলো পঁচিশ মিনিট। মনে হচ্ছে রামওয়াড়া চটি থেকে কেদারনাথের শেষ চড়াইটা আবার ভাঙছি।

আবার বিশ্রাম। দু-একটি প্রাইভেট গাড়ি—একেবারেই ফাঁকা যাচ্ছে যারা, তাদের হাত নেড়ে থামতে অনুরোধ করলাম। দৃষ্টিপাত করলেও কেউ কর্ণপাত করল না। দোষ দিতে পারি না তাদের। ঘটনাস্থল ক্যালকাটা ক্লাবের বারের অনতিদূরে। আমার বামহস্তের কব্জিতে নওজোয়ানী কেতায় একটা গোলাপের মালা জড়ানো। এটা সভাপতি হবার জন্য আমাকে পরানো হয়েছিল। সভান্তে আমি যে সোজা হাড়িকাঠের দিকে হাঁটা ধরব এটা ওরা কী করে আন্দাজ করেছিল মা-কালী জানেন, কিন্তু বলির 'ইয়ের' গলায় যেভাবে মালা পরানো হয়, সেভাবেই মালাটা পরিয়ে দিয়েছিল। সেটা এখন আমার বাম কব্জিতে। আমার দুটি পা-ই যথেষ্ট টলছে। প্রাইভেট গাড়ির চালকেরা সহজেই বুঝে নিয়েছে আমার পাকস্থলীতে পাঁচ-সাত 'পেগ'! এখনি ওদের সীট নোংরা করে দেব।

আরও পনের মিনিট লাগল নন্দন-গেট পৌঁছতে। সেই বালোর হাঁটি-হাঁটি পা-পা। ঠিক তখনি একটা খালি ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো আমার অদূরে। উপরে বাতি জ্বলছে। মীটার নামানো নয়। আর্তনাদ করে উঠি : ট্যা—ক্সি।

ছুটতে ছুটতে এগিয়ে যাই ট্যাক্সিটার দিকে। কিন্তু আমার চোখের দৃষ্টিতে এক দম্পতি পৌঁছে গেল তার আগেই। আমি ট্যাক্সির হাতলটা ধরে যতক্ষণে দম সামলাচ্ছি ততক্ষণে মেয়েটি পিছনের সীটে বসে পড়েছে। তার স্বামী বা সঙ্গীর দেহের আধখানাও ট্যাক্সিগর্ভে। আমি হ্যাণ্ডেল ছেড়ে ছেলেটির হাত চেপে ধরলাম। বছর পঁচিশ বয়স, পরনে একটি সাফারি-স্যুট। বাঙালী কিনা বুঝতে পারলাম না, তবে প্রচণ্ড রেগে গেছে একটু বুঝতে অসুবিধে হল না। তার মুখ দিয়ে কোনও খিস্তি বেরিয়ে আসার আগেই বললাম, প্লীজ টেক মি টু দ্য এমার্জেন্সি গেট অব পি. জি.!

ছোকরা থমকে গেল। আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিল একবার।

কোনক্রমে বলি, নট ড্রাংক। জাস্ট ড্রাউনিং [মদমাতাল নই, মৃত্যু-মাতলামিতে টলছি আমি।]

ছেলেটি আমাকে বসিয়ে দিল ট্যাক্সির সামনের সীটে।

তারপর কেন পি. জি. হাসপাতালে যাইনি, কেন সেদিন কোন ডাক্তার দেখাইনি, অথচ অন্য একটি নার্সিংহোমের ইনটেনসিভ-কেয়ার ইউনিটে আমাকে তিন দিন আটকে রাখা হল সেসব অন্য কিস্‌সা! আমার বক্ষ্যমাণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে তা সম্পর্কবিমুক্ত। আপনারা এসব খবর জানেনই না। তথাকথিত খানদানি সংবাদপত্রে সেসব খবর প্রকাশিত হয়নি—আপনাদের

কী দোষ ? আর সেইসব 'খানদানি' খবরের কাগজকেই বা দোষ দিই কী করে। 'অহন্যহনি' কত কত সাহিত্য-যশপ্রার্থী জ্ঞাত-অজ্ঞাত নার্সিংহোমে 'গচ্ছন্তি', সেখান থেকে হিন্দু-সৎকার-সমিতির ভ্যানে অজ্ঞাততর রাজ্যে 'পুনর্গচ্ছন্তি' সেসব কেচ্ছা কি ছাপা সম্ভব ? জনপ্রিয়তায় যাঁরা তৃতীয় শ্রেণী-তক, তাঁদের জন্য বিজ্ঞাপনের স্থান নষ্ট করে ওসব খবর ছাপা যায়। তার নিচে নয়। অধম বর্তমানে—হিসাব কষে দেখেছি—চতুর্থ শ্রেণীতে। হিসাবটা কী ? বলি শুনুন :

এই শহরে প্রতি বৎসর একটি মচ্ছোব হয়। কোন খানদানী হোটেলের 'ব্যাঙ্কোয়েট-হল'-এ। তা-বড় তা-বড় সাহিত্যিক থেকে জনপ্রিয়তায় যাঁরা তৃতীয়-শ্রেণী-তক তাঁদের নিমন্ত্রণ হয়। যদ্দিন আমি থার্ড-ক্লাসে ছিলুম তদ্দিন আম্মো নিমন্ত্রণ পেতুম। তারপর যে বছর ঐ বইমেলায় 'যাযাবরের অর্মনিবাস' গ্যারেজ ছেড়ে প্রথম বার হবার মুখে একটা দুর্ঘটনা ঘটায় সেই বছর থেকে আমি আর 'গুনতির বামুন' নেই। আমার নাম নেমন্তন্ন লিস্টি থেকে কাটা গেছে। তাতেই আন্দাজ করেছি, আমার জনপ্রিয়তা এ কবছরে আর এক ধাপ নেমে গেছে। তৃতীয় থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে।

যাক ওসব অবান্তর কথা। আমার 'বিচিত্র অভিজ্ঞতা'র সঙ্গে এসব ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যের কোন সম্পর্ক নেই। যে কথা বলছিলাম :

সর্দারজী ওর ডালাটা খুলে আমাকে সাবড়ে ধরল। টেনে নিল সামনের সীটে। আমি পিছন ফিরে ঐ অল্পবয়সী ছেলেটিকে বলতে গেলাম : থ্যাঙ্কু।

কিন্তু আমার কণ্ঠে স্বর ফুটল না। অথচ আমার মনে হল ওর মুখের আদলটা আমার চেনা-চেনা। কোথায় দেখেছি ওকে ? তখন কিছুতেই মনে পড়েনি।

বেলবাগান নার্সিংহোমের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে তিন দিন আর হপ্তাখানেক কেবিনে কাটিয়ে বাড়ি ফিরে আসার পর কথাটা মনে পড়ে গেল নিতান্ত ঘটনাচক্রে। এখন লক্ষ্মণের গণ্ডী ঘর ও সংলগ্ন স্নানাগার। টেলিফোন বাজল। গিন্নি জানালেন, ভানুবাবু ফোন করছেন। মিত্র-ঘোষের ভানুবাবু। তাঁর সঙ্গে দু'চার কথা হল। উনি বললেন, এবার আপনার গজেনদার সঙ্গে কথা বলুন।

বললাম। কেমন আছি, কতটা হাঁটছি সব শুনলেন। উপদেশ দিলেন, তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো, কিন্তু তাড়াহুড়ো করে নয় — অর্থাৎ hasten slowly.

টেলিফোন রাখার আগে শেষ কথা বললেন, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল আমার।

ট্যাক্সিতে দেখা সেই অচেনা ছেলেটির সঙ্গে যে সৌম্যদর্শন বৃদ্ধের মুখের আদল মিলে যেতে দেখেছি, তিনিও আমাকে ঠিক ঐ কথাই বলেছিলেন।

ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে।

নাতি কি দাদুর ঋণ শোধ করে গেল ?

উননব্বইয়ের বইমেলায় যাওয়া হল না

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা গেল না।

কথা ছিল, নব্বইয়ের দশকের প্রথম বইমেলায় পায়ে হেঁটে যাব এই চক্রবেড়ে থেকে গ্রন্থমেলার প্রাঙ্গণে, সেই যেদিন মুক্তিমেলা মণ্ডপে আধুনিক কবির দল তাদের স্বরচিত কবিতাপাঠের আসর জমাবে। দেহকে হুমকি দিয়ে রেখেছিলাম, যতই বাঁদরামো কর, এটা অবধারিত। আমি যাবই।

কারণ আছে। এ বছর, মানে আশির-দশকের শেষ বইমেলার শেষাশেষি ঐ মুক্তিমেলা-মণ্ডপেই হৃদয়ঘটিত চঞ্চলতায় বে-এক্তিয়ার হয়ে পড়ি। সে কিসসা ইতিপূর্বে শুনিয়েছি। সেবার হপ্তা-তিনেক নার্সিং-হোমে কাটিয়ে বাড়ি ফিরি ফেব্রুয়ারির শেষাশেষি। প্রথমে শয্যাশায়ী, ক্রমে সংলগ্ন বাথরুমে, তারপর বৈঠকখানা, বারান্দা, ছাদ। এক মাসের মধ্যেই সিঁড়ি ভেঙে রাস্তার সমতলে। তিনমাসের ভেতর ভোরবেলা স্টোনম্যানের নজর এড়িয়ে প্রাতর্ভ্রমণে তিন-চার মাইল পাক মারা। পূজার পর বাসে করে ঘুরে এলাম দীঘা, পরে হলদিয়া। মনের কাছে শরীর হেরে ভূত।

আসলে শরীর ছিল তক্কে-তক্কে। চৌঠা ডিসেম্বর সে একটা সুযোগ পেয়ে গেল। সে-রাত্রে কিছু নিমন্ত্রিত অতিথির জন্য গিন্নি ভালোমন্দ কয়েক পদ রাঁধলেন। লোভ সামলাতে পারিনি। ব্যাস্। সুযোগ বুঝে সে রাত্রেই দেহ অ্যাইসা ল্যাঙ মারল যে, মনসমেত আমি চিৎপটাং।

পরদিন ডাক্তারবাবু এলেন। কার্ডিওলজিস্ট। হাতে-পায়ে বন্ধন দিয়ে তাঁর ই. সি. জি. যন্ত্র চালু করলেন। তার ভিতর থেকে বার হয়ে এল গোখরো-সাপের খোলসের মতো ঈয়া লম্বা একটা চকরা-বকরা হিজিবিজি। ডাক্তার বোস সেটা পরীক্ষা করে বললেন, হার্ট ইজ হার্টী।

—মানে ?

—হার্ট ঠিক আছে। হার্টের অসুখ নয়।

—তাহলে বমি হচ্ছে কেন ? যন্ত্রণা হচ্ছে কেন ?

জানালেন, তার হেতু হার্দিক হৃদ্যতার অভাব নয়, ঔদরিক অনৌদার্য। পেটে কিছু হয়েছে। ডায়াফ্রামের নিচে। বুকে নয়।

—কী হয়েছে পেটে ?

ডাক্তার সুহৃদ বোস হাসলেন। তিনি প্রখ্যাত কার্ডিওলজিস্ট। 'সুহৃদ', 'সুউদর' নন ! নজর নিচু করেন না। পেটের ডাক্তারকে কল দিতে পরামর্শ দিলেন।

সেটাই স্বাভাবিক। এটা স্পেশালাইজেশনের যুগ। কার ছেলে বুঝি ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে একতলার ন্যাড়া ছাদ থেকে উল্টে পড়েছিল। অচৈতন্য পুত্রকে নিয়ে ছেলের বাবা ট্যাক্সি করে হাজির হল স্পেশালিস্ট-এর কাছে। 'ছাদ-থেকে-পড়া' রোগের ধন্বন্তরি ; কিন্তু রোগ বিবরণ শুনে স্পেশালিস্ট বললেন, সরি। কোনও জুনিয়ার 'ছাদ-থেকে-পড়া' রোগের ডাক্তারকে দিয়ে দেখান : দোতলার কম উচ্চতার পেশেন্ট আমি দেখি না।

সুতরাং ঔদরিক ভেষজ্ঞকে কল দেওয়া হল। ভাইপো জয়ন্ত বললে উনি প্রখ্যাত 'সুউদর' ডাক্তার। পেট-পাড়ার স্পেশালিস্ট ইনি। 'অ্যাবাভ দ্য ডায়াফার্ম অর বিলো দ্য বেল্ট' নজর দেন না। সার্জেন এলেন। আমার পেট বাজিয়ে দেখলেন। বললেন, সম্ভবত গলস্টোন। অবিলম্বে নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে হবে।

ভাইপো-ভাগ্নেরা তোল্লাতুল্লি করে নিয়ে গেল এক নার্সিং হোমে।

তিন দিন ছিলাম সেখানে। রাজার হালে। যেন রোদে রাঙা ইঁটের পাঁজা। পাক্কা বাহাত্তর ঘণ্টা গলা দিয়ে এক বিন্দু জল গলতে দিল না। শরীরধর্ম রক্ষার জন্য হাতের শিরায় ড্রিপ দেওয়া হচ্ছিল। সেই যাকে বলে খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না।

আবার সেই নার্সিং হোম থেকে ভাইপো-ভাগ্নেরা মার্জারধৃত মূষিকবৎ আমাকে নিয়ে গেল আর এক স্পেশালিস্টের ডেরায়। আলট্রাসাউন্ড না সোনোগ্রাফি কী একটা রিপোর্ট সংগ্রহমানসে। সেটা কী ? শুনলাম, এক্স-রের অত্যাধুনিক সংস্করণ। দেহের যে কোন অংশের ছবি টি. ভি. স্ক্রীনে দেখতে পাওয়া যায়। রুগী সজ্ঞানে থাকবে। স্বচক্ষে দেখবে।

স্পেশালিস্ট আমাকে নিরীক্ষাশয্যায় পেড়ে ফেললেন। বললেন, চুপচাপ দেখে যান ভানুমতীর খেল, কোনও কথা বলবেন না।

ঘরটা আঁধার করে আমার পেটে সেই যাদুদণ্ডটি স্পর্শ করালেন। 'গিলি-গিলি হোকাস-পোকাস' মন্ত্র যদি আদৌ উচ্চারণ করে থাকেন তবে তা মনে মনে। আমি শুনতে পাইনি। টি. ভি. স্ক্রীনে ফুটে উঠল আমার ঔদরিক রঙ্গমঞ্চে একাধিক কুশীলবের ছবি। স্পেশালিস্ট ভাইপো জয়ন্তকে বললেন, এই দেখুন, এটা গল-ব্লাডার, এটা ওঁর বৃক্ক।

বৃক্ক ! কী আশ্চর্য ! অভিধানের বাইরে বৃক্ককে কখনো দেখিনি। ব্যাপারটা বুঝলেন তো ? বাঙলায় যাকে 'কিডনি' বলে আর কি।

অহোবত ! আমি কী সৌভাগ্যবান। আমার বাপ-পিতেমো চৌদ্দপুরুষ কে কবে নিজের বৃক্ককে প্রত্যক্ষ করেছেন ? কেউ কখনো পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেনি, 'আপ হ্যঁয় মিস্টার বৃক্ক !' অথচ স্ব-স্ব বৃক্কটি পেট-কোঁচড়ে নিয়ে ক্যাঙারুর মতো তাঁরা দুনিয়াদারীতে দু-কুড়ি-সাতের খেলা খেলে গেছেন। তারপর অন্তিমে একদিন গঙ্গাতীরে সেই অদেখা-অচেনা-অজানা বৃক্কটি পেট-কোঁচড়ে নিয়ে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছেন। আমিই আমার এই ঔর্ব-চ্যবন-জামদগ্নির প্রবরে প্রথম যে, দর্পণ-সদৃশ টি. ভি. স্ক্রীনে নিজের বৃক্কটিকে দেখল। অ্যালিসের মতো বলতে ইচ্ছে করছে : কিউরিয়সার অ্যান্ড কিউরিয়সার।

কিছুদিন আগে একটি বই পড়েছিলাম। একজন প্রখ্যাত আর্কিটেক্ট-এর লেখা বই : 'নিজের বাড়ি নিজে বানান'।

স্থপতিবিদ-লেখক শিখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে বাড়ির প্ল্যান ছকতে হয়। পরামর্শ

দিয়েছেন, অহেতুক বাস্তুকার বা স্থপতিবিদের ফী দেওয়া বেহুদো। ওঁর বই পড়েই যে-যার বাড়ির নকশা বানাতে পারবে। আজ ঐ অবাক-যন্ত্রের কেরামতি দেখে মাথায় একটা নতুন আইডিয়া এল। ভাল হয়ে আম্মো একখানা কেতাব লিখব : "নিজের অ্যাপেন্ডিক্স নিজে কাটুন।"

সেলুনে না গিয়ে, নাপিতকে না ডেকে আয়নায় দেখে-দেখে যদি দাড়ি কাটা যায়, তাহলে সার্জেনের বাড়া ভাতেই বা ছাই দেওয়া যাবে না কেন? টি. ভি. স্ক্রীনে দেখে দেখে যে-যার অ্যাপেন্ডিক্স নিজে-নিজেই কাটব।

স্পেশালিস্ট বললেন, থ্যাংক গড। দেয়ার্স নো স্টোন।

জয়ন্ত জানতে চায়, কোথায়? কিডনি না গল-ব্লাডার?

- কোথাও নেই।

আমি ফস্‌ করে বলে বসি, এক কলম লিখে দেবেন, স্যার?

স্পেশালিস্ট ধমকে ওঠেন : শাট আপ। আপনার না কথা বলা বারণ?

কথা কি সাধ করে বলছি? ঐ সার্টিফিকেটখানা যে আমার নিতান্ত দরকার। দু-একমাস বাদেই আবার ভোর-ভোর ভ্রমণে বের হব। বার-বার অসুখে এমন পাগল-পাগল চেহারা হয়েছে, ভয় হয়, যে-কোন দিন পুলিসে ধরবে। স্টোনম্যান ভেবে। স্পেশালিস্ট-এর সার্টিফিকেট থাকলে পুলিশ-পুঙ্গবের নাকের ডগায় মেলে ধরে সাফাই গাইতে পারব : দেখে নাও। পেট কোঁচড়ে কোন স্টোন নেই আমার।

* * *

দুর্ভাগ্য একেই বলে। আলট্রাসোনিক এক্সপার্ট-এর রিপোর্টখানা দেখে সার্জেন বললেন, পেটে পাথর থাক-না-থাক গল ব্লাডারটা কেটে বাদ দেওয়া দরকার। তাড়াহুড়ার কিছু নেই। জানুয়ারির শেষে বা ফেব্রুয়ারিতে অপারেশন করালেও মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

খোদায় মালুম, আমি যে সার্জেনদের বাড়া ভাতে ছাই দেবার দুরভিসন্ধি করেছি তা উনি কেমন করে আন্দাজ করলেন। জিয়ানো মুরগিটিকে বাসায় ফিরতে দিয়ে চাকুতে শান দিতে থাকেন।

ফিরে এলাম নিজের ডেরায়। অত্যন্ত দুর্বল। শয্যাশায়ী। বাথরুমে উঠে যাবার ক্ষমতা নেই। তের দিনে চৌদ্দ পাউন্ড ওজন কমে গেছে।

আমাদের বাড়ির পাশেই একটা বস্তি : হিন্দুস্থানীদের। ষোলই ডিসেম্বর, শনিবার রাত্রে সংলগ্ন মাঠে সারারাত ভিডিও চালালো ওরা। একটার পর একটা হিন্দি ফিল্ম। আমার রক্তচাপ নব্বই বাই ষাট। দুর্বলতাজনিত কারণে আমার ঘুমের ওষুধ খাওয়া মানা। ফলে সারা রাত জাগতে হল। ক্লান্তিতে দু-চোখের পাতা বুজে আসছে কিন্তু বিকট শব্দতরঙ্গে ঘুমাবার উপায় নেই। অনুরোধ-উপরোধে এসব ক্ষেত্রে কেউ কান করে না, সে অভিজ্ঞতা আগেই হয়েছে। রাত সওয়া তিনটেয় কন্যা মৌ স্থানীয় থানায় ফোন করে আমার অসহায় অবস্থাটা জানালো। অফিসার অভিযোগটা শুনে বললেন, জীপটা রোঁদে বেরিয়েছে। ফিরে এলেই আপনাদের ওখানে পাঠিয়ে দেব। যাতে ওরা ভলুমটা একটু কমিয়ে দেয়। সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যালের বাড়ি থেকে বলছেন তো?

অর্থাৎ জনগণ শব্দদূষণে ইচ্ছুক হলে বাধা দেওয়া চলবে না। পার্কে তারস্বরে ভিডিও

বাজানো চলবে। তবে হ্যাঁ। ঐ যারা লেখে-টেখে তাদের খাতিরে ভলুম একটু কমানো যেতে পারে।

রোঁদ সেরে জীপটা থানায় ফিরে আসবার আগেই চন্দ্রবিন্দুটা অস্ত গেছে, অর্থাৎ 'রোঁদ' হয়েছে 'রোদ'। পূর্ব আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। শেষ ক্যাসেটটা সমাপ্ত হল। কর্কশ নিনাদ থামল। কলবল করে যে-যার ঘরে শুতে গেল।

সমস্ত রাত্রির জাগরণে দেহমন ভেঙে পড়তে চাইছে। একটা দুর্মনস্য নির্বেদে মনটা আচ্ছন্ন। আজকের এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য কেন এই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা? এখানে প্রতিপদে উৎকোচ দিয়ে জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়, এখানে ভোট দিতে গেলে শুনতে হয়, 'আপনার ভোট হয়ে গেছে।' এখানে রাজনৈতিক দাদাদের মদতে মস্তানরা তোমার-আমার জীবনযাত্রার ছক বেঁধে দেয়, এখানে 'ক্রিকেট' শব্দের অর্থ বিদেশী টীম প্রথম ওভারে হ্যাট-ট্রিকের চেষ্টা করতে পারবে না, করাচির মাঠে মিয়াঁদাদকে অল্প রানে আউট করা 'মানছি-না-মানব-না'। বাতাস এখানে বিষাক্ত, আকাশ এখানে কারাগার! এর চেয়ে মৃত্যুই কি বাঞ্ছনীয় নয়?

ওরই মধ্যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙল রবিবার সকাল সাড়ে-সাতটা আটটায়। হল-কামরায় টি. ভি.-তে রবীন্দ্রসঙ্গীত হচ্ছে। গাইছে অতনু সান্যাল :

"আপনাকে দিয়ে রচিলি রে কি এ আপনারই আবরণ!

খুলে দেখ দ্বার, অন্তরে তার আনন্দনিকেতন॥"

কী আশ্চর্য। কী অপরিসীম আশ্চর্য! দু-তিন হাজার রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভিতর থেকে বেছে নিয়ে অতনু, আজ সকালে, এই গানটাই বা গাইছে কেন?

উপলব্ধি করি, এই যে দুর্মনস্যতা, এই যে নির্বেদ, এ তো আমার নিজেরই রচনা। পূবের জানলা দিয়ে ঐ যে শীতের রোদ ঘরে ঢুকে থমকে গেছে তার স্বর্ণাভায় তো একটুও হেরফের হয়নি। এই যে এতক্ষণ মনে হচ্ছিল, "মুক্তি আজিকে নাই কোনো ধারে, আকাশ সেও যে বাঁধে কারাগারে, বিষনিঃশ্বাসে তাই ভরে আসে নিরুদ্ধ সমীরণ।" —সেজন্য তো আমি, একমাত্র আমিই একান্তভাবে দায়ী।

ঐ বস্তির ছেলেগুলো ইলেকশানে খাটাখাটি করেছে, পোস্টার সেঁটে শহরটাকে কদর্য করে তুলেছে 'দাদা'দের নির্দেশে, 'ভোট-ভর' চিৎকারে ওদের গলা বসে গেছে—ওরা ইলেকশান বাবদ দুটো পয়সা পেয়েছে। মদ না গিলে ভিডিও ক্যাসেট ভাড়া করে দল বেঁধে শুনেছে। সেটা কী এমন অপরাধ? ওরা শেক্সপীয়ার-শেলীর নাম শোনেনি, রবীন্দ্রনাথ পড়েনি, গৌতমবুদ্ধ থেকে আলবার্ট আইনস্টাইন ওদের কাছে অচেনা, অজানা! কী পেয়েছে ওরা জীবনে? ওরা যদি টি. ভি. স্ক্রীনে পাঁচতারা হোটেলের ক্যাবারে 'হল' দেখে সেই রকম অবাক মানে যেমন আমি মেনেছিলাম টি. ভি. স্ক্রীনে নিজের বৃক্কটিকে দেখে, তাহলে আমি কেন দুর্মনস্যতায় ভুগি?

হল-কামরার টি. ভি.-তে তখন অতনু গাইছে :

"ঠেলে দে আড়াল; ঘুচিবে আঁধার—আপনারে ফেল দূরে—

সহজে তখনি জীবন তোমার অমৃতে উঠিবে পুরে॥"

❀

জীবনের অর্থ

'আপনি কী করেন?'

এমন প্রশ্ন তোমাদের শুনতে হয় না। বিশেষত প্রশ্নের ঐ 'দন্তের ন'-অন্ত কৌতূহল থাকলে। নেহাৎ কেউ শুধালে হয়তো তোমরা জবাবে বলবে, 'আমি স্কুলে পড়ি।'

না, আমি তোমাদের কথা বলছি না। বলছি, বড়দের কথা। তাঁদের এমন প্রশ্ন করে দেখেছি, ওঁরা ধরে নেন আমি ওঁদের অর্থাগমের পথটা জানতে চাইছি। অর্থাৎ যে কাজের মাধ্যমে ওঁর সংসারযাত্রা নির্বাহ হয়। জীবিকার নাম। আমাদের আমলে জবাবে শুনতে পেতাম, আমি স্কুলে পড়াই, আমি এঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার অথবা রেলে চাকরি করি। মহিলাদের এমন প্রশ্ন করা হলে সে আমলে উল্টে ধমক খেতে হত : 'ঢং। কী আবার করি? সংসার করি—রান্নাবান্না করি, ছেলে-মেয়েদের মানুষ করি।'

ইদানীং এ জাতীয় প্রশ্নে দেখেছি লোকে ধরে নেয় আমি বুঝি তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ বিষয়ে কৌতূহলী। তাই জবাবে শুনি : 'আমি কংগ্রেস করি,' বা 'আমি সি. পি. এম. করি।'

কে জানে দুজাতির জবাব একই অর্থবহ কিনা, মানে অনর্থবহ।

কেউ কেউ রসিক। জবাবে হেসে বলে : 'রকবাজি'! অথবা 'ভ্যারেন্ডা ভাজি।'

অর্থাৎ এমপ্লয়মেন্ট-এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়ে অপেক্ষা করছে।

মে-মাসের 'রীডার্স ডাইজেস্ট' পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ পড়ে ভাল লাগল। রবার্ট ফুলঘাম-এর লেখা : 'This is what I do.' লেখক দেখলাম, ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে দু-দুবার বড় জবর জবাব পেয়েছিলেন। তোমাদের মধ্যে অনেকেই রীডার্স ডাইজেস্ট হয়তো পড় না, বা পড়লেও হয়তো ওটা নজরে পড়েনি। তাই সেই প্রত্যুত্তর দুটি শোনাতে চাই :

একজন বিচিত্র মানুষের কথা বলি। খুবই সাধারণ চেহারা। প্রৌঢ় নন, বৃদ্ধই। আগে ছিলেন নৌবিভাগের একজন বড়জাতের অফিসার। বর্তমানে অবসর নিয়েছেন। ছোট্ট সংসার, বাগান করার সখ আছে। মটোর গাড়ি চালানো ভালবাসেন আর ভালবাসেন ছোটদের। যা সঞ্চয় করেছেন এবং যে পরিমাণ পেনশন পান তাতে উনুন কী ভাবে জ্বলবে একথা চিন্তা করতে হয় না তাঁকে। তবু কর্মঠ থাকার উদ্দেশ্যে তিনি একটি চাকরি নিয়েছেন : নবীন শিক্ষার্থীদের মটোর-গাড়ি-চালানো শেখানোর কাজ। না, কোন মটোর-ড্রাইভিং স্কুলে নয়। অ্যাকাডেমিক স্কুলে। বিদেশে স্কুল-লীভিং সার্টিফিকেট দেবার আগে ছাত্রছাত্রীদের মটোর ড্রাইভিংটা আবশ্যিকভাবে শেখানো হয়। সেদেশে নিরক্ষর মানুষ যদি বা পাওয়া যায় নিলাইসেন্স-মানুষ নিতান্ত দুর্লভ!

ষোলো বছরে শুরু হয় : 'অ-য় অজগর আসছে তেড়ে'! অর্থাৎ এটা স্টিয়ারিং হুইল,

এটা ক্লাচ, ওটা অ্যাক্সিলেটার,—উঁহুঁ এটা নয়, ওটা তো ব্রেক! সতেরয় দ্বিতীয় ভাগ : 'সদা সত্য কথা বলিবে।' অর্থাৎ গাড়ি চালানোর 'এথিক্স'। কখন কার 'পথের দাবী'—যাকে সাদা বাঙলায় বলে 'রাইট অফ দ্য ওয়ে'—মানতে হবে। আঠারো-উনিশ, যে-যেমন পারে, শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ছেলে অথবা মেয়েটির হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় একটা চাবির থোকা। ঐ সঙ্গে তার হিপ পকেটে কিংবা ভ্যানিটিব্যাগে একটা কাগজের টুকরো : ড্রাইভিং লাইসেন্স।

শুনলে মনে হতে পারে এটা নিচু ধরনের কাজ। তাই না? আমাদের দেশের সমাজে উকিল-ডাক্তার-এঞ্জিনিয়ারদের যে মর্যাদা মটোর-ড্রাইভিং স্কুলের শিক্ষকের তেমনটি নয়। ওদেশে ফারাকটা তেমন করে বোঝা যায় না। মোট কথা, জাঁদরেল রিটায়ার্ড নেভাল অফিসার অবসরপ্রাপ্ত জীবনে এই নতুন জীবিকাটিকেই গ্রহণ করেছিলেন। স্কুলে তিনি ছাত্র-ছাত্রীমহলে খুবই জনপ্রিয়। তিনি সকলেরই : 'ড্রাইভারদাদু'।

জীবনের অর্থ কী সমঝে নিতে তাঁর দ্বারস্থ হয়েছিলাম একবার। আমাদের কথোপকথনটা হয়েছিল এই জাতের :

আমি বলি, আপনিই তাহলে স্কুলের ড্রাইভিং ট্রেনার?

—ওয়েল, আমার চাকুরির অভিধাটা ঐ জাতেরই বটে।

—না, মানে আমি জানতে চাই, আপনি ঠিক কী করেন? আপনি যা পেনশান পান, তাতে...

—না, না! স্কুলের কর্তৃপক্ষ মাসান্তে আমাকে যে পে-প্যাকেট দেন আমি তা একটা বিশেষ ছাত্রফাণ্ডে জমা দিই—কাজটা করি অন্য হেতুতে।

—সেই 'হেতুটা কী'? তাই তো জানতে চাইছি।

—দেখুন, শুনলে মনে হবে আমি 'বাগাড়ম্বর' করছি কিন্তু বাস্তবে আমার কাজটা হল ওদের হাত ধরে যৌবরাজ্যের তোরণদ্বারটা পার করিয়ে দেওয়া, জীবনসৌধে গৃহপ্রবেশ করানো। ওরা সবাই শেষ পর্যায়ের 'টীন-এজার'। এমন একটা বয়স যখন সবে দুনিয়াকে সমঝে নিয়ে দু-কুড়ি-সাতের খেলা শুরু করতে যাচ্ছে। টাকার প্রয়োজনীয়তা, জীবন-যৌবন-যৌনতার অর্থ, ধূমপান-মদ এমনকি ড্রাগস্ সম্বন্ধেও ওরা ওয়াকিবহাল। কৈশোরের সেই অবাক-বিস্ময়ের যুগটা সদ্য-অতিক্রান্ত, এই যে কৈশোর থেকে যৌবন উত্তরণ, এর সন্ধিক্ষণের নির্দেশক কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান এ-দেশে হয় না। ওটারই দায়িত্ব আমি নিয়েছি। একটা নাবালককে সাবালকত্ব অর্পণের দায়িত্বটা। 'আজ থেকে তোমার ভোটাধিকার স্বীকৃত' একথা বলার মধ্যে সেই গুরুত্বটা নেই। ওরাও জানে আমরাও জানি, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ভোটারের গড্ডলিকা-স্রোতে সামিল হলে কাঁধের উপর একজোড়া পাখনা-গজায় না! বরং আমি সেই ব্রতটা উদ্‌যাপন করি—যখন ওদের হাতে ধরিয়ে দিই চাবির থোকাটা, লাইসেন্স সহ। তখনি ওদের কাঁধে পাখ্‌না গজাবার উপক্রম হয়।

আমি ওদের বুঝিয়ে দিই : কী প্রচণ্ড দায়িত্ব সমাজ ওদের দিচ্ছে এই মুহূর্তটি থেকে। স্টিয়ারিং হুইলটা রাজদণ্ড, ড্রাইভারের সীটটা সিংহাসন। গাড়িটা যত অশ্বশক্তির ততখানি ক্ষমতাই ধরে ঐ ইগ্‌নিশান চাবিটা। ওদের ক্ষমতা, দায়িত্ব, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিয়ে

দিই সবিস্তারে। আর জীবন-মৃত্যুর সীমানায় সেই দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার খণ্ড মুহূর্তটার কথা, বারে-বারে বিশেষভাবে। বুঝিয়ে বলি, শুধু তোমার নয়, বাবা-মা-দাদু, এমনকি খোকন-সোনার জীবন-মরণের দায়িত্বও কিন্তু এই মুহূর্ত থেকে তোমার উপর বর্তেছে—আর ঐ অজানা-অচেনা পথচারীদের জীবন। খেয়ালখুশিতে কেদ্দানি দেখাতে গিয়ে অথবা পার্টিতে মদ্যপান করে এত বড় দায়িত্বের অমর্যাদা কর না যেন, দাদুভাই-দিদিভাই!

শুনে বুঝতে পেরেছিলাম, কেন সেই অবসরপ্রাপ্ত নেভাল অফিসার সখ করে এ কাজটা নিয়েছেন। ইজিচেয়ারে শুয়ে-শুয়ে 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে' গানের পরিবর্তে আগামীযুগকে উনি শেখাতে বসেছেন—শুধু গাড়ি চালানো নয়, কী ভাবে দৃঢ়ভাবে ধরতে হবে জীবনের স্টিয়ারিং হুইল।

* * *

একবার, জীবনে মাত্র একবার আমি একজনকে প্রশ্ন করেছিলাম, জীবনের অর্থ কী? হ্যাঁ, একটা আবেগময় দৃঢ় প্রত্যয়ের প্রত্যুত্তর পেয়েছিলাম। যা আজও ভুলতে পারিনি। সেটা শুনিয়েই বিদায় নেব।

ঘটনাটা ঘটেছিল ভূমধ্যসাগরের ছোট্ট ক্রীট দ্বীপের এক নগণ্য গ্রামে। তার নাম : কলিম্পারি। ওখানে গড়ে উঠেছিল একটা প্রতিষ্ঠান : 'বিশ্বশান্তি এবং মানবকল্যাণ আকাদেমী'। ঐ দ্বীপে বাস করে অনেক জার্মান নাগরিক। এছাড়া ক্রীটদ্বীপের আদি বাসিন্দারা তো আছেই। দুই দলের মধ্যে একটা বৈরিতার সম্পর্ক—মারামারি, হানাহানি লেগেই আছে। এই তিক্ত সম্পর্কটার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর। কারণটা বলি :

ক্রীট-দ্বীপ একটি অতি আদিম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক। 'মিনোয়ান সভ্যতা'। ভূমধ্যসাগরে গ্রীসের দক্ষিণে সমুদ্রমেখলা এই ক্রীট দ্বীপ। সেখানে বাস করতেন পৌরাণিক রাজা 'মিনস', যাঁর নামে ঐ সভ্যতার নাম 'মিনোয়ান সভ্যতা'। বলা হয় পৃথিবীর প্রাচীনতম চারটি সভ্যতার মধ্যে একটি। অপর তিনটি হল সুমার-এর মেসোপোটেমিয়ান সভ্যতা, মিশর এবং সিরিয়া-প্যালেস্টাইন অঞ্চলের হিব্রু-সভ্যতা। এদের প্রায় সমসাময়িক—শ পাঁচেক বছর পরে সিন্ধুনদের তীরে মহেনজোদারো আর তারও কিছুদিন পরে চীন সভ্যতার প্রকাশ। গ্রীক সভ্যতার অভ্যুত্থান দেড় দুই হাজার বছর পরে। এই মিনোয়ান সভ্যতাই য়ুরোপে ব্রোঞ্জযুগের প্রথম সূচনা করে। তাদের রাজধানী ছিল 'নস্‌স'-এ। মহেনজোদারোর শিল্পীদের অনেক আগে এরা পোড়ামাটির তৈজস, ভাস্কর্য নিদর্শন বানিয়েছে, নানা রকম অলঙ্কার বানিয়েছে আর অজন্তার ঢঙে রাজপ্রাসাদের প্রাচীরে ম্যুরাল এঁকেছে। রাজধানীতে ছিল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদ, পাথরে গড়া সাঁকো, পাকা রাস্তা, বাগান ইত্যাদি। তারা ছিল শান্তিপ্রিয় মানুষ। লড়াই-কাজিয়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত রাখেনি আদৌ। গ্রীক সভ্যতার অভ্যুত্থানে খ্রীস্টজন্মের প্রায় হাজার বছর আগে বহিঃশত্রুর আক্রমণে মিনোয়ানরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

তারপর প্রায় তিন হাজার বছর কেটে গেছে। আমরা কাহিনীর সূত্রটা তুলে নিচ্ছি একেবারে হাল-আমলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দ্বীপটি ছিল নাৎসী অধিকারে। ওদের প্রাচীন সংস্কৃতি আকাদেমীর সংলগ্ন মাঠের একান্তে নাৎসীরা বানিয়েছিল একটা এয়ার-স্ট্রিপ। নাৎসী বম্বার-প্লেন উঠতো-নামতো। মূল হেতুটা কী, তা আজ আর কারও মনে নেই। জনশ্রুতি,

নাৎসী প্রহরীরা নাকি একটি স্থানীয় যুবতীকে জোর করে তাদের তাঁবুতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। গোটা গ্রাম তাতে ক্ষেপে গেল। শান্ত-শিষ্ট গ্রাম্য কৃষক আর মৎস্যজীবীরা হানা দিল ঐ ক্যাম্পে। ওরা সংখ্যায় ছিল কয়েক শো। নাৎসী প্যারাটুর্পাস ক্যাম্পে প্রহরীরা মাত্র চারজন। কিন্তু এদের হাতে ছিল লাঠি, হেঁসো, কুড়ুল, কাস্তে আর ওদের হাতে অটোমেটিক মেশিন-গান। এক-সন্ধ্যার যুদ্ধান্তে চারজন নাৎসী প্রহরীকে বাদ দিলে গ্রামে জীবিত মানুষ কেউ অবশিষ্ট ছিল না। না-কোন অশীতিপর বৃদ্ধা, না কোন সদ্যোজাত শিশু।

শতাব্দীর সেই রক্তস্নাত দিনটির পর ঐ অঞ্চলে জার্মানী আর ক্রীটের বৈরিতার সম্পর্ক। নাৎসী জার্মানীর গোয়েরিং, গোয়েবল্‌স হিটলার মায় তাদের ব্লিৎসক্রীগ প্যানজার-বাহিনী মহাকাশের চরণতলে প্রণামান্তে ধুলো হয়ে মিলিয়ে গেছে। কিন্তু কলিম্পারি গাঁয়ে নতুন যুগের মানুষ সেই অসম-যুদ্ধের স্মৃতিটা আজও ভুলতে পারেনি।

এই গ্রামেই গড়ে উঠেছে ঐ আকাদেমী : বিশ্বশান্তি ও মানবকল্যাণের ব্রত নিয়ে।

যাঁকে আমি এই প্রশ্নটা করেছিলাম—ঐ যে, জীবনের অর্থ কী?—তাঁর নাম প্রফেসর আলেকজান্ডার পাপাদেরস। ঐ কলিম্পারি গাঁয়েরই সন্তান। পঞ্চাশ বছর আগের সেই ভয়ঙ্কর দিনটিতে দশ-বছরের পাপাদেরস্ ছিলেন ইংল্যান্ডের এক ছাত্রাবাসে। গ্রামে নয়। যুদ্ধান্তে স্বগ্রামে ফিরে এসে দেখেছিলেন পরিচিত দুনিয়াটা—ওঁর বাল্যস্মৃতির প্রতিটি মানুষ সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে। যুদ্ধান্তে নতুন মানুষেরা এসে ঐ গাঁয়ে বসবাস শুরু করল। উনি গেলেন পড়াশুনা করতে। ক্রমে মূল লক্ষ্য : বিশ্বশান্তি আর মানব কল্যাণ।

ফিরে এলেন অবশেষে—মহাপণ্ডিত হয়ে এসেছেন তিনি। কী আশ্চর্য—ঐ কলিম্পারি গ্রামেই। এখানেই খুলে বসলেন ঐ আকাদেমী—জাতিতে-জাতিতে সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্রত নিয়ে। এটাই ওঁর বাবা-মা-ভাই-বোনদের প্রতি তর্পণের আয়োজন।

আমি ওখানে গিয়েছিলাম দু-সপ্তাহের জন্য। গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর একটি সেমিনারে যোগ দিতে। ততদিনে ডক্টর পাপাদেরস ঐ প্রতিষ্ঠানের শুধু প্রতিষ্ঠাতাই নন, প্রাণপুরুষ!

শেষ দিন, শেষ বক্তৃতাটি শেষ করে বৃদ্ধ পাপাদেরস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমরাও। হঠাৎ উনি ধীর পদে এগিয়ে গেলেন খোলা জানলাটার দিকে। মিনিট-খানেক তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে দৃষ্টি মেলে। এক দিকে গ্রাম—নতুন যুগের নতুন বাসিন্দাদের বাড়ির চিমনি দিয়ে ধোঁওয়া উঠছে। মানুষজন কাজ করছে। অন্যদিকে দিগন্ত অনুসারী নীল ভূমধ্য-সাগর। আর সুনীল আকাশে সূর্যসাক্ষী একটা নিঃসঙ্গ সী-গাল। ভেসে আসছে তার করুণ শীৎকার।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন উনি। আমাদের মুখোমুখি। প্রথামাফিক জানতে চাইলেন, কারও জিজ্ঞাস্য আছে কিছু?

যেন প্রতিবর্তী প্রেরণায় আমি জিজ্ঞাসা করে বসলাম : ডক্টর পাপাদেরস্, আমার একটা প্রশ্ন আছে—

: ইয়েস?

: জীবনের অর্থ কী?

ক্লাসে একটা চাপা হাসির ঢেউ উঠল। এ প্রশ্নের সঙ্গে গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক নেই। বক্তৃতার সঙ্গে প্রশ্নটা যেন নিঃসম্পর্কিত। কেউ কেউ নোট-খাতা গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত ছিল, কেউবা রওনা হয়েছে নিগর্মনদ্বারের দিকে।

প্রফেসর পাপাদেরস্ স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন প্রায় বিশ সেকেন্ড। বোধকরি উনি সমঝে নিতে চাইলেন যে, আমি ওঁর 'লেগ-পুলিং' করছি কি না। তারপর উনি সিদ্ধান্তে এলেন—আমি সিয়েরিয়াস, আমি অর্থী, জিজ্ঞাসু।

: তোমার প্রশ্নটার জবাব আমি দেব, ইয়াং ম্যান।

পায়ে-পায়ে ডায়াসের দিকে ফিরে এলেন উনি। ওঁর সে কণ্ঠস্বরে গোটা ক্লাস থমকে গেছে। যে যেখানে ছিল সেখানেই স্থাণু। পাপাদেরস্ ওঁর হিপপকেট থেকে একটা ভারী ওয়ালেট বার করলেন। তার খোপ থেকে একটা ছোট্ট গোল কাচের টুকরো। না, কাচের নয়, আয়নার। একটা টাকার মাপে। উনি সেটা উঁচু করে ধরলেন। অল্প ঘোরালেন নিয়নবাতির প্রতিফলিত আলোটা সাদা দেওয়ালের উপর লুটোপুটি খেল। গম্ভীরস্বরে বৃদ্ধ অধ্যাপক তারপর বললেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিল দশ-বারো। ছিলাম ইংল্যান্ডে। যুদ্ধান্তে গ্রামে ফিরে এসে যখন ইতি-উতি ঘুরছিলাম তখন একটা হাত-আয়নার কয়েকটা টুকরো কুড়িয়ে পাই। হয়তো কোন মহিলার হাত-ব্যাগের ভাঙা আয়না। সবচেয়ে বড় টুকরোটা আমি তুলে নিলাম। স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে। ছেলেবেলায় ওটা ছিল আমার খেলার সরঞ্জাম। ওটা দিয়ে আমি সূর্যালোক প্রতিফলিত করতাম। যেসব গর্তের গভীরে, সুড়ঙ্গে, বাড়ির আনাচে-কানাচে, অ্যাটিকের দূরতম প্রান্তে—যেখানে কোনদিন সূর্যালোক পৌঁছানোর কোনও সম্ভাবনা নেই, আমি সেইসব জায়গায় আলো ফেলতাম। হাত-আয়নার টুকরোটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। এটা ছিল একটা মজার খেলা। অন্ধকার সুড়ঙ্গের ঐ প্রান্তটাকে সম্বোধন করে বলতাম, দেখলি তো বন্ধু—সূর্যের আলো কী উজ্জ্বল।

বয়স বাড়ল। অনুভব করলাম : সত্যটা। ছেলেবেলায় কিছুই না বুঝে যেটা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে পুরেছিলাম সেটাই আমার জীবনসত্যের কম্পাস। বুঝতে শিখলাম, আমি একটা বড়-আয়নার ছোট্ট টুকরো। গোটা আয়নাটা দেখতে কেমন, তা আমি জানি না, জানব না-ও কোনদিন। তা হোক, তবু এই ভগ্নাংশের মধ্যেও রয়ে গেছে গোটা পরিকল্পনার একটা অংশ। এই আমি-নামক ছোট্ট আয়না ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেক অন্ধকার কোণাকে আলোকিত করা সম্ভব। সমাজের যেসব হতভাগ্য গভীর ফাটলে কোনদিন সূর্যালোক প্রবেশ করবে না সেখানেও আমি একমুঠো আশার আলো ছড়িয়ে দিতে পারি। ছোট্ট-ছোট্ট ভালবাসার আলো। জ্ঞানের আলো, সত্য-শিব-সুন্দরের আলোকের চুমকি! হয়তো আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমার মতো আরও কত ছোট-ছোট ভাঙা আয়নার টুকরো এগিয়ে আসবে। শীষমহলের লক্ষ-আয়নার চন্দ্রাতপে ঝিলমিলিয়ে উঠবে আমাদের সমবেত শুভ প্রচেষ্টা! সেদিন আর আমার ক্লাসে কেউ জানতে চাইবে না : জীবনের অর্থ কী? বরং আমার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিশ্বশান্তি আর বিশ্বভ্রাতৃত্বের ব্রত উদযাপনের প্রচেষ্টায় সামিল হবে।

❀

সেজদা,
সেজকা,
সেজদাদু

কেউ ডাকে সেজদা, কেউ সেজকা, কেউ সেজদাদু। হয়তো সেজমামাও কেউ-কেউ। 'সেজঠাকুরপো' ডাকবার মতো মানুষ কজন আছেন তা জানি না, তবে নামধরে ডাকবার মতো বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বোধকরি আর কেউ নেই এ দুনিয়ায়। থাকলে আমি তাঁদের চিনি না। যখন যেখানে থাকেন—কী দেওঘর-মধুপুর, কী ভবানীপুরের সাবেক বাড়িতে—সকালসন্ধ্যা দর্শনার্থীর ভিড় লেগেই থাকে। কেউ এসেছে সেজদার খোঁজে। কেউ সেজকার, কেউ সেজদাদুর। যে-কোন সাহিত্যসেবী এতে বিরক্ত হবেন। উনি হন না।

—এই যে, এস, এস, বস ! উঃ কদ্দিন পরে ! তোমার সেই ন'-জ্যেঠামশায়ই ভাল আছেন তো ? দেহ রেখেছেন ? কবে ? কই, খবর পাইনি তো ?

লোক ক্রমাগত আসছেই, যেন •বিশ্বনাথের গলি ! সবাই ওঁর চেনা, পরিচিত, অতি অন্তরঙ্গ। তাদের ঘিরে বৈঠকী গল্প চলে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অরুণাচলের এ-প্রান্ত থেকে হিন্দুকুশের ও-প্রান্ত পর্যন্ত হিমাচলের বিস্তার সঙ্কুচিত হয়ে ধরা দেয় সেই বৈঠকে — নিখুঁত বর্ণনায়। এমন 'গপ্পুরে-বুড়ো' লেখেন কখন ? —আমি অবাক হয়ে ভাবি।

ওঁর রচনার সবচেয়ে বড় বিস্ময় : সারল্য। ভ্রমণকাহিনী তো আরও পাঁচজন লেখেন—আম্মো লিখি — আমরা সবাই ব্যস্ত থাকি সত্যঘটনার সঙ্গে হাতসাফাই করে কল্পকাহিনীর ভেজাল পাপ্ত্ করতে। একটু গল্পের ছোঁয়া একটু রোমান্সের গোঁজামিল না দিলে ভ্রমণ কাহিনী বিকোবে কেন ? ওঁর সে চিন্তা নেই। যা-যা বাস্তবে ঘটেছিল ঠিক তাই-তাই সহজ-সরল বাঙলায় সাজিয়ে যান—লোকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, পড়তে। তাই আমাদের ভ্রমণ কাহিনী বড়জোর 'বাবুরি-চাহারবাগ' বা 'বৃন্দাবন-গার্ডেন্স' হতে পারে, সযত্নবিন্যস্ত কেয়ারিতে গোনাগুনতি ফুলের সমারোহ। উমাপ্রসাদের ভ্রমণকাহিনী 'ভ্যালী অব-ফ্লাওয়ারে'-র অবিন্যস্ত পুষ্পসমারোহ—যোজন বিস্তৃত ব্রহ্মকমল !

শুধু ভ্রমণকাহিনী নয়। চার-পাঁচ-ছয় দশকের প্রাচীন সামাজিক চিত্র — যা অঙ্কিত করার বৈদগ্ধ্য, হিম্মৎ বা কারিগরী আর কারও নেই—তাই এঁকে গেছেন একের পর-এক। সে-সব ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন উমাপ্রসাদ ; কিন্তু কথকের ভূমিকায় উনি সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক।

আত্মপ্রচারের বাষ্পমাত্র নেই। বিশেষ করে পেয়েছি তিন-তিনজন মহাপুরুষের আন্তরিক, মর্মস্পর্শী পরিচয়। ঐ তিনজনকে তিনি অতি ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন, অন্তরঙ্গ পরিচয়ে। বাল্য, কৈশোর বা যৌবনের সেই সব স্মৃতিচিত্র উনি প্রকাশ করে না গেলে সে-সব মহাপুরুষের অনেক ঘটনা, অনেক কীর্তি-কাহিনী রয়ে যেত অনুদঘাটিত।

☆ ☆ ☆

প্রথমত আশুতোষ। হিমালয়াস্তিক প্রতিভা, মহাগণিতজ্ঞ পণ্ডিত, ন্যায়নিষ্ঠ ন্যায়াধীশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্রষ্টা—এ পরিচয় সবাই জানে। কিন্তু তাঁর ছাত্র-বৎসলতা বা বহুমুখী জ্ঞানান্বেষণের বিচিত্র কাহিনীগুলি কি আমরা জানতে পারতাম?

উমাপ্রসাদ ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করলেন। তারপর তাঁর ইচ্ছা হল Ancient Indian History & Culture বিষয় নিয়ে এম. এ. পড়বেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ললিতকলা বিভাগে সে আমলে ঐ পাঠ্যসূচি একটি সদ্যগঠিত গ্রুপ। উনি যখন ওঁর পিতৃদেবকে মনোগত বাসনা জানালেন তখন আশুতোষ বললেন, "সিলেবাস-এর বাইরে আরও কিছু বই তোমাকে পড়তে হবে।" গ্রন্থগুলির নাম এবং লেখকের পরিচয়ই শুধু নয়, বাড়ির অতিবিশাল ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের কোন আলমারির কোন তাকে কোন বইটি পাওয়া যাবে তাও বাৎলে দিলেন। উমাপ্রসাদ লিখছেন, "সারা বাড়ি জুড়ে তাঁর লাইব্রেরির বইয়ের কোনও লিখিত তালিকা ছিল না; নির্ভুল ক্যাটালগ ছিল তাঁর স্মৃতিতে গাঁথা। শুধু তাই নয়। বইগুলি বার করে খুলে দেখে স্তম্ভিত হই -সব বইই তাঁর পড়া, বইয়ের অনেক স্থানে কোথাও দাগ দেওয়া, কোথাও বা তাঁর হাতে-লেখা দু-একটা মন্তব্য। অথচ এসব বই হল ললিতকলার — চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, স্থাপত্য-সংক্রান্ত।"

—অর্থাৎ গণিতের বা বিচার-সংক্রান্ত আইনের নয়।

উমাপ্রসাদের কল্যাণে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পেরেছি বাংলামায়ের আর এক দামাল ছেলেকে শ্যামাপ্রসাদ। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দের শেষ যুগল-উত্তরসাধক : সুভাষচন্দ্র এবং শ্যামাপ্রসাদ। আপোসহীন দুই বিবেকপরিচালিত বাঙালী সংগ্রামী। সুভাষচন্দ্রের শেষ নিঃশ্বাস সাইবেরিয়ার বন্দীশিবিরে পড়েছিল কিনা সেকথা জবাহরলাল এবং তাঁর পিসিমা হয়তো জানতেন হয়তো জানতেন না; কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের শেষ নিঃশ্বাস যে ভারতের অন্তর্গত কাশ্মীরের বন্দিশিবিরে পড়েছিল তা আজ ওহরলাল আমরাও জানি। সেই শ্যামাপ্রসাদের দিনলিপির অন্তরঙ্গ কথা আমরা জেনেছি উমাপ্রসাদের কল্যাণে।

তৃতীয়ত, শরৎচন্দ্র। জীবিতকালে গৃহলক্ষ্মী হিসাবে এবং মহাপ্রয়াণের প্রাক্কালে যাঁকে ওয়ারিশ-হিসাবে সহধর্মিণীর মর্যাদা দিয়ে গেছেন তাঁকে শরৎচন্দ্র কী-মতে বিবাহ করেছিলেন এই গূঢ় 'সাহিত্যিক' প্রশ্ন ওঠানো প্রাসঙ্গিক মনে করলেন একজন সাহিত্যিক এবং 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ'-এর এক সম্পাদক সেটি প্রকাশ করার কাজটাকে সাহিত্যসেবা বলে সাদরে গ্রহণ করলেন। এ নিয়ে 'বনফুল' ব্যতীত আর কেউ ব্যথিত হয়েছেন বলে শুনিনি। তবে কোনও বিশেষ ক্ষমতাশালী সংবাদপত্র গোষ্ঠীর প্রসাদপ্রত্যাশী নন বলেই সম্ভবত উমাপ্রসাদ ঐ রচনার

একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ লিখে প্রকাশ করতে পারলেন। শরৎচন্দ্র যাঁদের ছোট ভাইয়ের মতো ভালবেসেছিলেন তাঁদের মধ্যে আজ বোধকরি উমাপ্রসাদই একমাত্র আমাদের মধ্যে আছেন। দাদার প্রতি কর্তব্যে তাই তিনি অবিচল।

☆ ☆ ☆

মনগড়া গল্প-উপন্যাস বড় একটা লেখেননি ; কিন্তু এই তপস্বী পরিব্রাজক তাঁর জীবনে চলার পথে যেসব ছবি দেখেছেন, যেসব চরিত্রকে লক্ষ্য করেছেন তাদের অপরূপ 'কলমচিত্র' এঁকে গেছেন একের পর এক। ছোট গল্প বলতে যা বোঝায় সেগুলি তা নয়। অর্থাৎ লেখক সজ্ঞানে ছোটগল্প লেখেননি। সেগুলি নেহাৎই স্কেচ। মন-ক্যামেরায় ধরা ফটো অ্যালবামের ছবি। কিন্তু রচনা কৌশলে তা সময়-সময় অনবদ্য ছোট গল্প।

'কোন নিরালায় রব আপন মনে'-র ঘটনাগুলি একাধারে স্কেচ ও ছোটগল্প। 'গোপালের প্রসাদী', 'উন্মাদ আশ্রম' বা 'পুরাতন ভৃত্য' কেন নয় অতি-অনবদ্য ছোটগল্প ? যেহেতু সেগুলি নিছক সত্য ঘটনা ? আসল ব্যাপার কি জানেন ? আমরা সহজ-সরল কথা এভাবে পরিবেশন করতে ভরসা পাই না। একটা উদাহরণ দিই :

ওঁর 'অ্যালবাম'-এ পঞ্চদশ কাহিনীটির নাম : 'দম্পতি'। সেটা এভাবে শুরু হয়েছে, "তাঁদের দুজনের কেউই আজ জীবিত নেই। উভয়েরই মৃত্যুসংবাদ পেয়েছি লোকমুখে। কেন না, তাঁদের সঙ্গে একসময়ে আলাপ হলেও,— আর যোগাযোগ ছিল না। ....কাশীতে বাঙালী-টোলার এক বন্ধুর বাড়িতে আছি। যথারীতি—একাই। গলির মধ্যে সাবেককালের তিনতলা বাড়ি।...... সেদিন সকালবেলা। কে যেন সেই উঠান থেকে ডাক দিলেন, উমাপ্রসাদবাবু ! বাড়িতে আছেন নাকি ?..... ভদ্রলোকটি প্রৌঢ়। খর্বাকৃতি। হৃষ্টপুষ্ট, স্বাস্থ্যবান। শ্যামবর্ণ। গোল মুখ। দাড়ি গোঁফ কামানো। ছোট করে চুল ছাঁটা। পরনে সাধারণ খাঁটি বাঙালীর বেশ। সাদা খদ্দরের ধুতি। গেরুয়া রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবী। হাতে একটা মোটা লাঠি। দরজার পাশে সেটা দাঁড় করিয়ে রাখেন। কাঁধ থেকে একটা ফ্লাস্ক ঝুলছে।"

ধরনটা লক্ষ্য করেছেন ? মানে, ভাষার ? চাঁছা-ছোলা। কোন বাগাড়ম্বর নেই। কোন অলঙ্কার নেই। অঙ্কিত চরিত্রের মতো লেখকের ভাষারও যেন 'দাড়ি গোঁফ কামানো'। কিন্তু ধীরে ধীরে সাদা কাগজে একটা 'পেন-অ্যান্ড ইংক'-এর স্কেচ ফুটে উঠেছে....

'তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, ...এলাম আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে। এর আগে চাক্ষুষ পরিচয় না হলেও আপনাকে ভালভাবেই চিনি। মন দিয়ে আপনার বইগুলি পড়েছি।.... আমার পরিচয়টা দিই। আমার নাম, মশাই, দেবীপ্রসন্ন মৈত্র,— পেশায় ডাক্তার। থাকি জঙ্গমবাড়িতে ...."

এই পর্যন্ত পড়ে আঁৎকে উঠেছিলুম। কারণটা আপনারা বুঝবেন না—আপনাদের চমকিত হবার মতো কোন কিছু ঘটেনি। কিন্তু আমার ? আমি যে ওঁকে ভালভাবেই চিনি। ঘনিষ্ঠভাবে। প্রায় আমার হাফ-প্যান্ট পরা যুগ থেকে আমি যে জঙ্গমবাড়ির দেবীদা আর ইমা বৌদির স্নেহধন্য। কতদিন ওঁদের বাড়িতে গেছি। নেমন্তন্ন খেয়েছি, দেবীদার কাছে গল্প শুনেছি—স্বাধীনতা আন্দোলনের, 'ডান্ডি-মার্চ'-এর, বৌদির জীবন সংগ্রামের। কিন্তু ঐ আশ্চর্য দম্পতিকে নায়ক-নায়িকা করে গল্প লেখার বাসনাটা তো কখনো জাগেনি। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে

পড়ে গেলাম বাকি কয়টা পৃষ্ঠা। প্রথমটা দারুণ রাগ হয়েছিল ; মনে হয়েছিল আমার একটা প্লট— করায়ত্ত সম্পত্তি— সেজদা কায়দা করে হাতিয়ে নিয়েছেন। এ তো রীতিমতো 'হস্তলাঘবতা' !

পরে নিজেই বুঝতে পারি : কী মূর্খের মতো অভিমান করছি।

"তোরা কেউ পারবি নে ফুল ফোটাতে।..... যে পারে সে আপনি পারে। পারে সে ফুল ফোটাতে।"

☆ ☆ ☆

আর একটা উদাহরণ দিই। ওঁর একটি কাহিনীতে বাংলাসাহিত্যে অমরত্ব পাওয়ার সৌভাগ্য আমার ঘটেছে। সে কথাই শোনাই এবার। 'অ্যালবাম'-এর 'কোন নিরালায় রব আপন মনে'-র তৃতীয় গল্পটি :

"এবার দীঘায় বাস্-এ আসি।....বাস-স্ট্যান্ডে সুবল প্রতীক্ষায় আছে।.... তাকে জানাই, আমি যে একটু নিরিবিলি একান্তে থাকতে চাই...."

সুবল ওঁকে একটি দ্বিতলবাড়ির উপরতলায় নিয়ে গেল। একতলায় অন্য যাত্রী।

"আমি স্নান সেরে ডেকচেয়ারে বসে আছি। হঠাৎ দরজার কাছে খট্ করে শব্দ হওয়ায় সেদিকে তাকাই। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে একটি ছোট ছেলে। বছর চার-পাঁচ বয়স। গোলগাল নাদুস-নুদুস গড়ন। শ্যামবর্ণ। খালি গা। উলঙ্গ। টানা-টানা বড় বড় চোখ মেলে হঠাৎ-চমকে-ওঠা দৃষ্টি মেলে আমতা-আমতা স্বরে বলে, 'আ-আ-আপনি ওপরে থাকেন ? ছাত দেখতে এসেছিলাম'—বলেই ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালায়।

"খানিক পরে আবার দরজার কাছে টুকটাক্ শব্দ। তাকিয়ে দেখি, ছেলেটি আবার এসেছে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি মারছে। এবার পরনে জাঙ্গিয়া, কিন্তু আদুড় গা।

"ডাকি, ঘরের মধ্যে চলে এস। নীচের ঘরে থাক বুঝি ?

"কাছে এসে দাঁড়ায়। সলজ্জভাবে বলে। হ্যাঁ। আমি জানতাম না, উপরে কেউ আছেন, তাই তখন ওভাবে চলে এসেছিলাম।..... আপনি সমুদ্দুরে চান করতে যাবেন না ? আমরা এখনি যাচ্ছি।....

"....খাওয়া-দাওয়া সেরে বসে আছি ডেকচেয়ারে। ছেলেটি এসে হাজির।

"দাদু, আমি এসেছি'—বলে ঘরের ভিতর ঢোকে। সে-ও খেয়ে এসেছে, গণেশমূর্তির মতন ছোট্ট গোল নেয়াপাতি ভুঁড়িটি তার সাক্ষ্য দেয়। তবুও, হাতে তার দুটো জামরুল। একটাতে কামড় দিতে দিতে বলে, দাদু, খাবে ?

"....আমি বসে বসে ভাবি, এ-বাড়িতে থাকলে আমার একান্তে বাস সম্ভব নয়। নিচে ভাড়াটে আসবেই এবং ওপরে আলাপ করতে আসাও তাদের স্বাভাবিক। সুবলকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, অন্য কোথাও স্বতন্ত্র থাকার ব্যবস্থা হতে পারে কিনা। হঠাৎ মনে আসে, স্নেহাস্পদ নারায়ণ সান্যালের কথা। এঞ্জিনিয়ার....কলকাতা ছাড়বার আগের দিন দেখা করতে আসেন। দীঘায় আসছি শুনে নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা করেন, সেখানে থাকবার ব্যবস্থা কী হয়েছে ?

"সুবলের কথা তাঁকে জানাই, বলি, কোথায় ঠিক করেছে জানি না। মনে হয় অসুবিধা হবে না।

"তবুও তিনি বলেন, দরকার হলে আমাকে জানাবেন। দীঘায় আমি সরকারী কাজে কিছুকাল ছিলাম। আমার জানাশোনা কয়েকজন সেখানে আছেন। তাঁদের লিখে দিতে পারি। আপনার প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা করে দিতে।

"সান্যালের সঙ্গে এই কথা হল বটে, কিন্তু তাঁর বাড়ির ঠিকানাটা লিখে নেওয়া হয়নি। এখন এখানে বসে বসে সেই কথাই ভাবছি। ঠিকানা জানি না, তাঁকে জানাব কী করে ?

"খুট্‌ করে দরজার পাশে শব্দ। চমকে ফিরে তাকাই। বুন্টু হাসিমুখে দাঁড়িয়ে, প্রশ্ন করে দাদু, তুমি নারাণ সান্যালকে চেন ?

"অপার-বিস্ময়ে তাকে দেখি ! এ কী দেব শিশুদূত ! আমার মনের ভাবনা ও জানল কেমন করে ?

"সাদরে ডেকে বলি, বুন্টুবাবু, তুমি কি মানুষের মনের কথা পড়তে পার ? আমি তো এখনি এখানে বসে বসে নারাণ সান্যালের কথাই ভাবছি। তুমি কী করে জানলে ?

"সে বলে, বাঃ ! তুমি কী ভাবছ তা আমি জানব কেমন করে ? তোমার নামঠিকানা লেখা কাগজ মাকে দিতেই মা তখনি বললে, যা ত' এখনি ওপরে। তোর দাদুকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর, উনি নারাণ সান্যালকে চেনেন কি না। দেখবি নিশ্চয় চেনেন।

"আমি বলি,....কিন্তু, নারাণ সান্যালকে তুমিও চেন নাকি ?

"সে ভারিক্কি চালে বলে, নারাণ দাদুকে ? বাঃ ! আমি চিনব না ? আমরা তো ভবানীপুরে তাঁরই বাড়িতে নিচের তলায় থাকি।......."

উমাপ্রসাদদার জীবনে এ ঘটনা ঘটেছিল আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে। হ্যাঁ, বুন্টুর হাতে সেবার দীঘা থেকে 'সেজদা' একটা অপ্রত্যাশিত চিঠি পাঠিয়েছিলেন, আমি তৎক্ষণাৎ ডাক মারফৎ জবাবও দিই। কিন্তু এ ঘটনা যে সাহিত্যের একটি উপাদান হতে পারে, দীঘাভ্রমণের অনুষঙ্গ হতে পারে, সেদিন তা মনে হয়নি। সেই ঘটনার বিশ-বাইশ বছর পরে 'আনন্দ পাবলিশার্স-'এর 'অ্যালবাম' গ্রন্থে এই ঘটনা পড়ে আপন মনে হাসতে থাকি। 'সেজদা' তখন বোম্বাইতে। তাঁকে চিঠিতে লিখেছিলাম, "পঁচিশ বছর আগে দীঘাতে আপনি যে 'গণেশমূর্তির মতন ছোট্ট গোল নেয়াপাতি ভুঁড়িটি' দেখেছিলেন তার মালিকের ডাক নাম 'বুন্টু' নয়—বোধকরি আপনি ইচ্ছে করেই বদলেছেন—তার ডাক নাম 'বাবু'। এতদিনে তার ভাল নাম ফ্লাইট-লেফটানেন্ট দেবাশীষ বসু রায়চৌধুরী। তার পিতৃদেব ক্যাপ্টেন বসু রায়চৌধুরী যখন আমাদের বাড়িতে প্রথম আসেন তখন 'বাবু'র বয়স বছরতিনেক। এখন তার না আছে গণেশমূর্তির মতো শ্লথ গতি না তার নেয়াপতি ভুঁড়িটি ! সে এখন পাইলট—এয়ারোপ্লেন চালায়—বয়স-উচ্চতা ও ওজনের সমতা তাকে বাধ্যতামূলকভাবে রক্ষা করতে হয়। আর একটা কথা জনান্তিকে জানাই, সেজদা, —আপনার সেই জাঙিয়াপরা, আদুড়-গা খোকন সম্প্রতি এক জীবনসাথীর সন্ধান পেয়েছে। অ্যারেঞ্জড্‌ ম্যারেজ নয়। যাকে বলে 'ইয়ে'-করা বিয়ে আর কি ! ভা-রী লক্ষ্মীমন্ত মেয়েটি। ওদের বিয়েতে এই বৃদ্ধবয়সেও 'চর্ব্যচূষ্যলেহ্যপেয়' ব্যুফে-ডিনার খেয়েছি। শুধু তাই নয়, তাদের প্রথম সন্তানের অন্নপ্রাশনেও।"

'সেজদা' সে-চিঠি পড়ে দারুণ খুশি। উনি তো আর মর্বিড বুড়ো নন যে, 'ইয়ে'-করা বিয়ে নিয়ে আপত্তি করবেন। আমার মারফৎ প্রাণভরা আশীর্বাদ জানালেন 'বাবু'কে, আর 'বাবু'র খোকন বাবুসোনাকে।

ট্র্যাজেডি এটাই— পঁচিশ বছর আগে উমাপ্রসাদের চিঠি চার বছরের 'বাবু' দীঘা থেকে কলকাতায় ফিরে এসে আমার হাতে দিয়েছিল ; কিন্তু ঐ উমাপ্রসাদের আশীর্বাদী চিঠিখানি আমি 'বাবু'র হাতে পৌঁছে দিতে পারিনি। আর তা যে পারিনি তা 'সেজদা'-কেও জানাইনি। কী দরকার এ বয়সে ওঁকে একটা দাগা দেবার ?

'বাবু'—মানে দেবাশীষ—প্রায় আমার ছোটকন্যা মৌ-এর সমবয়সী। ফলে ঘোর বন্ধুত্ব। এ-ওর আধখাওয়া আম কেড়ে খায়। আমি তখন *বিহঙ্গ-বাসনা* নামে একখানা কেতাব লিখছি। পরে বইখানার নাম হয় *'হে হংসবলাকা'*। মানুষের আকাশজয়ের ইতিকথা। 'বাবু'র বাবা দক্ষ-পাইলট, শুধু ভারতের আকাশেই নয়, প্লেন নিয়ে তিনি ইউরোপ-অ্যামেরিকাতেও পাড়ি জমিয়েছেন। তাঁর কাছে 'এয়ারোনটিক্স-বিজ্ঞানের' উপর ছিল কিছু প্রামাণ্য গ্রন্থ। আমি ক্যাপ্টেন বসু রায়চৌধুরীর কাছ থেকে সেই সব বই নিয়ে এসে তা থেকে ছবি আঁকতাম— লেঅনার্দো, লিলিয়াঁথাল বা ব্লেরোঁর প্লেন। 'বাবু' টুমটুম হয়ে আমার সামনে বসে ছবি আঁকা দেখতো। বলত, দাদু, আমি ঐ রকম এরোপ্লেনে চেপে উঠে যাব আকাশে — মেঘের রাজ্য পেরিয়ে, রামধনুর রাজ্য ছাড়িয়ে দু—ই আকাশের ওপারে। ব্র-র্-র্-র্-র্।

দু-হাতে স্টিয়ারিং ঘোরাতো। যেন প্লেনের জয়স্টিকটা ঠিক মটোর গাড়ির স্টিয়ারিং। আমি বলতুম, আমাকে নিয়ে যাবে না 'বাবু' ? ঐ মেঘের ও-পারের দেশে ?

ও গম্ভীর হয়ে বলত, যাব। নিয়ে যাব। তবে তুমি বুড়ো মানুষ তো। আমি নিজে গিয়ে দেখে আসি আগে।

বাবার আদর্শে পাইলট হতে চেয়েছিল সে। তাই হয়েছিল। উমাপ্রসাদের নিপুণ তুলিতে আঁকা গণেশমূর্তির মতো নাদুসনুদুস বুল্টু হয়ে গেল বৃষস্কন্ধ ফ্লাইট-লেফটানেন্ট দেবাশীষ বসু রায়চৌধুরী। ভালবেসে বিয়ে করল। নীড় বাঁধল। সন্তানের জনক হল। তারপর একেবারে আচমকা .... বলা নেই কওয়া নেই সে চলে গেল মেঘের রাজ্য পেরিয়ে, রামধনুর রাজ্য ছাড়িয়ে দু—ই আকাশের ওপারে।

গতবছর— একানব্বই সালে— ইম্ফলে এয়ার-ইন্ডিয়ার যে বিমানটি নিদারুণ দুর্ঘটনায় নিঃশেষ হয়ে গেল—একটি যাত্রীও ফিরে এল না—ফ্লাইট লেফটানেন্ট দেবাশীষ বসু রায়চৌধুরী ছিল তার কো-পাইলট।

'বাবু'র বিয়েতে নিমন্ত্রণ পেয়েছি ; তার পুত্রের অন্নপ্রাশনেও। এবারও যেতে হ'ল। 'বাবু'র শ্রাদ্ধে। ওর বাবা-মাকে সান্ত্বনা দিতে। প্রকাণ্ড একটা বড় ফটো। ফুলে ফুলে ঢাকা। 'বাবু' মিটমিট করে হাসছে ! যেন বলছে, তুমি বুড়ো-মানুষ তো। সবুর কর ! মেঘের ওপারের দেশটা আমি নিজে গিয়ে দেখে আসি আগে !

এসব কথা সেজদাকে আর জানাইনি। কী হবে বৃথা দাগা দিয়ে ?

সংকলন সূত্র

এই গ্রন্থে 'হাতে-হাতে-ধরি-ধরি' 'রিং-এ-রিং-অ'-রোজেস' খেলার পূর্বে এই 'পকেটফুল অফ প্রোজেস' পত্রিকা-জগতের 'মিউজিকাল চেয়ার'-এ কে কোথায় স্থান পেয়েছিল :

1. স্বর্গীয় নরকের দ্বার— *প্রসাদ* পূজাবার্ষিকী
2. রোদ্যাঁর কিছু বিতর্কিত ভাস্কর্য— *'আনন্দবাজার'* 83
3. ...পয়োমুখম — *'প্রমা'*
4. দেবদাসী প্রথা— *সানন্দা*
5. নিকট দূরের সম্পর্ক— আশাপূর্ণাদেবীর বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য সংখ্যা, *'প্রসাদ'*
6. বক্রেশ্বরের একানে-বুড়ো— *'দেশ'*, ৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৭০
7. বীয়ারকুল থেকে দীঘা— *'দেশ'*, ৯ জ্যেষ্ঠ, ১৩৭১
8. জীবনের উৎপত্তি— *'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান'*
9. মাছের প্রজনন বৈচিত্র্য— *'কথাসাহিত্য'* কার্তিক ১৩৯৫
10. জায়েন্ট পান্ডা দেখা হল— *'সকাল'*, দুই-সংখ্যায় 1991
11. আকাশজয়ের সূচনা— *'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান'*
12. সর্বাণী ঘোষাল ও বঙ্গসরস্বতী— *'কথাসাহিত্য'*, কর্তিক, ১৩৯৭
13. পরলোকতত্ত্ব ও বিজ্ঞান— *'কথাসাহিত্য'*, কার্তিক, ১৩৯৮
14. বইমেলায় কী পাইনি ?— *'সাপ্তাহিক বর্তমান'*, 1.1.92
15. 'বইমেলা অষ্টআশির বিচিত্র অভিজ্ঞতা— *'কথাসাহিত্য'*, বৈশাখ, ১৩৯৬
16. বইমেলা উননব্বইয়ে যাওয়া হল না— *'কথাসাহিত্য'*, মাঘ, ১৩৯৬
17. জীবনের অর্থ— *'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান'*, শারদীয়, 91
18. সেজদা, সেজকা, সেজদাদু— অপ্রকাশিত